প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৫৯

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫
বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ
প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ
বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

সূচী

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন

বন্ধনহীন গ্রন্থি

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা তাঁর রচনা প্রথম মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল। আলোচনা নয়, বিস্ফোরণ। বিস্ময়চকিত আনন্দ-বিহ্বল আলোড়ন।

১৩১৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্প প্রকাশের কথা আমি বলছি। আটষট্টি বছর আগের কথা। বাঙালী পাঠকসমাজে ঠিক এই ধরনের অভ্যর্থনা এর আগে আর কোনও লেখক পাননি। তার পর থেকেই তাঁর লেখা নিয়ে নানা উত্তেজনা বয়ে গেছে সম্পাদক-পাঠক-প্রকাশক মহলে। বিরুদ্ধ সমালোচনাও বড় কম হয়নি। পরবর্তী সময়ে 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত, 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'শেষপ্রশ্ন', 'শেষের পরিচয়' ইত্যাদি আরও অনেক বই নিয়ে দুর্নীতির কুরুচির অভিযোগ উঠেছে। সাহিত্যে অস্বাস্থ্য আনার নানা সাহিত্যিক-মামলা। 'পথের দাবী' নিয়ে দেশবাসীর মনের ভিতরে আর রাজদরবারে নিঃশব্দ ঝড়ঝাপ্টা।

চল্তি কালের বিরুদ্ধ-সমালোচনার ধরনটা আলাদা। যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত না করে উপর-উপর অজুহাত দেখিয়ে সিদ্ধান্ত-ঘোষণা। এখন শোনা যায়, শরৎসাহিত্যে ধারও নেই, সারও নেই; অর্থাৎ—আসলে কোনও ভারই নেই। মানসিকতায় ব্যাপকতার অভাব, বৈদগ্ধ্যের অভাব, জটিলতার অভাব। শিল্পের মানও নাকি তেমন উঁচু নয়। কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তি নিয়ে মেয়েলী কান্নায় ভরা সীমায়িত সামগ্রী। যা সময় আর পরিপার্শ্বের দ্বারা এত দুঃশাসিত যে, দূরবর্তী কালের কাছে তার মূল্য কেবল ঐতিহাসিক মাত্র, শৈল্পিক নয়। অর্ধশিক্ষিত পুরুষ আর অন্তঃপুরিকা মেয়েদের মন ভেজানোর মত বস্তু ভিন্ন শরৎসাহিত্যে বিশেষ কিছু নেই।

এ কথার উত্তরে প্রকাশকেরা বলবেন—আজও শরৎচন্দ্রই কিন্তু বেস্ট-সেলার লিস্টের চূড়ামণি হয়ে আছেন—মৃত্যুর আটত্রিশ বছর বাদেও। তার মানে কি,

অন্তঃপুরিকা আর অর্ধশিক্ষিতরাই প্রধানত বই কেনেন? আমি অবশ্য একবারও বলছিনা—বিক্রয়তালিকা দিয়েই মহৎশিল্পের মান নির্ণয় করা যায়। তবে, জনপ্রিয়তা, শিল্পের কালোত্তরণের একটি প্রমাণ তো বটেই।

শরৎসাহিত্য 'কিছুই নয়' একথা যাঁরা বলছেন, বলুন। বলা ভাল। 'কিছুই নয়' বললে তবেই না সেটিকে 'কিছু বটে' প্রমাণ করার প্রয়োজন ঘটে। তখন তা নিয়ে আলাপ আলোচনা বিশ্লেষণ হয়। অস্বীকৃতি তো অবহেলা নয়। আসলে, কালজয়ী শক্তি থাকে যে-রচনার মূলে, খণ্ডকালের ঝড়ে জলে খরায় তা মরেনা,—শীর্ণ হতে পারে মাত্র। সময়ের সঙ্গেসঙ্গে নিজের জীবনীশক্তি নিজেই প্রমাণ করে আবার তাজা হয়ে ওঠে।

আমি শরৎসাহিত্য নিয়ে পণ্ডিতি আলোচনার যোগ্যব্যক্তি নই। পণ্ডিতেরাই আছেন সে-কাজের জন্যে। নিরবধি কালের তীব্র দৃষ্টির সামনে খোলা রইলো শরৎসাহিত্য। কিন্তু, মানুষ-শরৎচন্দ্র ক্রমশই ঝাপ্‌সা থেকে ঝাপ্‌সাতর হতে থাকবেন। আমি সেখানেই সাধ্যমত হাত দিতে চাই। শিল্প স্বনির্ভর। শিল্পী কিন্তু তা নয়। সমকালীন মানুষদের সাক্ষ্য বন্ধুবান্ধব আত্মজনের স্মৃতি-চারণ, দিনপঞ্জি, চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁকে পৌঁছুতে হয় পরবর্তী কালে। অন্যেরা যতটুকু প্রমাণসহ ভাবে লিখে রাখেন, ততটুকুই বিধৃত থাকে ভবিষ্যতের দপ্তরে।

স্বর্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত আমাকে বহুকাল ধরেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে স্মৃতিকথা লেখার জন্য অনেকবার অনুরোধ করেছেন। বিশেষ করে, তাঁরা শরৎচন্দ্রের জীবিতকাল থেকেই জানতেন এবং 'শেষের পরিচয়' উপন্যাস সমাপ্ত হয়ে প্রকাশের পরে জেনেছিলেন শরৎচন্দ্রের অন্তর্জীবনের কিছু জরুরী তথ্য আমার গোচরে আছে। এঁরা দুজনে ছাড়া, আরও অনেক সাহিত্যিক সতীর্থ আমাকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লেখার জন্য অবহিত করেছেন। এঁরা জানতেন এবং জানেন, শরৎচন্দ্রের জীবনের এমন একটা দিক্ আমার স্বামীর ও আমার জানার সুযোগ হয়েছিল, যা হয়ত ঠিক সেভাবে অন্যদের জানা হয়নি।

কিন্তু শরৎদাকে নিয়ে স্মৃতিকথা লিখতে কিছুতেই আমার হাত সরেনি। চেষ্টা করেও না। প্রায় চারদশক হতে চলল শরৎচন্দ্র তিরোহিত হয়েছেন আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখনও না বলে গেলে হয়ত আর সময় থাকবে না, তথ্যগুলি বিনষ্ট হবে। তাছাড়া, সেই রঙ্গমঞ্চের মানুষেরাও তো সব একে-একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। এখনও সামান্য কয়েকজন মাত্র আছেন—তার মধ্যে আমি একজন।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করার আরও একটি বিশেষ বাধা ছিল সেই সময়ে। তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে একটি বাস্তব-

যোগ ঘনিষ্ঠভাবে যেখানে ঘটেছিল, সেটি নিয়ে তখন কোনও মতেই বাইরে কথা কওয়া সম্ভব ছিল না। যাঁর অটল ইচ্ছার সম্মানে শরৎদা আমৃত্যুকাল নিশ্চুপ থেকেছেন। জীবনের সেই করুণ অন্তরায়ও এখন সরিয়ে নিয়েছে মহাকাল। শরৎদার কণ্ঠ খুলেছিল সাহিত্যের মধ্যে, সমাজে নয়। আজ তাঁরা সমাজ-সংসারের সংকীর্ণ কুটিল দৃষ্টির বাইরে, সকল সংকোচ কুণ্ঠার ঊর্ধ্বে চলে গেছেন।

প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধ হয় ভাল। শরৎচন্দ্র বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। তার মধ্যে কতক বইতে আমার ও আমার স্বামীর মুখে শোনা কথাবার্তা, আমাদের নিজস্ব অভিমত, ব্যাখ্যা লেখকেরই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে শরৎ চন্দ্রের কিংবা আমাদের কিছুই ক্ষতি হয়নি। কিন্তু এখন আমাকেই না অন্যের কথা ধার নেওয়ার উল্‌টো বিপত্তিতে পড়তে হয়, এই ভাবনা। লেখক নিজে কখনই এমন অভিযোগ তুলবেন না নিশ্চয় জানি। তবে, ভবিষ্যতে গবেষকরা সন তারিখ মিলিয়ে আমার লেখার আগেই এমন কথা অন্যের বইতে মিলেছে, লিপিবন্ধ করবেন। আমার এবং আমার স্বামীর মুখ থেকে অনেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন. সামান্য মাত্র দুই একটির স্বীকৃতি আছে। অন্য গুলির দিতে ভুল হয়েছে।

এই প্রবন্ধমালায় আমি যা যা বলবো, তার দায়িত্ব আমার নিজের। তিনদিন ভাষণের প্রয়োজনে রচনাটি আমি তিনটি ভাগে সাজিয়েছি। প্রথম ভাগের শিরোনাম—'বন্ধনহীন গ্রন্থি'। তাতে দেখব মানুষ-শরৎচন্দ্রের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক চেহারাটি। কোনো শিল্পীরই একটিমাত্র চেহারা থাকে না। প্রায় সমস্ত মানুষেরই বাইরে একটি চেহারা, ভিতরে অন্য আরেকটি চেহারা থাকে জানি। এই দুটি সত্তার অস্তিত্ব সবাইকারই চেনাজানা। শিল্পীদের কিন্তু বাইরেও অনেক সত্তা আর ভিতরেও অনেক সত্তা লক্ষ করা যায় নিজের মধ্যে বিভিন্ন সত্তাকে বশ মানিয়ে এঁদের চলতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান-লিখিয়ে সত্তার সঙ্গে ছবি-আঁকিয়ে সত্তার কোনই মিল ছিল না। বাবামশায় রবীন্দ্রনাথে ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তা উদ্ভাসিত। শরৎ-চন্দ্রেরও অনেকগুলি ব্যক্তিসত্তা ছিল। ভিতরের মানুষটির সঙ্গে বাইরের মানুষটির মিল ছিল না।

শরৎচন্দ্র নিজের অন্তরের গভীরতার দিকটিকে এতই সংগোপনে অসূর্যম্পশ্য রাখতেন, সেই লোহার দুর্গ ভেদ করে অন্দরে পৌঁছুনো কঠিন ছিল। তিনি নিজে ইচ্ছা না করলে, কারুরই শক্তি ছিল না সেখানে প্রবেশের। যেন একটি অতি পবিত্র আর দামী কিছু সেখানে আছে, বাইরের চোখের দৃষ্টির ছোঁয়া লাগলে মলিন অশুচি হয়ে যেতে পারে, এমনি একটি ভাবভঙ্গি।

অথচ তাঁর বাইরের আচরণে ছিল হালকাপনার মজবুত মুখোশ।

শরৎচন্দ্রের প্রকৃত বিশেষত্ব ছিল এইখানেই। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের হৃদয়কে তিনি কোনদিন প্রকাশ্যে শোভাযাত্রা করিয়ে নিয়ে বেড়াননি। তাঁর স্বনির্ভর প্রেম, তাঁর নিঃশব্দ বেদনা, তাঁর গভীর অভিমান, নিরুপায় ব্যর্থতার কষ্ট—সবই থাকত তাঁর নিজের ভিতরে লোহার তালা-আঁটা সিন্দুকে তোলা।

তিনি কবিতা লিখতেননা। লিরিক লিখে আত্মমুক্তির সহজ পন্থায় নিজের জীবনে অন্তত তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কবিরা অন্তরের বোঝা নামিয়ে হালকা হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের এক-একটি গানে কী অনাবিল মুক্তি, হৃদয়ের গ্লানি-ধৌতি, যন্ত্রণা-উত্তরণের আরাম নিহিত, ঔপন্যাসিকের তো ঠিক সেইভাবে আত্ম-কথনের সুযোগ হয় না। তাঁরা ঢুকে পড়েন নিজের ভিতরে নিজে। আরও—আরও ভিতরে। আরও গভীরে। নিজেকেই কুরে কুরে খান। শেষ পর্যন্ত প্রসূত হয় একটি উপন্যাস। সার্থক বা ব্যর্থ যাই হোক না।

শরৎচন্দ্রের ভাগ্যদোষে এখানেও মুক্তির পথ ছিল বন্ধুর। শিল্পের মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণের স্বচ্ছন্দ খেলাটা 'শ্রীকান্তে' খেলেছেন বটে, কিন্তু এখানেও তাঁকে বাধায় ঠেকতে হয়েছে। প্রথম দিকের বইগুলিতে তাঁর ইচ্ছা অবাধ স্বাধীনতা পায়নি সর্বত্র। তবে এই বাধাটিই আবার শরৎচন্দ্রের শিল্প-জীবনে শাপে বর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কলম নিরুচ্চার-ভাষণের আঙ্গিকে অভ্যস্ত হতে হতে সিদ্ধহস্ত হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র জীবনে ছিলেন বঞ্চিত মানুষ। যে-যন্ত্রণা, যে-বঞ্চনা তাঁকে আজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সেই অবরুদ্ধ কষ্টই সহজ-সরল অথচ ইঙ্গিতকুশল আঙ্গিকের আড়ালে থেকে তাঁর লেখাকে গভীর অন্তস্পর্শী করে তুলেছে। তিনি তাঁর প্রধান বক্তব্যকে শব্দের মাধ্যমে নয়, নিঃশব্দে উচ্চারণ করে গেছেন। জীবনের মহৎ বঞ্চনা, একান্ত অপ্রাপ্তি, শিল্পে তাঁকে প্রাপ্তিতে পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর সব রচনাই অনুভব দিয়ে লেখা, অনুভব দিয়েই তাকে ধরা যায়, নইলে ভুল হয়।

যাঁরা সমাজের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভিত্তিতে শরৎচন্দ্রের রচনাকে সাহসিকতা-ভীরুতার মানদণ্ডে খোলামেলা বিচার করেন, তাঁরা এটি লক্ষ্য করলে ভাল হয়। সমাজ তাঁর শিল্পের মূল লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি আরও গভীরে কলম ডুবিয়েছেন। সমাজ ব্যাপারটি যেখান থেকে, আর যার প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছে, তিনি আছেন সেইখানে। তিনি আছেন মানুষে। মানব-মন আর মানব চরিত্র তাঁর গোটা সাহিত্য। এই মানব-মন আর মানব-জীবনের চাহিদাতেই তো সমাজ ব্যাপারটির উৎপত্তি। ধীরে ধীরে নানা দেশে নানা আকারে সমাজ গড়ে উঠেছে, কালে কালে চেহারা বদলিয়ে বিভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করেছে বিশ্ব

দুনিয়ায়।

শরৎচন্দ্রের রচনায় এই মানব-মন আশ্চর্য, অদ্ভুত। সে কুলিশ-কঠিন, আবার কুসুম-কোমল। সে উন্মত্ত ভোগী অথচ সর্বত্যাগী। তার গতি-প্রকৃতির হদিশ মেলা ভার। যুক্তির জাল বিছিয়ে একে ধরা যায় না সহজে, অংক কষে ফল বার করা অসম্ভব।

স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি সব মানুষের থাকেনা। এটি প্রকৃতিদেবী কাউকে দেন. কাউকে দেননা। বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য, চেষ্টায় আর পরিশ্রমে অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু তৃতীয় নেত্রটি যার থাকে. তার আপনিই থাকে। শরৎচন্দ্র একটি কথা তাঁর সাহিত্যে লিখে রেখে গিয়েছেন—'সংসারে যে যত ভাল বেসেছে. পরের হৃদয়ের ভাষা তার কাছে তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' এটি একটি মৌলিক সত্য।

এই রচনার দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম 'অদৃশ্য তর্জনী'। সেখানে প্রবেশ করব শরৎ সাহিত্যের কেন্দ্রীয় সত্তা এবং সমস্যার অন্তঃস্থলে। কী ছিল তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির এবং সাহিত্য-দৃষ্টির প্রেরণা, কী ছিল তাঁর শিল্পপথের বিঘ্ন, কিসের নেশায় তিনি বিভোর ছিলেন আযৌবন মৃত্যু পর্যন্ত।

আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতায়. আর তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অকপট সংস্রবে. সত্য বলে যা জেনেছি—সততার সঙ্গে সাবধানে তা আলোচনা করব।

শরৎচন্দ্রের একখানি অসমাপ্ত উপন্যাস সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার মত অনুপযুক্তের উপরে পড়েছিল। কী-কারণে. কেন ঐ গুরুদায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছিল. সে কথাটিও বলে যাওয়া উচিত মনে করি।

শরৎ-সাহিত্যের প্রথম যুগের কিছু নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র আমার আলোচনাবস্তু হবে। সেই চরিত্রগুলির মধ্যে লেখকের নিজের অন্তর্জীবনের অনুভূতি কতটা পরিস্ফুট, সেটাও আমি দেখতে চেষ্টা করব। শরৎ-সাহিত্যের মূল ছিল লেখকের বাস্তবজীবনের মর্মমূলে গভীরভাবে প্রোথিত। তাঁর বইগুলিতে সব ঘটনা. সব চরিত্র বাস্তব মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন থেকেই উঠে-আসা। কল্পনা থেকে নয়। কল্পনা আছে, কিন্তু তা মূলে নয়, বহিরঙ্গে। কোথাও যেমন তাঁর কষ্টকল্পনা ছিলনা, তেমনিই কোথাও বাস্তব-অতিরিক্ত স্বপ্নের তির্যক আলোকপাতও ঘটেনি। সেই কারণেই হয়ত এতটা সৎ, এতটা সত্য, এতদূর জীবনভিত্তিক তাঁর শিল্প। অথচ এই কারণেই আজ আমরা কেউ কেউ বলছি, তাঁর শিল্প সীমায়িত, ব্যাপ্তিহীন, সংকীর্ণ।

বিদগ্ধজনের দৃষ্টির উৎসকেন্দ্র মস্তিষ্ক। এঁদের চোখে জীবনের মধ্যেই জীবনোত্তরণের নিহিত ছন্দটি সহজে ধরা পড়ে না। মহৎশিল্পীর দৃষ্টির উৎস

হৃদয়ানুভব। প্রকৃত শিল্পরসিক পাঠকেরও তাই। খাঁটি শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির লগ্নে মস্তিষ্ক প্রভু হয়ে হাজির থাকে না, প্রহরী হয়ে সতর্ক থাকে। হৃদয়ানুভব এখানে প্রেরণারূপে কাজ করে, খেলা করে, মস্তিষ্ক সেবকের নিপুণতায় তাকে যথোচিত উপযুক্ত করে বাইরে এনে ধরে।

শরৎ-শতবার্ষিকী এল। এই ৩১শে ভাদ্র তাঁর জন্মতারিখ নিরেনব্বুই পূর্ণ হয়ে শতকে পদার্পণ করেছে। শরৎচন্দ্রকে এখন নতুন করে বিচার করার, নতুন চোখে পড়ার, নব মূল্যায়ণের সময় এল। এখন যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে নতুন করে পড়া হচ্ছে, তেমনি শরৎচন্দ্রকেও নতুন করে পড়া দরকার। কোনও বিশেষ ধরনের মানসিক প্রত্যাশা নিয়ে নয়, ধারণাবদ্ধ মন নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে নতুন করে শরৎ-সাহিত্যকে দেখুন। ধারণাবদ্ধ মন, বা অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে উঠলে নবীন পাঠকরা হয়ত এবার তাঁকে চিনতে ভুল করবেন না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সংসার যাত্রা নিয়ে লিখলেই শিল্পীর নজরটা সংসারী হয় না, গল্পে বিধবার বিয়ে না দিলে লেখক বিধবাবিবাহ-বিরোধী হন না, ছাপোষা মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র আঁকলেই ছাপোষা মধ্যবিত্ত মানসিকতা হয় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক শিল্পীটি স্বকীয় জীবৎকালে সহজ ঔদাস্যে হাসিমুখে সমকালীনদের ভুল বোঝার পর্বত প্রমাণ ভার স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছেন। শিল্পকর্মেও বিনা দৃক্‌পাতে স্বেচ্ছায় কিছু বিভ্রান্তি রেখে গেছেন, যাতে ভবিষ্যতের অসীম আকাশেও তাঁর ভাবমূর্তি সেই বিভ্রান্তির বোঝাটি কাঁধে নিয়েই ভেসে বেড়াবে।—এই বিভ্রান্তি মোচনের দায়িত্ব আছে সৎ সমালোচকের।

আমি একদা তাঁর কাছে যে-পিতৃস্নেহ পেয়েছি, তাতে ঋণমুক্ত হওয়ার এই একটি সুযোগ। শরৎদার অন্তর্মুখীটি আমার তুচ্ছশক্তিতে যতটুকু সাধ্য উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করব ভবিষ্যৎ কালের সামনে।

শরৎদার মত এমন অবাস্তব, অমধ্যবিত্ত, অসামাজিক অথচ অপার্থিব মানুষ, আমার জীবনে তো আমি আর কাউকে দেখিনি। অসামাজিক শব্দটি ছাড়া ঠিক এই বিশেষণগুলিই গুরুদেবকেও দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি ছিলেন অপার্থিব মানুষ, এই পার্থিব জগতে এ কথা কে না বলবে? তার কারণ, তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ। তাঁর ব্যক্তিত্বে মহিমার সীমা ছিল না। এমন উজ্জ্বল আলোকিত মানব-ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে হয়ত কদাচিৎ মেলে। কিন্তু শরৎচন্দ্র? তিনি তো সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন, নিরুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ একটি গ্রামীণ মানুষ মাত্র। চরিত্রে, চেহারায়, আচরণে জীবনের মূল ভিত্তিতে এবং জীবন-সাদৃশ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবুও আমি উপরোক্ত বিশেষণ ক'টি তাঁর ভিতরকার শিল্পী মানুষটির প্রতি প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত নই। সেই

কথাই বলতে চেষ্টা করব।

শরৎচন্দ্রের শিল্পরচনায় যেমন দেখতে পাই, সৎ আর মহৎ সুন্দর মানব-সত্তা বহির্জীবনে একটি বিপরীত খোলসে ঢাকা থাকে—তিনি নিজেই আসলে সেই বিপরীতে ঢাকা প্রচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর বাইরের আচরণগত মূর্তির সঙ্গে ভিতরের মানুষটির সাদৃশ্য ছিল না।

আমার সুদীর্ঘ জীবনে পরিচিত যত মানুষ দেখেছি, তাঁর মতন ভালবাসবার শক্তি আর কারুর মধ্যে এতখানি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁর মতন অসম্পৃক্ত মন আর নিঃশব্দ আত্মত্যাগও দ্বিতীয়টি দেখিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে মহৎ ত্যাগ স্বীকার, প্রবল দুঃখ বহন অনেক মানুষই করেছেন, করেন। সহিষ্ণু আদর্শবাদী মানুষের পক্ষে তা শক্ত নয়। কিন্তু শিল্পীরা যে স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক হন। তাঁদের স্বার্থপর হতে হয় বেশ একটু। যেহেতু, শিল্পের দাবী তাঁদের কাছে জীবনের দাবীর চেয়ে বেশি। যিনি শিল্পী—বিশেষ করে যিনি সচেতনভাবেই নিজের শিল্পসত্তার মান জানেন—তাঁর পক্ষে শিল্পের ক্ষতি করেও জীবনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা সহজ নয়। এ-ত্যাগের বিশেষ চরিত্র আলাদা। শিল্প চিরকালের জন্য, জীবন আপাতকালের জন্য, সবারই জানা। সেই আপাতকালের আনন্দের জন্য চিরকালের আনন্দকে বঞ্চিত করা শিল্পীর পক্ষে কঠিনতম আত্মত্যাগ।—ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ কেটে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার কাহিনীটি মনে পড়ে যায়। একলব্য, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি সামনে রেখে নিজের চেষ্টায় ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হন। যে-গুরু নিষাদ বালককে হীনজাতি বলে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেননি, তাঁকেই গুরুদক্ষিণা দিতে হয়েছিল একলব্যকে—তীর-নিক্ষেপের প্রধান আঙুলটি কেটে ফেলে। শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনায় একটি মানুষের মহত্ত্ব আর অন্য মানুষের আপাতকালীন প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টান্ত দেখে মহাভারতের ঐ কাহিনীটিই আমার মনে পড়ত।

শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম যৌবনে যাঁকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর সান্নিধ্য থেকে চিরকাল নিজেকে অনেক দূরে রেখেছিলেন, নিজের সামাজিক অযোগ্যতার জন্য। মনের ভিতরে তাঁর সান্নিধ্য গড়ে নিয়ে শিল্পে তা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। শিল্পীর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ কেটে তিনি নিজের নিঃশব্দ প্রেমের নিঃশর্ত দক্ষিণা দিয়েছিলেন।

তিনি আমাকে লেখা একটি বহুপরিচিত চিঠিতে 'আমার একটি গারজেন আছে' বলে যাঁর উল্লেখ করেছিলেন, তিনি শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—শরৎচন্দ্র যেন বালবিধবা চরিত্র নিয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসে আলোচনা না করেন। আরও তো অনেক রকমের নারী-চরিত্র আছে, বালবিধবা বাদ দিলে ক্ষতি হবে না।

শরৎচন্দ্র এর উত্তরে জানিয়েছিলেন—'আমার কলমে যে-সকল চরিত্র আপনা

থেকেই সহজে আসতে চায়, তাকে রোধ করে রাখা আমি উচিত মনে করি না। তবে কোনও ভয় নেই, আমি এমন বাল্যবিধবা কোনওদিন আঁকবনা, যা তোমার সম্মানে বা মনে আঘাত দিতে পারে।'

এই করুণ মর্মস্পর্শী কাহিনীটি আমার কাছে গল্প করার পরে শরৎচন্দ্র আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন কখনও কাউকে এ-তথ্যটি জানাবে না। বলেছিলেন, 'তোমাদের পেটে খবর কখনই হজম হয় না। তুমি যদি এটা প্রকাশ করে ফেল, মুশকিলে পড়বে। আমি তখন সরাসরি অস্বীকার করে বসব ও-কথা আমি তোমাকে বলিনি। তুমিই অপ্রস্তুতে পড়ে যাবে কিন্তু।' আমি বলেছিলুম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বড়দা। মেয়েদের মধ্যে অনেক কিছুই আপনি দেখতে পেয়েছেন, যা অন্যে দেখতে পায়নি। শপথ নিলুম মনে, আমার মুখ থেকে আপনার যা একান্ত গোপন, তা বাইরে আসবে না।'

হেসে আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন। আর কিছু বলেননি।

আজ দূরলোকবাসী শরৎচন্দ্রের কাছে শপথ ভঙ্গ করে তাঁর মুখ থেকে পাওয়া দু'চারটি তথ্য আমার দেশের বর্তমান ও অনাগতকালের মানুষদের সামনে প্রকাশ্যে রেখে যাচ্ছি। মহাকালের স্রোত সেদিনের সেই তীব্র উৎকণ্ঠা আর কলঙ্কভীতির অস্বস্তিকর আবহাওয়া ধুয়ে নিয়ে গেছে। আজকের দিনের সামাজিক আবহাওয়ায় শরৎচন্দ্রের জীবনসত্য প্রকাশিত হলে কোনও ব্যক্তি কিংবা কোনও পরিবারের সামাজিক অস্বস্তি ঘটবে না। কারও কোনও হানির সম্ভাবনা নেই।

স্বভাব-বিদ্রোহী বেপরোয়া-প্রকৃতির মানুষটির সামাজিক বিদ্রোহের স্বাধীনতা হরণ করে দক্ষিণা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর স্বনির্মিত 'গারজেন'। মূল কথা, শরৎচন্দ্রেরই স্বনির্ভর প্রগাঢ় প্রেম—তাঁর শিল্প যন্ত্রণা বুঝতে হলে এটি নিশ্চয়ই একটি জরুরী তথ্য। সন্দেহ নেই একজনের কাছে আত্মশপথ পালনের দায়িত্বে শিল্পী শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বিশ্বাসের পথে অবাধ চলায় বাধা ঘটেছে। সামাজিক কলঙ্কভীতি নিন্দাভীতি শরৎচন্দ্রের নিজের তখন যে আদপেই ছিল না তা বলা বাহুল্য। সারা যৌবনকাল কেটেছে তাঁর নিরঙ্কুশ সমাজবিদ্রোহিতায়।

২

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখতে বসে প্রথমেই আমার বাধা ঠেকছে নিজেকে নিয়ে' তাঁর ব্যক্তিগত কথা বলতে গেলে সর্বত্রই নিজেকে উপস্থিত রাখা ছাড়া উপায় নেই। অথচ, শরৎ-মঞ্চে নিজেকে জাহির করা একন্তই আমার অমনঃপূত এমন কি রুচিবিগর্হিত ঠেকছে। কিন্তু কোনও উপায় নেই, নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে লেখার,—যেহেতু এক্ষেত্রে নিজে তৃতীয় ব্যক্তি হওয়ার উপায নেই।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের ধরনটি যেমন অনন্যপূর্ব, তাঁব জীবনচরিতও তেমন অনন্যপূর্ব। পরস্পর-বিরোধী এমন অদ্ভুত গল্প-ছড়ানো জীবনকাহিনী লেখকের জীবৎকালেই প্রচলিত হতে বড় একটা শোনা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও নানা কাল্পনিক গল্প তাঁর জীবনকালে আমরা শুনেছি। সে কিন্তু অন্য ধরনের। তাতে আপত্তি করার মত কিছু থাকত না, বরং বোঝাই যেত, তাঁর শিল্প ও সৌন্দর্য সাধারণ মানুষের মনে-যারা তাঁকে চেনে না, তাঁর জীবনযাত্রা জানে না—তাদের কল্পনায় তাঁর সম্বন্ধে কী ধরনের অসম্ভব অনুমান বানিয়ে তোলে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গল্পগুলি ছিল যথেষ্ট আপত্তিজনক। অখ্যাতিমূলক এই সব বাজে গল্প শুনে তিনি কিন্তু প্রতিবাদ করতেন না, বরং উপভোগ করতেন যেন। অনেক সময়ে কোনও আপত্তিকর কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়েছেন, দুঃখিতও হয়েছেন কখন-সখন' কিন্তু প্রতিবাদ করতে বললে সম্মত হতেন না, অবিচলিত থাকতেন। সুখ্যাতিতে তাঁর লোভ ছিলনা বলব না, পত্র-পত্রিকায় নিজের লেখার প্রশংসা পড়লে শিশুর মতন উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি, মিথ্যা গুজবের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প কানে শুনেও স্থির থাকতে দেখে। প্রতিবাদের কথা কেউ তুললে—একটি গভীর উদাস হাসি ফুটে উঠত মুখে। বলতেন-কী হবে প্রতিবাদ করে? যারা আমাকে চেনে, তারা কখনই এ-গল্প বিশ্বাস করবে না। যারা চেনে না, তারা যদি ভুল ধারণা করে, তাতে এসে যায় না।

কত অচেনা মানুষ সম্পর্কে আমরাও হয়ত কত ভুল ধারণা নিয়েই বেঁচে থাকি।

এই গুজব সম্পর্কে একটা অদ্ভুত কথা বলব। শরৎচন্দ্র নিজেই নিজের সম্বন্ধে নানা রকম বাজে গল্প বলতেন। পরে বলেছেন,—ওটা ঠিক আমার জীবনে ঘটেনি বটে, কিন্তু আমারই জানা অন্য একজনের ঘটেছে। একবার তাঁর নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে একটি খুনের গল্প বলেছিলেন। আমরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলুম। সেদিন জনকতক বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি নতুন এসেছেন তাকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে। গল্পটি ছিল কয়েকজন মিস্ত্রির মত্ত অবস্থায় বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া। জায়গাটা বেশ নোংরা। মত্ততার ঝগড়া বাড়তে বাড়তে তাদের আচরণ কত অদ্ভুত হয়ে উঠল, তাদের কথা-বার্তা আর আচরণ কত অসংলগ্ন অর্থহীন হয়ে গেল,—শেষ পর্যন্ত একজন মত্ত ব্যক্তি অপরাধীর ভূমিকায় কী-রকম কাতরভাবে সকলের পায়ে ধরে মার্জনাভিক্ষা করতে লাগল,—আর অন্য একজন সুরামত্ত লোক বিচারকের ভূমিকায় প্রচণ্ড রাগে হাতের কাছে একটি কুড়ুল পড়েছিল, তাকে সেই কুড়ুলের ঘায়ে সত্যি সত্যি খুন করে ফেললো। শরৎচন্দ্র সেই খুনের আসর থেকে কেমন করে বাইরে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে পালিয়েছিলেন, হাত পা কেটে ছড়ে রক্তাক্ত কাপড় ফালা ফালা ছিঁড়ে,—তার আতঙ্ককর বিবরণ তিনি চমকপ্রদভাবে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। ঘরের সমস্ত মানুষ আমরা তখন বিস্ময়ে ভয়ে উত্তেজনায় নিঃশ্বাসরুদ্ধ কাঠ হয়ে গিয়েছিলুম।

শরৎচন্দ্রের লেখা যেমন পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না, গল্প বলাও ছিল তেমনি আকর্ষণীয়। নিঃশ্বাস রোধ করে শুনতে হত, এমনি ছিল বলার ভঙ্গি। প্রত্যেক কথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকত না।

সেদিন যে-ভদ্রলোকেরা শরৎদার সঙ্গে নতুন আলাপ করতে এসেছিলেন, তারা তো স্তম্ভিত। আড়ষ্ট হয়ে শুকনো মুখে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে দাঁড়ালেন একে একে সকলে। যত ভাল লেখকই হন না, ঐ রকম পরিবেশের মানুষ যিনি, আর ঐ গল্প ভদ্রসমাজে বিস্তৃত বর্ণনা স্বচ্ছন্দে করতে যাঁর রুচিতে বাধে না, সেই ব্যক্তিটির সঙ্গ-সাহচর্যের জন্য তাঁদের তখন আগ্রহ উবে যাওয়া আশ্চর্য নয়। পাড়ার দু'-একজন ভদ্রলোকও এটা-ওটা ছুতো করে উঠে পড়লেন। গল্পটি রোমহর্ষক হলেও বিস্ফোরকও ছিল। সভ্য ভব্য ছাপোষা গৃহস্থের পক্ষে একটি খুনে ডাকাতের সাহচর্যটা খুব স্বস্তি-জনক নয়। তাঁরা উঠে গেলে, শরৎচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন,—ওরা আমার সম্বন্ধে আজ যা ধারণা করে গেল, সেটা ওদের উপন্যাস-পড়া খুশির সঙ্গে মিলবে না। এই জাতের একটা নোংরা মানুষকে এত খাতির করে গেল ভেবে—ওদের গা ঘিনঘিন করবে।

ঐ গল্প বলার কিছুদিন পরে একদিন শরৎদা আমাদের বাড়ির বৈঠকে গল্পগুজব করছেন বিকেলবেলায়। বর্মারই গল্প। প্রসঙ্গক্রমে সেই মিস্ত্রিদের কথা এসে পড়ল। বললেন—'সেই যে—বীরেন মিস্ত্রি—খুনের হাঙ্গামায় যে পড়েছিল, যার দাদা তাকে আরাকানে পাঠিয়ে দিয়ে বাঁচিয়েছিল—' ইত্যাদি। আমি তাড়াতাড়ি জেরা করতে লাগলুম তাঁকে। জানা গেল, সেই খুনের কাহিনীটি ওদেরই মুখে শরৎদার শোনা। তিনি স্বয়ং ঘটনাস্থলে আদপেই উপস্থিত ছিলেন না। অথচ, সেদিন নিজের বৈঠকখানায় একঘর লোককে পাথরের মূর্তি বানিয়ে দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা নিয়ে গল্পটি বলেছিলেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললুম—'তবে যে আপনি সেদিন বললেন, আপনিও ওদের সঙ্গে ছিলেন। বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে লোহার তারের কাঁটায় হাত পা ছড়ে, জামাকাপড় ছিঁড়ে পালিয়ে ছিলেন?'

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন—ওটা সত্যি কথাই। পালিয়ে ছিল ট্যারা কানাই। সে-ই তো আমাকে সমস্ত গল্পটা পরে এক সময়ে বলেছিল। গল্পটা কিন্তু যথার্থ সত্যি।

আমি খুব রেগে গিয়েছিলুম। 'তা বলে ঐ রকম একটা বিশ্রি জায়গায় মিস্ত্রি মজুরদের মাত্‌লামি খুনখারাপির মধ্যে নিজেকে 'হিরো' করে গল্প বলতে ভদ্রলোকদের সামনে আপনার বাধলোনা বড়দা? অতলোক আপনাকে সেদিন কী না কী ভাবল বলুন তো? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করচে!'

শরৎদা হেসে উঠে বলেছিলেন—ওটি চাক্ষুস ঘটনা না বললে গল্প ঐ রকম জমে উঠত কি? রাগ করিস কেন? আমি ছিলুমনা বটে, কানাই তো সত্যিই সেখানে ছিল। তার কাঁটাতারে হাত পা ছড়ে রক্তপাত হয়েছিল, কাপড় ছিঁড়েছিল, সমস্তই সত্যি। শুধু কানাই নামটার বদলে 'শরৎ চাটুয্যে' বসিয়ে দিয়েছি মাত্তর।

সেদিন আমার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল মনে আছে। নিজেকে এমন হেনস্থা করতে পৃথিবীতে আমি দ্বিতীয় মানুষকে দেখিনি। নিজের নামে নিন্দে করতে, নিজেকে মন্দ বলতে তাঁর যেন একটুও বাধত না। অন্যের প্রতি তিনি যত বেশি কোমল করুণার্দ্র ছিলেন, নিজের প্রতি ততই নির্মম ছিলেন দেখেছি। নিজেকে যেন তিনি সর্বদাই তীব্র বিদ্রূপ করতেন, আমার মনে হত। কারও চোখে জল তিনি সইতে পারতেন না। সেদিন আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে সুন্দর সুন্দর কথায় বুঝিয়েছিলেন। আমি লিখে রাখিনি বলে এখন খুবই অনুশোচনা হয়। যতটা মনে আছে, বলি। বলেছিলেন,—তুই এত কাতর হচ্ছিস কেন রাধু? ভেবে দেখ্, কানাই একটি ব্যক্তি, আমিও একটি ব্যক্তি। তার অভিজ্ঞতা আর আমার অভিজ্ঞতায় তফাৎ কিছুই নেই। তফাৎ

শুধু ব্যক্তিত্বে। আমি কিন্তু সব মানুষেরই ব্যক্তিত্ব নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারি। তখন, সেখানে ওরা মাতাল হয়ে আসামী আর বিচারক বনে গিয়েছিল। মত্ত অবস্থায়, ওরা কে কী-রকম অনুভব করছিল, সেটাও আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। ঘাড়ে কোপ মারা পর্যন্ত ওরা একরকম কাল্পনিক অনুভূতির জগতে বাস করছিল,—রক্তের ফিন্‌কি ওদের সহজ চৈতন্যে ফিরিয়ে এনেছিল। চৈতন্য যখন হল, তখন ওদের প্রথমেই হয়েছিল প্রচণ্ড ভয়,—তারপরে মৃত বন্ধুর জন্যে মর্মান্তিক কষ্ট।

এই রকম অনেক বিশ্লেষণ করে সেদিন বুঝিয়েছিলেন, মানুষ আসলে সকলেই সমান। জন্মসূত্রে বা অবস্থাসূত্রে তারা বিভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়ায় যেটা—সেটা বহিরঙ্গের ব্যাপার। কেউ বিদ্বান, কেউ মূর্খ, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ পরিশীলিত, কেউ অমার্জিত—ভিতরে কিন্তু একই নিয়মে মানুষ থাকে, তার শরীরের আর মনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সুখ দুঃখবোধ একই।

শরৎদা এই ধরনেব কথা অনেক সময়েই বলতেন। 'ভেতরের মানুষ' 'ভেতবের মানুষ' এই বাক্যটি তাঁর ঘনিষ্ঠ কথাবার্তার মাত্রা ছিল। মুড্‌ না এলে তিনি সিবিয়স্‌ কথা কইতেন না। বেশিক্ষণ সিরিয়স্‌ থাকতেনও না। একলা থাকলে, মন খারাপ থাকলে, শরীর খারাপ হলে,—তিনি ঠাণ্ডা গভীব সুরে কথা কইতেন আত্মগতভাবে।—যেন খুব অতল থেকে কথাগুলো একটা একটা করে তুলছেন বলে মনে হত। কথা এমন কিছুই নয়, সাধারণ সহজ কথাই। কিন্তু সে অন্য রকম। মনে হত, তার চেয়ে খাঁটি, তার চেয়ে সত্যি বুঝি সংসারে আর কিছু হতে পারে না। তখন আমার মুখ থেকে একটিও শব্দ ফুটত না। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকতুম। কারণ, তখন তো তিনি অন্য একজন মানুষ। যাঁকে ঠিক আমি চিনি না। ভয়ে আর সম্ভ্রমে মন আড়ষ্ট থাকত।

আর-একদিনের একটি ঘটনা বলি। সেদিন রবিবার। আমরা দুজনে সকালে সাড়ে ন'টা আন্দাজ সময়ে অশ্বিনী দত্ত বোডে গিয়েছি। গিয়ে দেখি, তখনও শরৎদা একতলায় বৈঠকখানায় নামেননি। রবিবারে সকাল-সকাল বৈঠকখানায় নামতেন। চাকর বললে—এখনও ওঠেননি, শুয়ে আছেন।

অসুখ করেছে নাকি মনে করে উদ্বিগ্ন মনে দুজনে আমরা দোতলায় উঠে গেলুম। তাঁর শোবার ঘরের দরজার মুখে বাড়িসুদ্ধু লোকের জটলা। ফিস্‌ফিস্‌ কথাবার্তা।

—কী ব্যাপার?

প্রকাশবাবু নিচু গলায় বললেন—মুশকিল হয়েছে। কাল শেষরাত্রে দুটো চোর বাড়ির সামনে ধরা পড়েছিল। তাদের পুলিশে দেওয়া হয়েছে—সেই

দুঃখে দাদা বিছানা নিয়েছেন। একটু কৌতুকের সুরেই বললেন যদিও, তবুও তাঁর বেশ উদ্বেগ হয়েছে, বোঝা গেল। বউদি (হিরণ্ময়ী দেবী) ব্যগ্র হয়ে আমাব স্বামীকে বললেন—ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে এসে পড়েচ, খুব ভাল হয়েচে। কিছুতেই তো তোমার দাদাকে ওঠানো যাচ্চে না। চা দেওয়া হয়েচে,—পড়ে আছে, তামাক পর্যন্ত পুড়ে পুড়ে নিবে গেল। তোমরা একটু ভেতরে গিয়ে দেখ না,—যদি ওঠাতে পার।

কাহিনীটি এই,—ভোর রাত্রে বাড়ির সামনে রাস্তায় হৈ-চৈ চেঁচামেচি শুনে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। উনি উঠে নিচে নেমে যান। গিয়ে দেখেন ওঁদের বাড়ির ঠিক সামনেই, দুটো অল্পবয়সী ছেলেকে পাড়াসুদ্ধ লোক দারুণ ঠেঙাচ্ছে, তাদের চোখ মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি গেট খুলে বেরিয়ে চোর দুটিকে ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে বাড়ির মধ্যে টেনে এনে গেট্ বন্ধ করে দেন। জনতা এতে আরও রেগে যায়, আপত্তি করতে থাকে। তাদের হাতে ওদের ফিরিয়ে দিতে বলে। শরৎচন্দ্র তাদের বলেন—বামাল যখন ধরা পড়েছে, তখন ওদের পুলিশে দিতে পার তোমরা, কিন্তু খুন করে ফেলতে পার না।

তখন পাড়ার লোকেরা শরৎদার বাড়ির দোতলায় উঠে এসে পুলিশে খবর দেয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বামাল সমেত চোর দুটিকে পাওয়া যাবে পুলিশ স্টেশনে বলে দেওয়া হয়।

চোর দুটির চোখ মুখ তখন ভিমরুল কামড়ানোর মতন ফুলে উঠেছে। উনি নিজে তাদের আইডিন তুলো টুলো এনে শুশ্রূষা করেছেন। খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন তাদের জন্যে। দু-গেলাস গরম চা বানিয়ে দেবার হুকুম করেছেন। এদিকে চোরেরা কিন্তু ওঁর দুই পা জড়িয়ে কান্না শুরু করেছে—'আমাদের পুলিশে দেবেন না বাবু, যত খুশি আপনারাই মারুন। আর কখনও এমন কাজ করব না।' কিন্তু তখন তো আর উপায় ছিল না। একটু পরেই পুলিশের গাড়ি এসে ছেলে দুটোকে ধরে নিয়ে চলে গেল। পাড়ারই পণ্ডিতিয়া বস্তির ছেলে ওরা।

সেই থেকে উনি বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বলছেন—আমিই ছেলে দুটোর জীবনের সর্বনাশ করে দিলুম।

হিরণ্ময়ী দেবী, প্রকাশচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের মুখে সব কাহিনী শোনা গেল। ওঁরা বড়বাবুর ঘরের মধ্যে বুড়ি ও বাঘাকে (শরৎচন্দ্রের ভাইয়ের ছেলে ও মেয়ে) পাঠিয়ে ওদের দুজনকে দিয়ে 'জিয়া'কে ওঠাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। শরৎদা ভাইপো ভাইঝি দুটিকে খুবই ভালোবাসতেন। শ্রীমান অমলকে তিনি তখন নাম বলতেন, অমূল্য। ডাকতেন 'বাঘা' বলে। বলতেন, ও আমাদের ভবিষ্যতের অমূল্যধন। মুকুলকে বলতেন 'বুড়ি'। 'বুড়ু'। ওরা ওঁকে ডাকত

'জিয়া'।

আমরা তো আস্তে আস্তে তাঁর ঘরে ঢুকলুম। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। দৃষ্টি বিষাদ-ভারাতুর, মুখ শোকাচ্ছন্ন।

আমার স্বামী কথায়-কথায় তাঁকে কিছুটা স্বাভাবিক করে আনলেন। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নতুন করে চা বানিয়ে আনতে বলা হল। শরৎদা কেবলই বলতে লাগলেন—কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ছেলে দুটো, এবারে দাগী-চোর হয়ে গেল ওরা। ওদের বাঁচবার পথ আমিই বন্ধ করে দিলুম নরেন। পুলিশে যে আরও ওদের মারবে না তারই বা কি গ্যারাণ্টি আছে?—শুধু নিজের নার্ভকে, নিজের বিবেককে আরাম দেবার জন্যে আমি ওদের মারধোর বন্ধ করে ফোন করিয়ে জেলে পাঠালুম। এটা মোটেই করুণা নয়, উদারতা তো নয়ই, এ কেবল স্বার্থকেন্দ্রিকতা। আমি ঐ বীভৎস মার চোখে দেখতে পারছিলুমনা, সহ্য করতে পারছিলুমনা। আমার মুহূর্তের অস্বস্তিটাই বড় কথা হল। তাই, মের না, বরং পুলিশে দাও—বলে বসলুম।

শরৎচন্দ্র উঠলেন, চা খেয়ে গড়গড়া নিয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে বসলেন। নিচে খবর পাঠানো হল, তিনি আজ নিচে নামবেন না, শরীর ভাল নেই। রবিবার বলে অনেক দর্শনার্থী নিচে বৈঠকখানায় বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা ফিরে গেলেন।

শরৎদা পড়ারঘরে সেদিন আমাদের কাছে অনেকক্ষণ ধরে ঐ বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। যতটা মনে আছে বলছি।

উনি বলতে লাগলেন—ওরা যে চোর হয়েচে, এটা কাদের দোষ? এই আমরা, আমাদেরই দোষে। আমরা যারা ওদের ধরে ঠ্যাঙাচ্ছিলুম, ওদের পুলিশে দিলুম—আমরাই ওদের চোর বানিয়েছি। এই উচ্চবিত্ত সমাজের অন্যায়ে, অত্যাচারে, স্বার্থপরতায় আর অবিশ্বাসে বস্তির ছেলেগুলো চোর হয়। ওরা তো চোর জোচ্চোর হত না—যদি কপালগুণে এই সব দোতলাবাড়িতে জন্মাত।

কোথায় ওদের নিঃস্ব জীবনটাকে গড়ে তোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেব তা নয়, সর্বদা ওদের অবিশ্বাসের নজরে আব ঘেন্নার নজরে ঘিরে রেখেচি। কী করে ওরা সৎ হবে, সাধু হবে? কী আছে ওদের আশেপাশে সম্বল? অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা ছাড়া জীবনে কিছুই পায় না ওরা।

এই আমাকেই দেখ না! কী করলুম আমি ওদের জন্যে? পুলিশে ধরিয়ে দিলুম। কোথায় ওদের ভ্রষ্ট জীবনটাকে নতুন করে গড়বার সুযোগ করে দেব, তা না করে থানায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। তার ফল এই, ওরা দাগী হয়ে গেল, ক্রমশ আরও বদ্ কাজ করতে করতে নিচে নামতে থাকবে। কারণ, ওরা কাজ করার আর সুযোগ পাবে না। ওদের তো আমি পানিত্রাসে নিয়ে যেতে পারতুম, চাষবাসের কাজ শেখাতে পারতুম। ওদের চুরি করার

মূল কারণটা দূর করার চেষ্টা করা উচিত ছিল নাকি? তা নয়, জন্মের শোধ ওদের দাগী চোর করে ছেড়ে দিলুম।

শরৎদার সেদিনের আপসোস গভীরভাবে আমাদের মনকে স্পর্শ করেছিল। সত্যিই সেদিন উপলব্ধি করেছিলুম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিষাক্ত বাষ্প কীভাবে দেশের প্রাণ শুষে নেয়। কীভাবে একের পাপে অন্যে শাস্তি ভোগ করে। শরৎদার কাছেই আমার সমাজচেতনা প্রথম জাগ্রত হয়েছিল। তাঁর মনের মধ্যে সত্যি সত্যিই মানুষের শ্রেণীভেদ ছিল না। সামাজিক শ্রেণীবিচারকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না, মূল্য দিতেননা। তাঁর নিজের জীবনে তা বরাবর প্রমাণিত করে গেছেন। উনিশ শতকের সময়ে শরৎদা নিজের বাস্তবজীবনে শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধতা করেছেন আচরণে, চিন্তায় আর লেখাতে তার প্রবল প্রকাশ দেখা গেছে। তখন কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লবের চিহ্ন দেখা দেয়নি।

চোর ধরলে মধ্যবিত্ত-সচ্চরিত্র-চিত্তে যে বিমল আহ্লাদ হয়, যে আত্মতুষ্টি জাগে—'ঐ লোকটা চোর, আমি কেমন সাধু সৎ', এই মধ্যবিত্ত আত্মপ্রতারণা শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল না। অন্যকে চোর বলার আগে তিনি নিজের দিকে তাকাতেন।

সমাজের যত অবহেলিত, অপমানিত, অপ্রীতিভাজনদের জন্যেই তাঁর হৃদয়ের দ্বার অবারিত ছিল। সমাজ যাদেরই একটু বাঁকা চোখে দেখেছে, শরৎচন্দ্র তাদের বুকে টেনে নিয়েছেন। অত্যাচারিতের প্রতি তাঁর মমতার অবধি ছিল না।

৩

শরৎচন্দ্রের মধ্যে বালকোচিত ভাবটি মাঝে মাঝেই নানাভাবে ফুটে উঠত। কৈশোরে মানুষ এক একটি সামান্য কাজে নিজের ইচ্ছাকে বিজয়ী করার জন্যে অসামান্য পরিশ্রম করে। শরৎচন্দ্রকে ছোটখাট সামান্য ব্যাপারে সেই ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে মাঝে মাঝে দেখা যেত। হয়ত কোনও পাড়ার ছেলেরা একটি ক্লাব গড়তে চেষ্টা করছে, কিছু বাধা বিঘ্ন দেখা যাচ্ছে—শরৎদা সেই ব্যাপারে এতই সিরিয়স্ হয়ে তাদের জন্যে ভাবনা চিন্তা চেষ্টাচরিত্র শুরু করতেন, মনে হত তিনি নিজেই যেন একজন কিশোর উদ্যোক্তা। কোথায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কোথায় থানার ও সি, কোথায় কোন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট,—কাকে ধরতে পারলে সমস্যাটির ফয়শালা হতে পারে-- তার জন্যে তাঁর মহা উদ্বেগ। সাহায্যপ্রার্থী উদ্যোক্তা ছেলেদের সঙ্গে তিনি যেন তাদেরই বয়সী হয়ে গিয়ে শলাপরামর্শ করতেন। তাঁর অন্তঃস্থল থেকে চঞ্চল একটি ছেলে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ত দুরন্ত বেগ নিয়ে, বয়স্ক সত্তার দেহ-দৃশ্যের স্থির পটটি অস্বীকার করে। সবাই আমরা বলতুম—বেজায় খেয়ালী মানুষ।

এইরকম ব্যাপারে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত একটি গল্প বলি। এ-গল্পটি রবিবাসর সংস্থার 'রবিবাসর' নামে বইতে বোধ হয় খুব সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে ব'লে মনে পড়ছে। বইটি হাতের কাছে নেই। ব্যাপারটি বিস্তারিত ভাবে খুলে বললে শরৎচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে।

'রবিবাসর' নামে সাহিত্যিকদের একটি মিলন-সংস্থা তখন নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েক বছর। সদস্যারা সকলে কিন্তু সাহিত্যিক নন। বেশির ভাগই সাহিত্যরসিক, সাহিত্যপাগল, সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী মানুষ। এঁরা সাহিত্যিকদের সাহচর্যের জন্যে উৎসাহিত সদস্য হয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে প্রথম দিকে বছরে বার দুই, শেষদিকে প্রতি বছরে একবার করে 'রবিবাসরে'র বৈঠক বসত। রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন মশায় একদিন ৫নং হিন্দুস্থান পার্কের

আমাদের অস্থায়ী বাড়িতে বললেন—রাধাকে এবারে আমাদের রবিবাসরের সদস্য করে নিতে হবে। শরৎচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রবলভাবে আপত্তি করে উঠলেন—না। কখনও না। রবিবাসরে মেয়েসভ্য নেওয়া চলবে না। আমার আত্মসম্মানে লাগল। আমি বিদ্রোহ করে বললুম—কেন? মেয়েরা কি সাহিত্যিক নয়? সাহিত্যসংস্থার যে-কোন পুরুষ-মেয়ের যোগ দেবার সমান অধিকার। মেয়েরা কি লিখছে না? তারা কি সাহিত্য-পাঠক নয়? শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—মেয়েরা সাহিত্যিকও বটে, পাঠকও বটে। কিন্তু ওদের স্বজাতীয় নিজস্ব আড্ডা অনেক আছে, যেখানে পুরুষরা উঁকিও দিতে পারে না। তারা অবাধে যা খুশী প্রাণমন খুলে বলতে পারে। রবিবাসরকে 'সাহিত্যসভা' করে তোলা হবে না, ওটাকে সাহিত্যিকদের 'সাহিত্য-আড্ডা' করে গড়ে তোলা দরকার। তোমরা এসে ঢুকলে আমাদের জিভে লাগাম লাগিয়ে কথাবার্তা কইতে হবে। না,—না—সে ঠিক হবে না। ভুল হবে। এমনিতেই তো কেউ কেউ ওটাকে সাহিত্যসভা বানাবার মতলবে উঠে পড়ে লেগেছেন। সভাপতি, প্রস্তাবক, —ঘোষণা মাফিক সাহিত্যপাঠ—ধন্যবাদজ্ঞাপন—আরে ছি—ছি গোটা জ্যান্ত জীবটাকে কবরে ঠেলে দিয়ে তার চমৎকার স্ট্যাচু বানিয়ে আহ্লাদ করা। স্বচ্ছন্দ অবাধ ব্যাপার হতে না দিয়ে আড়ষ্ট কৃত্রিম ব্যাপার করে তোলা। রবিবাসর হবে স্রেফ্ আড্ডা। পরস্পরে দেখাশুনো, গল্পগুজব, চা, তামাক চুরুটের ধোঁয়ায় রাজা-উজীর মারা। তারই মধ্যে যে যা লিখেছে বা লিখচে তাই নিয়ে পরস্পরে আলোচনা। চলতি-সাহিত্য মাসে মাসে বাজারে যা নতুন উঠছে—তাদের নিয়ে মত বিনিময়। এছাড়া অন্য কিছু ঠিক নয়। জলধর সেন বললেন—কিন্তু সাহিত্যসংস্থায় মহিলা সাহিত্যিকরা বাদ পড়লে অসম্পূর্ণ হবে না কি? আমিও বিতর্কে যোগ দিয়েছিলুম। উপস্থিত সকলেই মহিলা সদস্য নেওয়ার স্বপক্ষে একমত—একমাত্র শরৎচন্দ্রই অটল বিরোধী। তর্ক বেশ উত্তেজনায় পেঁৗছে গেল—শরৎচন্দ্র বললেন—বেশ, রবিবাসরে মহিলা সদস্য নেওয়া হবে কি হবে না, এটা কবির উপরে বিচারের ভার দেওয়া হোক। তিনি যদি বলেন 'রবিবাসরে' মেয়েসদস্য নেওয়া হোক,—তাহলে তাই হবে। কিন্তু আমি বলচি,—তিনি কখনই মেয়েসদস্য নেওয়ার সম্মতি দেবেন না।

আমরা উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলুম—তিনি কখনোই অমত করতে পারেন না। করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

শরৎচন্দ্র হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে। ঐ কথাই তাহলে রইল।

জলধরবাবু বলেছিলেন—কবি বোলপুর থেকে কলকাতায় এলে আমি একদিন জোড়াসাঁকোয় গিয়ে তাঁকে জানিয়ে, তাঁর মত জেনে আসব।

এর বোধ হয় মাসখানেক বাদে গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছেন। তাঁর নতুন লেখা বই পড়া হবে, খবর পাঠিয়েছেন।

তাঁর পাঠ শোনার সময়ে অনেক লোকের ভিড় থাকে। কাছে গিয়ে বসা, কথা শোনা বা বলার সুযোগ থাকে না। তাঁর কাছে যাওয়ার সবচেয়ে ভাল সময় ছিল ভোরের বেলা। সদ্য সূর্যোদয়ের পরেই গিয়ে পেঁাছলে বেশ কিছুক্ষণ বসা যেত। যদিও সেই সময়েও আমাদের মত আরও অনেকে আসতেন। কবির মন মেজাজ ঐ সময়টিতে বেশ তাজা থাকত। আমি চেষ্টা করেও সেদিন বেশি সকাল-সকাল পেঁাছতে পারিনি। প্রায় আটটা বেজে গিয়েছিল। বিচিত্রা বাড়ির কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি—চেয়ে দেখলুম, সিঁড়ির ঠিক সামনের ছোট ঘরটির ভারী পর্দা ঠেলে শরৎদা বেরিয়ে আসছেন, তাঁর পিছনে বেরুলেন তুলসী গোঁসাই মশায়।

আমি তো অবাক! কালও রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত শরৎদা আমাদের বাড়ি আড্ডা জমিয়েছেন; কৈ? এখানে আজ আসবেন, কিছুই তো বলেননি! শরৎচন্দ্র দরজার বাইরে নিচু হয়ে জুতো পরতে যাচ্ছিলেন, আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে কী যেন ভাবলেন, তারপরে জুতো না পরে আবার চট করে পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। তুলসীবাবু বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন মনে হল।

আমি উপরে উঠে বাঁ-হাতি বিচিত্রা ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, বেশ কয়েকজন মহিলা, অধিকাংশই আমার পরিচিত, কেউ কেউ মুখচেনা—কবির জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। আমি সেখানে গিয়ে তখন না বসে দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইলুম শরৎচন্দ্র বেরিয়ে যদি কিছু কথা বলেন। অল্প সময় পরেই শরৎচন্দ্র আবার পর্দা ঠেলে বেরিয়ে বাইরে এলেন। চেয়ে দেখি সারা মুখ চাপা হাসিতে যেন ফেটে পড়ছে।

তুলসী গোঁসাই একটু বিস্ময়ের সুরে বললেন—কী হল দাদা? আবার কোন্ কথা আপনার মনে পড়ল?

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন 'না'-সূচক। আমি তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। তিনি আমার দিকে চেয়ে কৌতুক-ঝলমল মুখে ডান হাতের তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করলেন। যার ভাষা—'কেমন জব্দ!' কিংবা 'ঠিক হয়েছে এবার!' তারপরে জুতো পরে তুলসীবাবুর সঙ্গে নিচে নেমে গেলেন। আমি তো হতভম্ব। কিছুই বুঝতে পারলুম না। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলুম, তুলসীবাবুর মোটরে তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্র চলে গেলেন।

আমি বিমূঢ় মনে বিচিত্রায় গিয়ে অন্য মেয়েদের কাছে বসলুম। কেদার চট্টোপাধ্যায় মশায়ের পত্নী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন—শরৎ চাটুজ্যে না? তুমি তো চেন শুনেছি।

অন্য আরও দুই একজন বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শরৎ চট্টোপাধ্যায় নিশ্চয়ই। আমি ওঁকে দেখেছি অনেকবার।

আমি বললুম—হ্যাঁ, উনিই।

কবি এসে ঘরে ঢুকলেন। আমরা সকলে উঠে তাঁকে প্রণাম করতে চেয়ার ঘিরে দাঁড়ালুম। প্রসন্ন হাসিতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কারও কারও মাথায় হাত ছুঁইয়ে আশিস-স্পর্শ দিলেন—প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কুশল কিংবা অন্য প্রশ্ন করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—এই যে তুমিও এসেচ দেখছি। না বাপু, আমিও শরতের সঙ্গে একমত। তোমরা ছেলেদের একটুও জিরোতে দেবে না, সব জায়গায় পাহারা দিয়ে হাজির থাকবে—এ হয় না। ওরা একটু আড্ডায় আলগা হয়ে যা-খুশি কথা কইতে—হো-হো—করতে পাবে না এ কী করে হবে? ওটা তো ঠিক সভা-সমিতি নয়. আড্ডা। বন্ধু-বান্ধবের, সাহিত্যিকদের বিশুদ্ধ আড্ডা। ওখানে ওরা তামাক চুরুট খাবে, খোলাখুলি কথা কইবে, হাসি-তামাশা যেমন খুশি করবে।

আমার মনে পড়ে গেল রবিবাসরের কথা। আমি একেবারেই ভুলে গিয়ে ছিলুম ব্যাপারটি।

আমি কবিকে জিজ্ঞেস করলুম—উনি কি ঐ মতামত নিতে এখন আপনার কাছে এসেছিলেন?

কবি বললেন—না. না। ওকে তুলসী ধরে এনেছিল. ওদের রাজনীতির একটা কাজের দরকারে। আমি 'পারব না' বলে দিয়েচি। ওরা ভুলে যায়, আমার বয়স আর শরীরের কথা।

আমি বুঝতে পারলুম, শরৎচন্দ্রকে তুলসীবাবুই ধরে এনেছেন। বেরুবার সময় আমাকে সিঁড়িতে দেখতে পেয়ে শরৎচন্দ্রের মনে পড়ে গেছে সেই বিতর্কের কথা। মনে পড়া মাত্রই এবাউট টার্ন। তৎক্ষণাৎ কবির ঘরে দ্বিতীয়বার বিনা খবরেই ঢুকে পড়লেন।

ঘরের ভিতরে শরৎচন্দ্র কি বলেছেন, কবির কাছে জেনে নিতে অসুবিধা হল না। কবি বললেন—শরৎ বললে, তোমরা দুই মতের দল আমাকে নাকি আম্পায়ার করেচ। আমি তো প্রথমে বলে ফেলেছিলুম—মেয়েসদস্য নিশ্চয়ই নেবে বৈকি। তারাও তো সাহিত্যিক। এতে রবিবাসরের আকর্ষণ আরো বাড়বে।

শরৎ বলে—তাহলে ওটি আলোচনাসভার সিরিয়স মূর্তি ধরবে নাকি? শুনেছিলুম, আপনি নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন—রবিবাসরকে তোমরা সাহিত্যিক-আড্ডা করে গড়ে তোল। কথাটা আমারও ভারি পছন্দ হয়েছিল। মেয়েসদস্য নিয়ে সভা করা যায় আড্ডা দেওয়া যায় না। তখন নাকি কবি বলেন—হ্যাঁ, এটা ঠিকই বটে। জিভের রাশ ছেড়ে যা খুশী বলা—মেয়েদের সামনে—সম্ভব হবে না। ওটা তাহলে তোমরা স্বজাতির মধ্যে নির্ব্যূঢ় শর্তে লেখাপড়া করে নাও। ভিন্ জাতের কাউকে ঢুকতে দিও না।

কবি কৌতুক করে সমস্ত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সেদিন রবিবাসরকে নারীবর্জিত সংস্থা করার কথা বলার সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর পরিহাস করেছিলেন। সবগুলি সুস্পষ্ট মনে না থাকায়, আবছা স্মৃতি থেকে কোনও কিছু লিখলুম না।

আমার উজ্জ্বলভাবে মনে আছে—শরৎচন্দ্রের সেই মামলায় জয়ী হওয়ার উল্লাস-বিকীরিত দৃষ্টি। আনন্দ যেন ফেটে পড়ছিল চাউনিতে।

আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, কবি কখনও নারীবর্জিত রবিবাসর চাইবেন না। শরৎচন্দ্র যদি তুলসীবাবুর প্রয়োজনে আকস্মিক ওখানে গিয়ে না পড়তেন, কিংবা আমাকে যদি হঠাৎ ওখানে তিনি দেখতে না পেতেন তাহলে হয়ত তাঁর মনেই পড়ত না রবিবাসরের কথা। তিনি নিজে কবিকে ব্যাপারটি খুলে না বোঝালে মামলার ডিগ্রিটা আমাদের দিকেই এসে যেত। কবি বলেছিলেন —শিল্পস্রষ্টাদের কিছুটা মানসিক মুক্তির জায়গা না থাকলে সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কড়া সমাজে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মন আর অভ্যস্ত নীতি নিয়ম কানুনে সর্বদা বন্দীদশায় থাকে সামাজিক মানুষেরা। এরা যদি নিজেদের বন্ধু বান্ধবের কাছেও কিছুক্ষণের জন্য আলগা না হতে পারে, তাহলে রুদ্ধশ্বাস হয়ে জড়ত্বপ্রাপ্ত হবে।

আমার কিন্তু তখন ওসব কথা শুনতে বিশেষ মন ছিল না। রবিবাসরে প্রবেশের জন্যে বিন্দুমাত্র কিছু এসে যায়নি আমার। আসল ক্ষোভ শরৎদার কাছে হেরে যাওয়ার জন্যে। তাও আবার গুরুদেবের এজলাসে। অপমানে অভিমানে মন তখন অভিভূত।

এসব মিটে যাওয়ার কয়েকমাস বাদে (১৯শে জুলাই, ১৯৩৬) শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে রবিবাসরের বৈঠক বসল। রবীন্দ্রনাথ এলেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে সেই বৈঠকে, শরৎচন্দ্রের এবং রবিবাসরের নিমন্ত্রণে।

সাজ-সাজ রব উঠে গেল। শরৎচন্দ্র এসে আমার হাত দুখানি ধরে বললেন —রাধু, সমস্ত ভার কিন্তু আমি তোদের দুজনের উপরে রাখচি। তোরা গিয়ে কী করতে হবে না হবে সব ব্যবস্থা করবি।

আনন্দিত উৎসাহে দুজনে মিলে লেগে গেলুম। শরৎদার বৈঠকখানা খালি করে ধোওয়ান মোছান, সাজান হল। শ্বেতপদ্মগুচ্ছ, কদমফুল কেয়াফুল পানিত্রাসের দিকের গ্রাম থেকে ঝুড়ি ভরে এসে গেল। সুগন্ধি ধূপ জুঁইফুলের সুদীর্ঘ মাপের মোটা গোড়ে মালা, রজনীগন্ধারাশি। ফটকের দুই পাশে আর বাড়ির দরজার দুপাশে চিত্রিত মাটির ঘট, সশীর্ষ ডাব, কলাগাছ কিছু বাদ গেল না। বারান্দায়, চৌকাটে আলপনা।

ওদিকে উপরতলায় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। প্রায় শতাধিক লোকের

খাওয়ার মত আয়োজন হয়েছিল। পোলাও, লুচি, মাছ, মাংস, দই, রাবড়ী মিষ্টান্ন। ভূরিভোজ। আমরা সকাল থেকেই অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে আছি। সারাদিন পরিশ্রমের পরে বিকেলের দিকে জোড়াসাঁকোয় মোটর পাঠান হল কবিকে আনার জন্যে। সেই গাড়ীতে শরৎচন্দ্রের ভাইঝি মুকুলমালাকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে দেওয়া হল শরৎচন্দ্রের বাড়ির পক্ষ থেকে। সে তখন খুব ছোট ছিল। রবিবাসরের পক্ষ থেকে গাড়িতে কে গিয়েছিলেন, মনে নেই।

জোড়াসাঁকোয় গাড়ি রওনা হওয়ার পরেই আমি অশ্বিনী দত্ত রোড থেকে হিন্দুস্থান পার্কে চলে এলুম। শরৎদা কিছুতেই আসতে দেবেন না। এইখানেই গা ধুয়ে কাপড় বদলে নাও না! আবার বাড়ি যাবে কেন এখন? এখন তোমার চলে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি বাড়িতে কাপড় বদলানর সুবিধের অজুহাতে পালিয়ে এলুম। উনি বলতে লাগলেন—খুব শিঘ্রি ফিরে এসো। কবিকে গাড়ি থেকে নামাবার সময়ে তোমার থাকা চাই। এখানে তো সবই তাঁর অচেনা মুখ,—চেনামুখ দেখলে তাঁর ভাল লাগবে। অচেনা মুখের ভিড়ের ভেতর চেনামুখ দেখতে পেলে আরাম লাগে, আমি জানি। দেরী কোর না।

আমি তখন মনে মনে হাসছি। আমি জানি, আমি আর ফিরব না। রবিবাসরে উপস্থিত থাকব না।

শরৎদার বাড়িতে গুরুদেব আসচেন,—এটি আমার কাছে কতখানি আনন্দের আর আগ্রহের ব্যাপার উল্লেখ করা বাহুল্য। অল্প বয়সের অভিমান উত্তেজনায় শরৎদার উপর প্রতিশোধ নিতেই বোধহয় সেদিন আমি নিজেকে দারুণভাবে বঞ্চিত করেছিলুম। এখন ভাবলে লজ্জা আর আফশোস হয়।

আমার ফিরতে দেরী দেখে তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে সবাইকে অস্থির করে তুলেছিলেন বারে বারে হিন্দুস্থান পার্কে লোক পাঠিয়ে। গুরুদেব এসে পৌঁছে যাওয়ার পরে কালী ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এল—পিসিমা, চলুন। বড়বাবু সবাইকে অস্থির করে তুলছেন, আপনার দেরীর জন্যে। সভা শুরু হয়ে গেছে, আপনাকে এখুনি যেতে বলেছেন বড়বাবু।

আমি সেদিন কী জানি বোধহয় পাষাণ হয়ে গিয়েছিলুম। বলেছিলুম-বলে দিও কালী, পিসিমা বলেচেন—রবিবাসরে মেয়েদের যেতে নেই। তাই তিনি আসতে পারলেন না। গাড়ি ফিরে গেল।

শরৎদা এলেন রাত প্রায় সাড়ে এগারটার সময়ে আমার স্বামীর সঙ্গে। লোকজনের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে সবাইকে বিদায় দিতে এগারটা বেজে গেছে। শরৎদা বলেছেন—নরেন, তুমি বাড়ি চলে যেওনা। আমি তোমার সঙ্গে তার কাছে যাব।

আমার স্বামী তাঁর জন্য অপেক্ষা করে এত রাত অবধি বসেছিলেন। গাড়ি

থেকে এক ঝুড়ি লুচি পোলাও ইত্যাদি নামিয়ে নিয়ে এল একটি চাকর। শরৎদার সেই রাত্রির বিষাদ-মলিন কাতর মুখটি মনে পড়লে এখনও তীব্র আঘাত অনুভূত হয় মনে। কী করে যে অমন ছেলেমানুষী করেছিলুম—ভাবলে কষ্ট আর লজ্জা হয়। রবিবাসর সংস্থার ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের রেকর্ড দেখলে দেখা যাবে, সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে রবিবাসরে মহিলা সদস্য নেওয়া হবে না। প্রস্তাবক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সর্বাধ্যক্ষ—জলধর সেন।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র আকাঙ্ক্ষিত মহিলাবর্জিত 'সাহিত্য-আড্ডা' হয়ে ওঠেনি সংস্থাটি। যথারীতি সাহিত্যসমিতির চেহারা নিয়েছে। কিন্তু আমি ঐ সংস্থায় যোগ দিতে আর কখনও পারিনি।

৪

শরৎচন্দ্রের জীবনকালে বালবিধবারা বাঙালী সমাজের একটি বিরাট অবহেলিত অংশ ছিল। অত্যাচারিতও বটে। তারা সমাজব্যবস্থায় শোষিত হত, শাসিত হত, তা থেকে বাঁচার কোনও সুযোগ পেত না।

আমার মনে হয়,—আমার প্রতি শরৎদার মমতার একটি বড় কারণ, আমার তের বৎসর আট মাস বয়সে বৈধব্য। হয়ত বা প্রধান কারণ সেটাই।

আমাদের কাছে একটি বিস্ময়, শরৎদা তাঁর বইতে বিধবাবিবাহ কোথাও দিতে পারেননি, বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আগে বিষবৃক্ষে যা দিতে পেরেছিলেন। বইতে বিধবাবিবাহ না দিলেও, তাঁর গ্রামের বাড়িতে 'দুর্গা' নামে একটি বাল-বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহিত অবস্থায় আমি দেখেছি স্বামীসহ শরৎদারই বাড়িতে আশ্রিতা রয়েছে। শরৎচন্দ্রই উদ্যোগী হয়ে মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের বিবাহেও শরৎদার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ওঁর কাছে উৎসাহ আর সাহস না পেলে আমি কোনও দিনই হয়ত মনঃস্থির করতে পারতুম না। আমাদের বিয়েতে অনেকটাই তাই শরৎদার কৃতিত্ব ছিল বলতে পারি। কৃতিত্ব ছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও। ঐ সম্পর্কে এঁদের দুজনের লেখা চিঠিপত্রও রয়েছে। এঁদের দুজনের কাছ থেকে উৎসাহ সহানুভূতি আর সাহস আমার মনে জোর জুগিয়েছিল।

হিন্দুসমাজের প্রচলিত মানসিক সংস্কারের বিরুদ্ধতা করে এরকম জীবনের মোড় ফেরান আমার মত সাবেকী বাড়ির শুদ্ধতাবাদী মেয়ের পক্ষে তখন প্রায় অসাধ্য কর্ম ছিল বললে ভুল বলা হবে না। আমার জীবনের মহৎ ঋণ মানুষ-রবীন্দ্রনাথ ও মানুষ-শরৎচন্দ্রের কাছে আমি আমরণ বহন করে যাবো।

আমাদের বিয়ে শরৎচন্দ্রের মনে পরম তৃপ্তি দিয়েছিল আমি জানি। তখনকার সকলেই এটি লক্ষ্য করেছিলেন। যেন তাঁর নিজের মেয়ের জীবনের নিরুপায় নিষ্ফলতা দূর করে তিনি তাকে সাফল্যে উত্তীর্ণ করেছেন, এমনিই

একটি বিজয়ীসুলভ ভাব তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত।

এ-সম্পর্কে তাঁর একখানি চিঠি এখানে পুরোপুরির সবটাই উদ্ধৃত করছি। শ্রীমান গোপালচন্দ্র রায় কোনও সূত্রে খবর পেয়ে এই চিঠিখানি নেওয়ার জন্য অনেক আনাগোনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত শরৎদার এই চিঠিখানি তাঁর বইতে না দিয়ে পারিনি।

তিনি আমাদের বাড়িতে বসে চিঠিখানি কপি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এচিঠি যে অন্যের মারফতে প্রকাশ করতে কেন অনিচ্ছুক ছিলুম, এখন হয়ত তিনি বুঝে এই চিঠি দিতে না-চাওয়ার অপরাধ আমার মার্জনা করতে পারবেন।

সামতাবেড়,
পানিত্রাস পোস্ট
হাওড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

স্নেহের রাধু, তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে অবধি মনটা অত্যন্ত বিমনা হয়ে আছে। কোনও কাজেই যেন মন দিতে পারছিনে। জলধরদা লেখার তাগিদ দিয়ে পাঠিয়েচেন, নিজেরও কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী কাজের দরকার রয়েছে, কিন্তু কিছুই হচ্চে না। কল্‌কের পর কল্‌কে পালটে গুড়গুড়ি টেনে চলেছি আর ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে ক'দিন ধরে তোমাদের কথাই ভাবচি।

মনে হোলো, তোমাকে একখানা চিঠি লেখা দরকার। জানোই তো, কেমন কুঁড়ে মানুষ আমি, চিঠি লেখা আমার বাঘ! তবু, উদ্যোগী হয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসেচি এই মনে করে,—তোমাকে কতগুলো কথা যদি ভালো করে বোঝাতে পারি, তা হলে আমার কি হবে ঠিক জানি না রাধু, তবে তোমার যে এতে সত্যিকারের কল্যাণ হবে এটুকু নিশ্চিত বলতে পারি। আমার যে খুব তৃপ্তি হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কথাটা হচ্চে এই, তোমরা মেয়েরা,—অন্যের মন অর্থাৎ পুরুষ মানুষের মন যতখানি আশ্চর্য রকম বুঝতে পারো, ঠিক ততখানিই আশ্চর্য রকম বুঝতে পার না নিজেদের মনটি। এ তথ্যটি আমার এতই নিঃসন্দেহরূপে জানা যে এটি তুমি (বড়দার কাছে) প্রমাণিত সত্য বলেই গণ্য করে নিতে পার।

রাধু, আমার সবচেয়ে বড়ো ভয়, বেশির ভাগ গভীর প্রকৃতির ভালো মেয়েদের মতন তুমিও না নিজের কাছে আত্ম অস্বীকার করে আত্মপ্রতারণা করে বোসো। এই আত্ম-অস্বীকৃতির মত আত্মহত্যা আর নেই।

আমার একটা কথা মনে রেখো বোন, সত্যিকারের ভালবাসা সব মানুষের জীবনে আসে না। এ দুর্লভের আবির্ভাব যাদের জীবনে ঘটে, তারা যদি একে

ঠিক চিনতে পারে, তবেই এর সার্থকতা। অতি-দুর্লভ হীরেও অজ্ঞ লোকে কাঁচ বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এ তো জানো। তবে একথাও বলতে পারো, সংসারে নব্বুই ভাগ মানুষই কাঁচ কুড়িয়ে নিয়ে তার ঝক্‌মকানিতে খুসি হয়ে গলায় গেঁথে পরে গর্বিত হয়ে বেড়ায়। যা নিয়ে তারা গর্ববোধ করে, আসলে তা তুচ্ছ কাচ খণ্ড মাত্র। দেখতে অবশ্য হীরেরই মতন।

তুমি হয়তো বলবে—পাকা জহুরী না হোলে হীরে চে. .ো সহজ নয় বড়দা।

ঠিক কথা দিদি! আমি তোমাকে বলি শোনো, হীরে আর কাচ পরখ্‌ করার সহজ উপায় তো রয়েছে। জোরে আছড়ে ফেললেই কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, হীরে কখনও টসকায় না। হীরে দিয়ে কাচ কাটা যায়, কাচ দিয়ে হীরে কাটা যায় না।

সত্যিকারের ভালবাসার পরখ্‌ হোলো ত্যাগের প্রবৃত্তিতে। যে-ভালবাসায় যতো বেশি কল্যাণবুদ্ধি, যতো আত্ম উৎসর্গের প্রবৃত্তি, ত্যাগের প্রবৃত্তি আপনা হতেই গভীরতর আর দৃঢ়তর হতে থাকে, সেই ভালবাসাই জেনো খাঁটি জাতের।

দুনিয়ার সব জিনিসেরই আসল নকলের যাচাই আছে যখন, ভালবাসারও যাচাই আছে। অকৃত্রিম ভালবাসা পাত্রের দোষ-গুণ-নিরপেক্ষ হয়। সে তাব প্রিয় ব্যক্তির সমস্ত কিছুই সুন্দর দেখে, আশ্চর্য দেখে, মহৎ এবং মাধুর্যময় দেখে। এই দেখার দৃষ্টি এক আশ্চর্য দৃষ্টি।

রবিবাবু যে লিখেছিলেন—আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—এর থেকে পরম সত্য আর কিছু নেই।

ভালবাসা যখন হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখন সে চায় আধাব বা আশ্রয়। এই আধার সর্বক্ষেত্রেই যে উপযুক্ত অথবা সুন্দর হয়, তা নয়। ভালবাসা আপনিই আপন হৃদয়রসে রচনা করে নেয় তার পাত্রকে। ভালবাসার প্রতিমা রচনায় পাত্রটি খড়-বাঁশ-দড়ি মাত্র। যার উপরে চড়বে মাটি, চড়বে রঙ, চলবে তুলি, মাখানো হবে ঘাম-তেল, পরানো হবে কেশ-বেশ অলঙ্কার। এর অনেকটাই তো নিজেরই হাতে।

বড়ো ভালবাসা স্বভাবতই নিঃস্বার্থ। এ কেবল উপলব্ধিব সামগ্রী রাধু। হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিগুলির সাহায্যে, উপলব্ধির দ্বারাই স্পর্শ করা যায় একে। বুদ্ধি, বিচার, জ্ঞান, তর্ক, যুক্তি দিয়ে নয়, এই আমার নিজস্ব ধারণা।

একটা অত্যন্ত সত্যি কথা তোমায় চুপি চুপি বলি শোনো। সংসারে এমন ভালবাসাও আছে রাধু, যে, সমস্ত জীবন যাকে ভালবেসেছে, তার কাছ থেকে বহু যোজন দূরে বহু তফাতেই থাকতে চেয়েছে। তার ভালবাসাই তাকে এই দূরে সরে থাকার প্রবৃত্তি দিয়েছে।

কাছাকাছি থাকা, চোখে দেখার আকাঙ্ক্ষা,—ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেই ব্যাকুল ও তীব্র প্রবৃত্তিকেও সংবরণ করার শক্তি জোগায়—খাঁটি ভালবাসাই। সত্যকার ভালবাসা, তার পাত্র বা পাত্রীকে সুস্থ এবং সুখী দেখতে চায়, তাকে সার্থক এবং গ্লানিহীন দেখতে চায়। আত্ম পরিতৃপ্তি তার ঐখানেই।

কোনো মিলন যদি ভালবাসার পাত্রকে অগৌরবের মধ্যে নতশির করে আনে তার জীবনের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে আনে, লজ্জা দুঃখ বা অনুতাপ অনুশোচনা উন্মেষের সামান্যতমও ছিদ্র রেখে দেয় তার জীবনে,—সে মিলন কখনই কল্যাণকর হোতে পারে না, সুতরাং—বাঞ্ছনীয়ও নয়।

আবার এও সত্য, বলিষ্ঠতার অভাবে, প্রেমের প্রতি স্থির বিশ্বাসের অভাবে, আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে মিলনকে জীবনে বরণ করে নিতে যারা ভয় পায়, সেই ভীরুদেরও প্রেমের দুর্গতি সমানই ঘটে।

সত্যকার গভীর ভালবাসা—কল্যাণ বুদ্ধির আলোয় কোথাও সার্থক হয়ে ওঠে চিরবিচ্ছেদের মধ্যে, কোথাও সার্থক হয়ে ওঠে চির মিলনের মধ্যে। যে ক্ষেত্রে বিচ্ছেদেই আসে প্রেমের কল্যাণ—সেখানে সংযমের অভাবে মিলন এনে ফেললে সর্বনাশ। আবার যেখানে মিলনেই আছে প্রেমের কল্যাণ, সেখানে বলিষ্ঠতার অভাবে বিচ্ছেদ রচনা করলেও ঠিক তেমনিই সর্বনাশ ঘটে।

গভীর ভালবাসায় সকলের চেয়ে প্রয়োজন মনের বলিষ্ঠতার। মিলনে এবং বিচ্ছেদে উভয়েই কঠিন সংযম এবং দৃঢ় বলিষ্ঠতার প্রয়োজন। বেছে নিতে হয় প্রেমে, কাকে তুলে নিতে হবে মিলন, কাকে নিতে হবে বিচ্ছেদ। এরই মধ্যে প্রেমের আসল পরীক্ষা। আত্মদানেই শুধু প্রেমের সার্থকতা নয় ভাই আত্মসংবরণেও।

আজ সন্ধ্যা বেলায় তোমাকে চিঠি লিখতে বসে এই পর্যন্ত লিখে উঠে যেতে হয়েছিল। এখন রাত্রি সাড়ে দশটা। চিঠিখানা শেষ করে খামে পুরে ঠিকানা লিখে রেখে তার পরে ঘুমুতে যাবো। সংক্ষেপে কথাটা এইবার শেষ করি।

আজ তোমার জীবনে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত করেছেন তোমার 'জীবন দেবতা'। যে 'জীবন-দেবতা'র পানে তাকিয়ে তুমি ওঠো, বসো, ঘুমোও জাগো। যাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তুমি সবাইকেই ধমক দাও। সেই তোমার 'জীবন দেবতা' তোমাকে সত্যপথ দেখিয়ে দিন্—এই তোমার হিতার্থী বড়দার উদ্বিগ্ন হৃদয়ের আশীর্বাদ।

আমি তো তোমাকে সেদিনই বলেছি রাধু, আমার প্রথম জীবনে যদি এই স্বর্গীয় আশীর্বাদ না নামত আজকের এই 'আমি'র অস্তিত্বই সম্ভব হোতো না।

আমার সাহিত্যে তোমরা যা পেয়েছ, তা যদি আমি নিজের জীবনে না

পেতুম ভাই, এ সাহিত্য সম্ভব হোতো কি? সুতরাং—আমি তোমাকে পথনির্দেশের অনধিকারী নই, বিশ্বাস করতে পারো। রাগ কোরো না। সেদিন তুমি রাগ করেছিলে বলেই এত কথা লিখলুম। তোমার বুড়ো বড়দার জীবনটা একেবারেই ফাঁকিতে গড়া নয় রে ভাই! কখনও যদি সম্ভব হয়, তোমাকে বলবো একটি কাহিনী। শুনতে গল্প উপন্যাসের মতই অবাস্তব লাগবে, কিন্তু তার চেয়ে বাস্তব সত্যি আমার জীবনে আর কিছুই ঘটেনি।

আমার আশীর্বাদ জেনো। মনস্থির করে ফেল। আগামী সপ্তাহে কলকাতায় যাচ্ছি। দেখা হবে। আশীর্বাদক—বড়দা।

এ চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলো, আমার অনুরোধ।

৫

আমাদের নতুন সংসার রচনায় তাঁর উৎসাহ আগ্রহের সীমা ছিল না।

বাঃ, পর্দাগুলো তো চমৎকার কিনেছিস তোরা? রাস্তা থেকে দেখতে ভারি সুন্দর লাগছিল। কে পছন্দ করল? তুই না নরেন? ওঃ, বুঝেচি, দুজনে মিলে কিনতে গিয়েছিলে নিশ্চয়। কত দাম পড়ল রে?

ও—রাধু, তোদের জন্যে কয়েকটা টোকা, কয়েকটা চুব্‌ড়ি আর একটা কুলো রাসের মেলা থেকে কিনে আনলুম।—কেমন? পছন্দ হয়?

ও বড়দা, এতগুলো টোকা কী হবে?

—আরে, ও যে ভারী জরুরী জিনিস। আমি লক্ষ্য করেচি তোদের রান্না-ঘর অনেক দূরে—বাগানের কোণে। বৃষ্টির দিনে গুণনিধি দুহাতে খাবারের বাসন ধরে রান্নাঘর থেকে আনাগোনা করতে জলে ভিজে যায়। ছাতা ধরার উপায় থাকে না। ওর জন্যে এই বড় টোকাটা নিলুম। তোদের মালীর জন্যেও এইটে এনেচি। আর এই দ্যাখ, এই ছোট্ট টোকাটি তোর জন্যে। এটি টুপির মতন মাথায় চাপিয়ে বাগানে বেরুতে পারবি।

—ও বড়দা, এত্ত বড় কুলো কী হবে?

স্বামী এতক্ষণ হাসিমুখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাদা আর বোনের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—ঐটে করে বেশ বাতাস দিতে পারবে আমার বন্ধুবান্ধবদের।

বড়দা স্প্রিংএর মতন লাফিয়ে উঠলেন।—কী-ই—কী বল্লে? এমন অলুক্ষণে কথা! ছি-ছি। —দেখে নিও নরেন, তোমার ঘরে আমি লক্ষ্মী তুলে দিয়ে গেলাম। তোমার বন্ধুবান্ধবদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখন।...রাধু, তুই ওর ঐসব অপয়া কথায় কান দিসনে। দ্যাখ্ তো চুবড়িগুলো, কুনকে দুটো কেমন হয়েচে!

সবুজ আর লাল রঙের নকশা-তোলা বাঁশের চেঁচাড়ির চুবড়ি নানা

সাইজের। গোটা দুই ছোট সাইজের বেতের ধামা আর দুটো কুনকে। জিনিস-গুলো সত্যিই সুন্দর। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠব স্বাভাবিক।

আমার উল্লাস তিনি পরিতৃপ্ত হাসিতে গ্রহণ করে গুণনিধির হাত থেকে গড়গড়া নিয়ে বাগানে বাঁধান বেদীতে গিয়ে বসলেন।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি ঠিক জানি, রাধু এগুলো পেলে আহ্লাদে আটখানা হবে। মেয়েরা দেখেচি ঘরকরনার সাম[illegible] পেলে বেজায় খুশি হয়। ছোট্ট ছেলেরা দেখবে ব্যাটবল, মার্বেল, তীরধনুক পেলে খুশী,— কিন্তু ছোট মেয়েরা হাঁড়িকুঁড়ি বেনেপুতুল পেলে ভারী খুশী।

আমার স্বামী সেদিন বলেছিলেন—আর ধেড়েছেলেরা কী পেলে খুশী হয়, বললেন না তো শরৎদা।

শরৎচন্দ্র অল্পক্ষণ আমার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিত সুরে বলেছিলেন—শক্ত প্রশ্ন করেচ। ধেড়েছেলেরা কী পেলে খুশী হয়, কেউ জানে না। তারা নিজেরাও জানে না। আমি কী করে জানব বল?

শরৎচন্দ্র লঘু কৌতুকের হাল্‌কা মেজাজেই বেশী সময় থাকতেন। কিন্তু এক এক সময়ে হঠাৎ সিরিয়স মেজাজ এসে যেত। সমস্ত ব্যক্তিত্বটাই তখন যেত পাল্‌টে। সিরিয়স শরৎদার কাছে আমাদের আড়ষ্টতা এসে যেত মনে। অবাধে খুশিমতন কথা কইতে বাধত।

একবার পাঁচসেরী ঘিয়ের ঢাকনা-আঁটা কৌটোয় তিন টিন চিঁড়ে, মুড়ি আর খৈয়ের মোওয়া নিয়ে এসে হাজির হলেন লিলুয়ার 'দেবালয়' বাগানে। এই বাড়িটি আমার শ্বশুর-পরিবারের সম্পত্তি ছিল তখন। এখানেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

শরৎদা এসেই বললেন,—দ্যাখ্‌ রাধু, সেদিন চার ঘণ্টা তোর এখানে বসে বসে দেখলুম, প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন আসে, আর প্রতি ট্রেনেই কলকাতা থেকে কেউ না-কেউ তোদের 'দেবালয়ে' হাজির হচ্চে। আমি তোকে সংসার করা শিখিয়ে দিচ্চি। অর্ডার দিয়ে কর্পূর এলাচ দেওয়া মোওয়া করিয়ে এনেচি। ভাঁড়ারে তুলে রেখেদে। ভেবে দেখলুম, অতিথি-সমাগমের জন্যে খরচও তো তোদের বেশ হচ্চে। একটা ব্যবস্থা করা দরকার। যে যখন আসবে, দুরকম মোওয়া সাজিয়ে চায়ের সঙ্গে দিলে বেশ হবে। বাগানে কলাগাছের ঝাড়ে কয়েকটা কাঁদি পড়েছে দেখেচি। কলার কাঁদি কাটিয়ে ভাঁড়ার ঘরে দড়ি টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রাখবি। সবাইকে মোওয়ার সঙ্গে কলাও দিতে পারিস। হরদম্‌ ময়রার দোকান থেকে সামাজিকতা করতে গেলে ফতুর হয়ে যায় গেরস্থ মানুষে।

আমার চোখ ভিজে উঠেছে তখন। বুকের মধ্যে অব্যক্ত বেদনাভরা আনন্দের চাপ। একলার সংসার, দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার কেউ ছিল না আমাদের। সাংসারিক অভিজ্ঞতায় দুজনের তখন শূন্যে-নম্বর।।

—মোওয়া ফুরিয়ে গেলে চিঠি লিখে আমাকে জানাবি একটু আগে থেকেই। লজ্জা করবিনা কিন্তু। আমি আবার পাঠিয়ে দেব কাউকে দিয়ে—কিংবা, নিজেই নিয়ে আসব।

আমি গভীর সত্য উচ্চারণে স্বীকার করে যাব, আমাদের বিবাহিত জীবনে শরৎচন্দ্রের দান অনেকখানি। মনের সাহসই শুধু জোগাননি, বিয়ের পরেও পক্ষপুট দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন অনেক দিন অনভিজ্ঞ দুটি মানুষকে, দুজন ব্যক্তি—শরৎচন্দ্র আর জলধর সেন। সর্বজনপ্রিয় জলধর সেন বাংলা সাহিত্যে তখন সবচেয়ে বেশি সুপরিচিত নাম। তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার দপ্তর থেকে উঠে সোজা হাওড়া স্টেশনে সাড়ে তিনটের ট্রেন ধরতেন লিলুয়ার। আমার স্বামী কলকাতা থেকে না-ফেরা পর্যন্ত তিনি জলযোগ করতেন না, এক কাপ চা খেয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। তিনি বাড়ি ফিরলে দুজনে একসঙ্গে জলযোগে বসতেন। এটি আমাদের দৈনন্দিন নিয়ম ছিল।

শরৎচন্দ্র আশ্চর্য মানুষ। একদিকে সামাজিক নিয়ম, রীতি, নীতি কিছুই মানেননি কোনও দিন। যার জন্য বারে বারে বিভিন্ন জায়গায়, বাংলাদেশে, বিহারেও, অপাঙক্তেয় হয়ে তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে। সেই সামাজিক বন্ধন-ছেঁড়া বোহেমিয়ান মানুষটি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে হৃদয়ের গ্রন্থনা করেছেন অন্যের জন্য ঘর বাঁধার আগ্রহে।

আমাদের নতুন সংসার হয়েছিল যেন তাঁর আনন্দের খেলাঘর। তাঁর মধ্যে একদিকে উড়নচণ্ডে অসংসারী মন, অন্যদিকে ছিল লক্ষ্মীশ্রীর তৃষ্ণা।

আমার প্রতি শরৎচন্দ্রের স্নেহ ছিল অনেকটা যেন মায়ের মমতার মতই। অতি কোমল, দ্রবীভূত,—একটু যেন অন্ধও। আমার খুব অবাক লাগত। ঠিক এই ধরনের পুরুষমানুষ এর আগে আমি দেখিনি। পরেও আর দেখিনি। প্রথম প্রথম কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ হত। আমার স্বামী বলতেন—শরৎদা বড় স্নেহপিপাসু মানুষ। স্নেহ করবার, ভালবাসবার অবলম্বন খুঁজে বেড়ান। ওঁর হৃদয়টা মাতৃহৃদয়। তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে ওঁর খুব উদ্বেগ। আমাকে যে কতরকম উপদেশ দেন তোমার সম্বন্ধে, তার শেষ নেই। অন্তত সাত আটটি টোট্‌কা ওষুধের খবর লিখে দিয়েছেন তোমার হাঁপানির জন্যে। শরৎদার প্রতি আমার আড়ষ্টতা লক্ষ করে তিনি উদ্বিগ্ন হতেন, পাছে শরৎদার মনে কোনও আঘাত লাগে আমাদের থেকে।

তখন প্রায় প্রতি ঘণ্টাতেই হাওড়া থেকে লিলুয়ায় আর লিলুয়া থেকে হাওড়ায় যাতায়াত সহজ ছিল। প্রত্যেক ট্রেন লিলুয়ায় থামত। ডাউন মেল ট্রেনগুলির লিলুয়াতে টিকিট চেকিং হত। থার্ড ক্লাসের ভাড়া চার পয়সা, ইণ্টার ক্লাসের ছয় পয়সা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রেনের সুবিধা আর স্টেশন থেকে বাড়ি আসতে দুমিনিটও লাগে না—এইজন্যে শরৎদা দারুণ খুশী ছিলেন।

বলতেন—তোমরা স্বর্গরাজ্যে আছ বাপু। আমার ভাগ্যে যা ঘটেছে, গ্রীক পুরাণে শাপগ্রস্তদেরও এত শাস্তিভোগ করতে হয়নি। একেই তো বাড়ি স্টেশন থেকে ক্রোশখানেক দূরে,—তাও কি মানুষ-হাঁটা পথ আছে? পথ নেই। চষা জমি, ধানখেত। বর্ষাকালে আল দিয়ে সাপের ভয়ে মনসা-মনসা জপ করতে করতে হাঁটে ওদেশের মানুষ। শহুরে মানুষেরা একদিন সেই পথ পাড়ি দিয়েই নাকে খৎ দিয়ে পালিয়ে আসে।

লোকজন ভালবাসতেন শরৎদা। সবাইকেই বলতেন—সামতাবেড়ে যেও। আগে কিন্তু একটা পোস্টকার্ড লিখে ডাকে ফেলে দিও. স্টেশনে পাল্কী পাঠাব, নইলে কষ্ট হবে।

আমি বরাবর পাল্কীতে গেছি। তিনি পাল্কী পাঠাতেন। আমার স্বামী পাল্কীতে চড়তেন না, তিনি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন। আমি কখনও সখনও হেঁটে যাওয়ার আগ্রহ কবলে শরৎদা রেগে যেতেন। সম্মতি দিতেন-না।

আমার স্বামী বলতেন—শরৎদা. আপনি 'দেবালয়ে'র এত গুণ ব্যাখ্যা করছেন, আর একটা বাড়তি সুবিধে তো ধরলেন না। কলকাতা সুদ্ধ সমস্ত মানুষের চট করে আউটিং-এব একটা সুব্যবস্থা করে ফেলেছি আমরা। অতিথি সৎকারের বিপুল পুণ্য অর্জন করছি, সেটা তো ধরা হয়নি।

শরৎদা হো হো করে হেসে উঠেছেন।—হ্যাঁ, তা যা বলেছ। এমন কারুব সঙ্গেই এখন কলকাতায় দেখা হয় না, যে না বলে—অমুক রবিবারে লিলুয়ায় গিয়েছিলুম। এক কাজ কোর তোমরা। রবিবার এলেই ভোবেই ট্রেনে তোমরাও আউটিং-এ বেরিয়ে পোড় দুজনে।

আমাদের অতিথিসৎকারের সুবিধের জন্যে শুধু বকমারি মোওয়াই নয়. একবার তিনি কয়েকখানি মিহিবুনট্ খেজুর পাতার চ্যাটাই এনে দিয়েছিলেন! বলেছিলেন—বাগানে চবুতারায় বিছিয়ে বসতে বেশ সুবিধে হবে। সহজে নষ্ট হবেনা।

রূপনারায়ণের তাজা তপ্সে মাছ পাঠাতেন লিলুয়ায়। কলকাতাতেও বরাবর পাঠিয়েছেন।

৬

আজকাল 'হাইজ্যাকিং' বলে একটা কথা চালু হয়েছে। শরৎচন্দ্রকে একবার সাহিত্যিকরা 'হাইজ্যাক্' করেছিলেন। তিনটে বড় বড় ইলিশমাছ সমেত হাওড়া স্টেশন থেকে তাঁকে 'হরণ' করে 'দেবালয়ে' এনে ফেলেছিলেন ভারতী-গ্রুপ। শিশির ভাদুড়ি মশায়ও সেদিন ছিলেন সেই দলের সঙ্গে। হেমেন্দ্র-কুমার রায় সেদিন ট্রেনে বসে মুখে মুখে ফেরিওয়ালাদের সুরে একটা গানই বানিয়ে ফেলেছিলেন।

—বাবু, পাঁচ মিনিটের ট্রেন জার্নি—
টিকিট এক আনা—
দেব-দেবী দর্শন মিলেগা—
ইলিশ মুর্গী খানা—

গল্পটা বলি। সেদিন রবিবার। বেলা তখন প্রায় তিনটে বাজে। আমাদের কাছে যথারীতি সকালের দিকে কিছু বন্ধুবান্ধব এসে এক দফা আড্ডা দিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন। আমরাও স্নানাহার শেষ করে সাড়ে তিনটে নাগাদ কলকাতায় রওনা হব বলে বারান্দায় বসে আছি। কলকাতার আপ ট্রেন এসে স্টেশনে থামল। বারান্দা থেকে প্ল্যাটফর্ম স্পষ্ট দেখা যায়। আমরা অভ্যাসমত ট্রেনের দিকে নজর ফেলেছি। দেখি, ট্রেন থেকে একে একে নামছেন শিশির ভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায়, মায়া রায়, গিরিজাকুমার বসু, তমাললতা বসু এবং আরও দুটি অচেনা অল্পবয়সী কলেজছাত্রমার্কা ছেলে।

স্বামী তো ওঁদের দেখে মহা খুশী,—উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত গলায় বললেন—আরে, ভাগ্যিস আমরা এখনও বেরিয়ে পড়িনি! ওরা যে সব্বাই মিলে দল বেঁধে আসচে— আমি বললুম—গুণনিধি কোথায়? শীগগির দুটো উনুনে আগুন দিক। বেলা যে অনেক হয়ে গেছে।

স্বামী বাগানে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি গেটের দিকে যেতে যেতে বললেন—

এত বেলায় কি আর না-খেয়েদেয়ে এতগুলো মানুষ বেরিয়েছে?

হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর সদ্যপ্রসূত 'বাবু, পাঁচ মিনিটের ট্রেন জার্নি' গানটি ট্রেনের কামরার ফেরিওয়ালাদের সুরে গলা খুলে গাইতে গাইতে আসছেন, সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন চারু আর মায়া। মস্ত মস্ত তিনটে ইলিশ মাছ চারু, মায়া আর প্রেমাঙ্কুরের হাতে দুলছে। শিশিরবাবু উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে গেটে ঢুকছেন—

বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এককোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা—

শিশিরবাবুর পাশে শরৎদার প্রসন্ন মুখে উজ্জ্বল পরিতৃপ্তির হাসি।

ব্যাপারটি এই। ভারতী-গ্রুপের ওঁরা সবাই আজ দশটার সময়ে শিশিব-বাবুর থিয়েটারের আড্ডায় গিয়েছিলেন। গিরিজাকুমার ও তমাললতাও ঐ দলে আটকে গেছলেন। ওঁরা তমালবৌদিকে সুদ্ধু নিয়ে থিয়েটারে গিয়েছিলেন। বেলা দেড়টা বেজে গেলে তমালবৌদি চুপি চুপি ওঁদের তাড়া দিচ্ছিলেন ওঠার জন্যে। হেমেন্দ্রকুমার বিদ্রোহের সুরে বলেন—রবিবারে এত শীগগিব বাড়ি ফিরলে তাজা মুড্ নুন হয়ে গলে যাবে। আমি বাগবাজারে যাব না লিলুয়ায় যাব।

ব্যস্। সব্বাই হৈ হৈ করে উঠলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল।

চারুবাবু বলেছেন—ওখানে মুর্গী দারুণ শস্তা। স্টেশনের পাশে জমীর মিঞার বাড়ি থেকে কয়েকটা মুর্গী কিনে নিয়ে দেবালয়ে বলি দিয়ে প্রসাদ পাওয়া যাবে। তারপরেই তিনি বলেছেন—কিন্তু গুণনিধি যদি বাড়ি না থাকে, পুজোপাঠের ব্যবস্থা করবে কে? কুছ্ পরোয়া নেই, আমিই আজ গোয়ানিজ-বাবুর্চির পার্টটা দেখিয়ে দেব। এই সময়ে চারু রায়ের ফোন এসে পড়ল। চারুর বাড়িতে চারুর জন্যে কে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে আছেন। বলছেন, জরুরী কাজ আছে। চারুবাবু মায়াকে বলে দিলেন—বলে দাও, আমরা লিলুয়ায় চলে গেছি। রাত্তিরে বাড়ি ফিরব। কিন্তু তুমি এক্ষুনি হাওড়া স্টেশনে রওনা হও, এই মুহূর্তেই। সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের পাবে। তোমাকে গিয়ে মুরগী-মুসল্লেম রাঁধতে হবে।

বলা মাত্রই মায়া ট্রামে চেপে হাওড়া স্টেশনে রওনা। সেকালে একা একা একটি মেয়ের পক্ষে দূরে যাতায়াত, তাও ট্রামযোগে, মোটে সহজ ছিলনা। তখন পুরো হাওড়া ব্রীজটি পায়ে হেঁটে পার হতে হত। বাস তখনও কলকাতায় হয়নি। মায়া রায়ের মত স্মার্ট মেয়ে সে-যুগে অল্পই দেখা যেত। যেমনি হাসিখুশী প্রফুল্ল স্বভাব, তেমনি পরিশ্রমী আর স্বচ্ছন্দপ্রকৃতি।

এ'দের তোড়জোড় দেখে শিশিরবাবু বলেছেন—আমি 'ঘরে-বাইরে' বইটা নাটক করতে নরেনকে দিয়েছি। সেটা তৈরী হয়ে গেছে, সে খবর দিয়েছে। আমার এখানে সর্বদাই নানা লোকের ভিড় থাকে, নাটক নিয়ে আলোচনায় ডিস্টার্ব করে। চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই তাহলে, সকলে মিলেই নাটকটা শুনে আসা যাবে। তোমরাও মতামত দিতে পারবে।

অত বেলায় অস্নাত অবস্থায় সবাই মিলে হাওড়া স্টেশনে এসেছেন। এসে দেখেন—শরৎচন্দ্র তিনটি মস্ত মস্ত ইলিশ মাছ তাঁর সঙ্গী ছোকরার হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরুচ্ছেন।

আর যায় কোথায়? ডাকাত পড়ার মতন সবাই রূপনারায়ণের রুপোলী ইলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এর মধ্যে নাকি চারুবাবুই দলপতি। গিরিজা তাঁর পার্শ্বচর।

কোথায় ইলিশ যাচ্ছে?...

ছোকরাটি উত্তর দিয়েছে—শোভাবাজার।

শরৎদা এগিয়ে এসে বলেছেন—একজনদের ইলিশ খাওয়াব বলে প্রতিশ্রুত আছি, তাই—

চারু-প্রেমাঙ্কুর সমকণ্ঠে বলে উঠেছেন—আপনি রূপনারায়ণ থেকে ইলিশ ধরে শোভাবাজারে প্রতিশ্রুতি পালনে চলেছেন—আমবা ইলিশ সমেত আপনাকে ধবে দেবালয়ে রবিবার পালনে চলেছি। শীগগির ট্রেনে উঠে পড়ুন আমাদের সঙ্গে।

শরৎচন্দ্র এ'দেব সবাইকে খুব ভালবাসতেন। বিশেষ করে শিশিরবাবু সুদ্ধু যাচ্ছেন দেখে তিনি আর বাক্যব্যয় না করে মহা উল্লাসে ও'দের দলে ভর্তি হয়ে গেলেন। হাইজ্যাকড হয়ে শোভাবাজারের ইলিশ লিলুয়ায় চলল।

সেই দিনটির কথা মন থেকে মুছবার নয়। সারাটি দিন খুব আনন্দ করে হয়েছিল। শরৎদাও বেশ দিলখোলা মেজাজে ছিলেন সারাদিন। 'ঘরে-বাইরে'র নাট্যরূপ পড়া হয়নি। শরৎদা পড়তে দেননি। বললেন—আউটিং-এ বেরিয়েও কাজ-গুছোবার মতলব ভাল নয়, শিশির। ও অন্য একদিন হবে। নাটক পড়তে বসলে আবহাওয়াটা সিরিয়াস হয়ে উঠবে। না, না, সে হবেনা। মতলবী লোকেরা ঐরকম রথ দেখতে গিয়ে কলা বেচে আসে।

সেদিন শিশিরবাবুর উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদ" "গান্ধারীর আবেদন", "কচ ও দেবযানী"—আর শেক্সপীয়রের বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন নাট্যাংশ—সবাইকে অন্য এক রসাস্বাদের জগতে পৌঁছে দিয়েছিল। 'চয়নিকা' থেকে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে "সাজাহান" কবিতা আবৃত্তি করান হল। তিনি কিছুতেই পড়বেন না—শিশিরের কণ্ঠস্বরের পাশে আমার গলার স্বর? পাগল হয়েছ তোমরা। সিংহের গর্জনের পাশে ব্যাঙের গোঙরানি! শেষ

পর্যন্ত পড়েছিলেন। "সাজাহান" শরৎচন্দ্রের খুব প্রিয় কবিতা ছিল। ওর বিভিন্ন স্তবক প্রায়ই তাঁর মুখে আবৃত্তির আকারে স্বগতোক্তির মত লেগে থাকত। "হায় রে হৃদয়,/তোমার সঞ্চয়/দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়"/কিংবা—"হীরামুক্তা মাণিক্যের...যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক শুধু থাক/একবিন্দু শুভ্র অশ্রুজল/কালের কপোলতলে—" ইত্যাদি অনেকেই তাঁর মুখে শুনেছেন, এখনও নিশ্চয় মনে করতে পারবেন।

মুরগী সেদিন চারু-প্রেমাঙ্কুরবাবুর কেনা হয়নি, রান্নাও হয়নি। প্রায় এক কাঁদি পাকা কলা আর সেরখানেক মুড়ি কাড়াকাড়ি করে অদৃশ্য করে ফেললেন সকলে। তারপরে চায়ের পরে চা। ওদিকে মায়া আর তমাললতা আমাকে ও গুণনিধিকে নিয়ে প্রকাণ্ড ফলসা গাছের তলায় ইঁট সাজিয়ে খিচুড়ি চাপালেন। মায়া ইলিশ মাছ কুটতে বসে গেলেন। সূর্য্যি প্রায় পাটে এসে গেল বাগানের মস্ত চবুতারায় কলাপাতা পেতে সারিবন্দী হয়ে বসতে। সাড়ে চারটে আন্দাজ, জলধর সেন আর অমল হোম একসঙ্গে এসে পৌঁছুলেন। তাঁরাও পঙক্তিভোজনে আনন্দ করে বসে পড়লেন। সেদিন ওঁদের সঙ্গে যে দুটি তরুণ ছেলে এসেছিলেন (হয়ত শিশিরবাবুরই কোনও সাগরেদ হতে পারে), তাঁদের নাম মনে নেই—তারা কিন্তু সেদিন অপূর্ব গান গেয়েছিলেন সারাদিন শিশিরবাবু আর শরৎদার ফরমাস মত। রবীন্দ্র-সংগীত, দ্বিজেন্দ্র-সংগীত, নজরুল-সংগীত।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিরূপের মোটামুটি একটি রেখাচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করলুম শিল্পী শরৎচন্দ্রের পটভূমিকা হিসেবে। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদেরও একটি ছবি রইল।

তিনি নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে নিঃশব্দ থাকতেন। একান্ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সম্পর্কে মুখ খুলতে চাইতেন না। সাহিত্যেও তিনি ব্যক্তিগত জীবনকে বেশী স্পষ্ট করে উন্মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন না। আড়ালটা জরুরী মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে পড়বে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন—সাহিত্যে ব্যক্তিগত জীবনের হুবহু ছবি দিতে নেই। দিলে সার্থক সাহিত্য হবেনা। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সমস্যাও উপস্থিত হয় বলে তিনি শৈলবালা ঘোষজায়ার উল্লেখ করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন মহলকে তিনি সম্মান দিতেন, মূল্য দিতেন।

শরৎচন্দ্র খুব ভাল শ্রোতা ছিলেন। অপরের কথা মন দিয়ে শোনার আগ্রহ ছিল তাঁর। এই গুণটি শিল্পীদের মধ্যে প্রায়ই অনুপস্থিত দেখা যায়। শিল্পীরা অন্যকে শোনাতেই ব্যগ্র থাকেন, নিজে শুনতে বড় চাননা। অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি শরৎচন্দ্রকে ধৈর্যশীল শ্রোতা করেছিল মনে

হয়। নিজের সম্পর্কে যেমন, নিজের সাহিত্য সম্পর্কেও তেমনি, জনসমাজে চুপচাপ থাকাই ছিল তাঁর প্রকৃতি।

বলতেন—আমার বইয়ের চরিত্রগুলি বিভিন্ন পাঠকের মনে কত বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া আনে—দেখে আমার বেশ মজা লাগে। কে যে কার কাছে কোন তাৎপর্যে, কোন রস নিয়ে দেখা দেয়, এর বাঁধাধরা মাপজোক তো নেই। সবারটাই সত্য, অথচ—সবটাই তার সত্য নয়। জীবন্ত মানুষ নিয়েও সংসারে এই ব্যাপারই চলে। আমাকে তুমি যে-মানুষটি দেখতে পাচ্ছ, অন্য একজন সম্পূর্ণ আলাদা আরেকটি মানুষ দেখচে। কারুর দেখাই ভুল নয়। কিন্তু একটা কথা। বহিরঙ্গ-দৃষ্টির মানুষ সংসারে নব্বুই ভাগ। এঁরা ভেতরের আসল মানুষটাকে মোটে নজরই করতে পারেন না। বহিরঙ্গ দৃষ্টির মানুষদের বিদ্যার সম্পদ জ্ঞানের সম্পদ, যুক্তি আর বিচারের ধারাল হাতিয়ার সমস্তই হয়ত ঝক্‌ঝক্‌ করে—কিন্তু হায়, থাকে না শুধু নিজস্ব গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলো। শিল্পের রসসৃষ্টির জন্যে যেমন—শিল্পের রসাস্বাদনের জন্যেও তেমনি অন্তরের চক্ষুটি মেলে রাখা একান্ত জরুরী।

৭

বড় বিজ্ঞানী বা শিল্পী কেউ কেউ অনেক সময়ে একটু ক্ষ্যাপাটে কিংবা একটু শিশুসুলভ স্বভাবের হয়ে থাকেন শুনেছি। ওটি নাকি গুণীদের চরিত্রের অসামান্যতারই অঙ্গ।

শরৎচন্দ্র অভিমানী ছিলেন বালকের মত। প্রত্যাশিতকে না পেলে তিনি শিশুর মত রাগে দুঃখে অধীর হয়ে বারে বারে নিজেকেই আঘাত করতে চাইতেন। এ এক মুশকিলের ব্যাপার ছিল তাঁর কাছাকাছি আত্ম পরিজনদের কাছে। সকলকেই বেশ একটু সশঙ্ক হয়ে থাকতে হত,—কখন কোথা দিয়ে তাঁর মনে আঘাত লেগে যাবে—যার ফলে তিনি নিজের মাথা ঠুকে অন্যকে শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতিতে সবাইকে শাস্তি দেবেন।

আমাদের বিয়ের সময়ে দুর্ভাগ্যবশত একটি বিভ্রাট ঘটে গিয়েছিল। যার বেদনা আমরা সারা জীবন বহন করেছি। সে-সময়ে এ জন্যে আমরা দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। সৌভাগ্যের কথা, শরৎচন্দ্র নিজেই সেই আক্ষেপ আর দুঃখের অন্ধকার আবহাওয়া—নিজের করুণার্দ্র সান্নিধ্য দিয়ে, স্নেহ দিয়ে পরে দূর করে দিয়েছিলেন। তাঁর অকপট ভালবাসার কবোষ্ণ রৌদ্রে আমাদের আহত মনের মেঘ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগে এসেছিল শরৎচন্দ্রের দুর্দান্ত অভিমানের পালা।

ত্রুটিটা ঘটে গিয়েছিল আমাদেরই দিক থেকে। শরৎচন্দ্রের প্রেরণায়, উৎসাহিত পরামর্শে আর ব্যবস্থায় আমাদের বিবাহ ঠিক হয়ে গেল। দিনস্থির হয়েছিল পরেশনাথের বাগানে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে। আমাকে নিয়ে আমার দাদা বিভূতিভূষণ ঘোষ (ইনি জীবিত আছেন) সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র এসেছিলেন আমার স্বামীর সঙ্গে। সেদিন আমার দাদা বিভূতিবাবুকে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি কি ভালবেসে বিয়ে করেচ? আমাদের বিয়েতে আমার দাদার সমর্থন ও সহায়তা দেখে তিনি এই প্রশ্নটি করেছিলেন। আমার দাদা এখনও সেকথা উল্লেখ করেন।

পাছে কোনও বিঘ্ন ঘটে, সেজন্য বেশি আগে এখবর বাইরে প্রচার করতে তিনি বিশেষভাবে মানা করেছিলেন। বলেছিলেন নিমন্ত্রণপত্র ছাপিওনা। নিজে গিয়ে মুখে সবাইকে জানিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসবে। আত্মীয় কুটুম্ব প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করবে। কারা বিয়েতে যোগ দেন বা না দেন এইতে বোঝা যাবে কারা তোদের সমর্থক বা অসমর্থক।

আমার স্বামী বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, শরৎদা, আমি একলা মানুষ। বাড়ী-বাড়ী ঘুরে ঘুরে নিমন্ত্রণ করার সময় পাব কখন? এদিকে আবার বলছেন বেশি আগে প্রচার করা চলবে না, কেউ বাধা সৃষ্টি করতেও পারে। আমার মনে হয়, সংক্ষিপ্ত কয়েক লাইন লিখে আমি নাম সই করে লোক মারফৎ যদি পাঠিয়ে দিই, সেই ভাল হবে না কি? সময়ে তো একেবারেই কুলুবে না.

শরৎচন্দ্র অনড় হয়ে বলেছিলেন—সময়ে কুলোতেই হবে যে-করে হোক। লোক-মারফৎ নয়, নিজে যেতে হবে।

তিনি নিজে নিমন্ত্রণের ফর্দ করে দিয়েছিলেন, কাদের বলতে হবে। বলেছিলেন—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। বাইরের লোকদের মধ্যে কাগজওয়ালাদের সব্বাইকে নেমন্তন্ন কর। নইলে ওরা রেগে গিয়ে উল্টো গাইতে পারে। আর, সর্বদা যেসব বন্ধুদের সঙ্গে ওঠা বসা কর মুখোমুখি হও, তাদের ডেকো। বেশি ছড়িয়ে নেমন্তন্ন কোর না। সামলাতে পারবে না। তুমি নিজে তো তখন থাকবে শেকলে বন্দী। জলধরদা আর আমি সব দেখা-শুনো করব, সামলাব। সবসুদ্ধু লোক শ'খানেকের বেশি না হয়। আরও কম হলেই ভাল হত। পাঁচ মতের মানুষ এক জায়গায় জড়ো হলে তাদের মধ্যে হয়ত নানা তর্ক-বিতর্ক উঠবে,—একদল অন্য দলকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবে। তখন একটা অপ্রিয় আবহাওয়া তৈরী হয়ে উঠতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। আমাদের দেশে এখনও অনেক এমন লোক আছে বিয়ের সভায় শ্রাদ্ধসভায় এরা নতুন মতের লোকদের দেখলে আঘাত না করে পারে না। পুরোণোদেরই তুষ্ট রাখ। যাদের বলা গেল না পরে বরং তাদের একদিন ধীরে-সুস্থে ডেকো। তারা মনে ক্ষোভ রাখবে না।

কল্লোল গ্রুপকে বলা গেল না। শুধু ভারতী গ্রুপকে বলা হয়েছিল। পরে কল্লোল গ্রুপের সাহিত্যিকেরা তাঁদের সর্বজনীন দাদার উপরে খুব অভিমান করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলেন মনে আছে। কল্লোল গ্রুপ বলতে প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-অজিতদত্ত-যুবনাশ্ব-নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এ'দের কজনকেই তখন বোঝাত। খবর পেয়ে খুশী হয়ে নিজেরাই আনন্দ করে ছুটে এসেছিলেন অচিন্ত্যবাবু,—প্রেমেন্দ্রবাবু সবার আগে। তারপরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। দীনেশরঞ্জনবাবুও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে এসেছিলেন।

এঁদের খুশীতে একটুও ভেজাল ছিল না, বরং উল্লাসের প্রাচুর্য ছিল। বুদ্ধদেব অভিনন্দন জানিয়ে তিনছত্র চিঠি লিখেছিলেন। বুদ্ধদেব ঢাকায় তখন 'প্রগতি'র অফিস থেকে প্রায়ই চিঠিপত্র লিখতেন আমার স্বামীকে।

শরৎচন্দ্র ভয় পেয়েছিলেন কলকাতার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেব-পরিবারকে। এখান থেকে প্রতিবাদের গোলমাল ওঠার অনুমান করেছিলেন। কিন্তু আমার শ্বশ্রুমাতা মৃণালিনী দেবী এবং বড় ননদিনী সরলাসুন্দরী বিয়েতে উপস্থিত থেকে তাঁদের সমস্ত কর্তব্য আনন্দের সঙ্গে পালন করে আমাকে বরণ করে তুলেছিলেন। দেব-পরিবারের যাঁরা তখন প্রধান,—প্রত্যেকে নিজেরা দাঁড়িয়ে আনন্দের সঙ্গে অতিথি সংবর্ধনা ও পারিবারিক যথাকর্তব্য পালন করেছিলেন। কোনও গোলমাল ত্রুটিবিচ্যুতি হয়নি। আত্মীয় কুটুম্ব সামান্য দুই-একজন ছাড়া প্রত্যেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। বিবাহের সন্ধ্যায় আমার ভাসুর রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবের মধ্যপ্রদেশ থেকে টেলিগ্রামে আশীর্বাদ এবং রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং থেকে আশীর্বাদ এসে পেঁছিছিল।

আসা হয়নি শুধু শরৎচন্দ্রের। আমার স্বামী বলতেন—যাঁর সবচেয়ে বেশী খুশী হয়ে ওঠার কথা,—তিনিই বিয়েতে যোগ দিতে পেলেন না। স্বামীর মনে এর জন্যে চিরদিন গভীর আক্ষেপ ছিল।

একটি জটিল দুর্ঘটনায় শরৎচন্দ্র বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারলেননা। যে-ছেলেটির হাতে আমার স্বামী বিয়ের তারিখ ও সময় জানিয়ে সামতাবেড়ে চিঠি পাঠালেন, সে-ছেলেটি হঠাৎ বাবার কলেরা হয়েছে খবর পেয়ে সেই চিঠি পকেটে নিয়েই তার নিজের গ্রামে চলে গিয়েছিল। তার বাবার মৃত্যু হওয়ায় সময় মত আর চিঠি পেঁছে দেওয়া হয়ে ওঠেনি তার। শরৎদার কাছে চিঠি যে পেঁছুল না এ-খবরটি আমার স্বামী জানলেননা। বিয়ের দিন সকাল থেকেই উনি উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন শরৎচন্দ্রের জন্য। সাহিত্যিকেরাও সকলে তাঁর জন্য উৎসুক প্রতীক্ষিত। সকাল থেকেই সমস্ত সাহিত্যিকরা সস্ত্রীক 'দেবালয়ে' জড়ো হয়ে সেদিন গভীর রাতে কলকাতায় ফিরেছিলেন লিলুয়া থেকে।

ভোর থেকে শরৎদার জন্যে স্টেশন প্ল্যাটফর্মের দিকে প্রত্যেকখানি আপ-ট্রেনের আওয়াজে তাকিয়ে থেকে থেকে বিকেল হয়ে গোধূলিলগ্ন এসে গেল। কলকাতার নিমন্ত্রিতেরা প্রতি ট্রেনেই কেউ-না-কেউ নামছেন, শরৎচন্দ্র শেষ-পর্যন্ত এসে পেঁছুলেননা।

দুর্ভাবনায় সবার মন ভারাক্রান্ত। শেষ অবধি সকলেই স্থির অনুমান করলেন—নিশ্চয়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এদিকে শরৎচন্দ্র আদপে খবরই পাননি। ১লা, জুন তারিখে সমস্ত ইংরেজি বাংলা খবরের কাগজে বিয়ের খবর প্রকাশ হল বড় হেডিং দিয়ে।

তিনি খবরের কাগজে দেখলেন ৩১শে মে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সেটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ। আগে খবর না পাঠিয়ে সামতাবেড়ে যাওয়ায় তখন শরৎচন্দ্রের মানা ছিল। উনি পাল্কী পাঠাতেন স্টেশনে।

আমার স্বামী ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সকালেই তাঁকে ডাকে চিঠি লিখলেন, আমাকে নিয়ে সামতাবেড়ে যাবেন, অথবা শরৎদাই আমাদের কাছে আসবেন. কোনটা সুবিধা হবে জানতে চাইলেন। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে লেখা তাঁর অভিমানভরা চিঠি এল—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সই নিয়ে।

সামতাবেড়, পানিত্রাস,
জেলা হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

খবরের কাগজে দেখলাম তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। পরে তোমার চিঠি পেয়ে আর সন্দেহ রইল না যে খবরটা পাকা।

সেদিন তোমাদের নতুন গৃহস্থালি দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এদিকের জরুরী কাজ সারতে সারতে স' আটটা বেজে গেল। তখন লিলুয়া গিয়ে ফিরে এসে স' নটার ট্রেন ধরা সম্ভবপর ছিল না। তাই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পারলাম না। যাই হোক, আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও। ইতি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎদাকে না চিনলে, হয়ত এ-চিঠির ভিতরকার দুঃখ ও রাগ বোঝা না যেতে পারে। যদিও, চিঠির শেষ স্বাক্ষরটিতে রাগের চেহারা তিনি সুস্পষ্ট রেখেছেন। আমাদের দুজনের চিঠিতে উনি 'বড়দা' 'বড়দাদা' 'শরৎদা' সই করতেন।

বিয়ের পর আমাদের দুজনের কাছে একসঙ্গে লেখা প্রথম চিঠিতে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সই.—এবং একদম শীতল সুদূর অসম্পৃক্ত ভাষায় অতি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে লিলুয়ায় না-আসার মামুলি কৈফিয়ৎ দেওয়া—এটা যে কতটা গভীর অভিমানের চিহ্ন,—তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

আমার স্বামী অনেক কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় শরৎদার মানভঞ্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের মনের দুঃখ যে তাঁর চেয়েও ঢের বেশি, সেটি তাঁকে বোঝাতে বেশ সময় লেগেছিল। বুঝবার পরে অবশ্য তিনিই আমাদের অনেক সান্ত্বনা দিয়েছেন।

গুরুদেব তখন দার্জিলিং-এ। তাঁর শুভ-আশীর্বাদ নিয়ে সেদিন টেলিগ্রাম

এসেছিল। পরে তাঁর চিঠিও যথাসময়ে এল। শরৎচন্দ্র যখন আমাদের কাছে 'দেবালয়ে' প্রথম এলেন, সেদিনও তাঁর মনের উত্তাপ আর অভিমান শান্ত করতে আমার স্বামীকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় জলধর সেন মশায় তখন 'দেবালয়ে' উপস্থিত ছিলেন, তিনিই শরৎচন্দ্রকে বুঝিয়ে শান্ত করেছিলেন, এটি দায়িত্বহীনতার ত্রুটি বা কর্তব্যের অবহেলা নয়, অভাবিত দুর্ঘটনার ফলে গোলমাল।

সেদিন শরৎচন্দ্রের সেই অবুঝপনার মধ্যে সত্যিই শিশুসুলভ অযৌক্তিকতা ছিল। পরে অবশ্য তিনি হাসতে হাসতে বলতেন—আমার কপালে লেখা আছে সামাজিক কাজে 'একঘরে' হয়ে থাকতে হবে। ঠিক 'বয়কট্' হয়ে গেলুম। তোমাদের বিয়েতে প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু করে সব্বাই এলেন, কত আনন্দ করে গেলেন; গুরুদেব কলকাতায় থাকলে তিনিও হয়ত একবার এসে তোমাদের আশীর্বাদ করে যেতেন,—শুধু আমিই একা বাদ পড়ে গেলুম। একেই বলে বিধির লিখন।

আমাদের জীবনের বিশেষ মুহূর্তটিতে তাঁর এই অনুপস্থিতি নিয়ে বরাবর শরৎদার মনে একটা খেদ থেকে গিয়েছিল। ছোট ছোট জিনিসও তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনের কাছে কত মূল্যবান হয়ে উঠত, এ থেকে বোঝা যায়।

অন্য কেউ হলে সহজেই ঝেড়ে ফেলতেন তুচ্ছ ঘটনা বলে। এমন সামান্য বিষয়কে এতদিন ধরে ঠাঁই দিতেননা মনে।

এটি আমার স্মৃতিচারণ। কাজেই, সে-সময়কার সাহিত্যিক ব্যক্তিসমাজের কিছুটা ছবিও এতে থাকল। এটিকে আত্মবিজ্ঞাপন বলে ভুল করবেন না পাঠকেরা, আশা রাখব। বিভিন্ন সাহিত্যিকরাও যাঁরা এই লেখার মধ্যে এসেছেন, তাঁরা সকলেই শরৎচন্দ্রের অকপট অনুরাগী ছিলেন।

মানুষ শরৎচন্দ্রকে সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে আরও কিছু ঘটনাগত গল্পে তাঁর স্কেচ্‌টি ফুটিয়ে তুলতে চাই। যদিও জানি, এতে তাঁর সেই উপ্‌চে-পড়া টগ্‌বগে প্রাণের উত্তাপ আর চাঞ্চল্য ধরা যাবেনা, তবু কিছুটা আভাস বা ইঙ্গিত থাকতে পারে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের।

আমাদের বাড়ীতে ঠিকে কাজ করত বিনুর মা ঝি। শরৎদা সেদিন সান্ধ্যআসরে যথারীতি গল্প করছিলেন। রাত্রি তখন প্রায় আটটা হবে' শীতকাল। বিনুর মা এসে কেঁদে আমার স্বামীর পায়ে পড়ল।—বাবু, আমার বিনুকে বাঁচান।

আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। কী ব্যাপার? বিনু গাছ থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মাথা ফেটে গেছে। বস্তীর লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেকে—কিছু টাকা চাই। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে কিছু টাকা, সে যা চাইল, দিলুম। শরৎদা গড়গড়ার নল ছুঁড়ে ফেলে

দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—চল নরেন, আমরা যাই। দেখি,—ছেলেটার কী হল। সেখানে যে কজন ছিলেন, সকলেই বিনুর মার সঙ্গে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন পান্ডিতিয়া বস্তীতে। বস্তী বেশি দূরে নয়। শরৎদা সেখানে গিয়ে ছেলেটিকে দেখে নেড়েচেড়ে বললেন—মাথা ফাটেনি। কপাল আর কানের পাশটা কেটে গেছে। তখন তার জ্ঞানও ফিরেছে। শরৎদা কাছাকাছি একটি দোকানে গিয়ে শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে নিজেই ফোন করলেন তাঁর চেনা ডাক্তারকে। শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে ছেলেটিকে পাঠান হল। শরৎদা বস্তীর মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ রইলেন। বিনুর মার ঘর দেখলেন। কাঁচা নর্দমা সাফ্ রাখেনি বলে বস্তীর অধিবাসীদের বকাবকি করলেন। বিভিন্ন ঘর থেকে মেয়েরা পুরুষেরা বেরিয়ে এসেছিল, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। তারপরে বললেন—বিনুর খবর কাল সকালবেলাই যেন আমরা অশ্বিনী দত্ত রোডে তাঁর কাছে পাঠাই। সকালে খবর দেওয়া হল। সন্ধ্যায় শরৎদা এসে বললেন—তোদের এখানে আসার সময়ে পান্ডিতিয়া বস্তিতে ঘুরে ছেলেটার খবর নিয়ে এলুম। কাঁধের হাড় ফ্র্যাকচার হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে। ভুগবে কিছুদিন, তবে অল্প বয়েস তো, হাড় জুড়ো যাবে ঠিক। ওর মা'টা খুব কান্না-কাটি করছে।

সেইদিন শরৎদা বস্তিবাসীদের প্রসঙ্গে পতিতা পল্লীর কথা গল্প করে ছিলেন। পরেও তাঁর মুখে ওখানকার নানা গল্প শুনেছি।

শরৎদা বর্মা থেকে কলকাতায় যখন আসতেন, তখন উঠতেন শিবপুরে খুরুট রোডে একটি পতিতা পল্লীতে, মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে, আর চিৎপুর রোডে—এই তিন জায়গায়। খুরুট রোডেই তাঁর প্রধান আস্তানা ছিল। এইখান থেকেই তিনি অনেক আগে একটি মেয়ের জীবন দেখে চরিত্রহীনের সাবিত্রী চরিত্রের কল্পনা করেন। শরৎদা হাসতে হাসতে গল্প করতেন—বর্মা থেকেই আসি আর বেহার থেকেই আসি—আমি এসে দাঁড়ালেই ওদের মধ্যে একটা খুশীর সাড়া পড়ে যেত। তক্ষুণি ঘাটে নিয়ে যাওয়ার একখানা খাট এসে পড়ত আমার জন্যে। বুঝলি?—আমি তো অবাক। শুনতে অস্বস্তিও খুব লাগছে। কিছু জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করছেনা। তবু বলি—সে আবার কী? ঘাটে নিয়ে যাওয়ার খাট মানে কী?

—আরে, শ্মশানে দেহ নিয়ে যাওয়ার খাটিয়া! বুঝতে পারছিসনা? দড়ির খাটিয়া রে! বিরক্ত হয়ে বলি—ওসব অদ্ভুত গল্প শুনতে চাইনা। অন্য গল্প বলুন।

আমার অস্বস্তিতে আরও উৎসাহিত হয়ে শরৎদা হাসতে হাসতে বলেন—শুধু কি খাটিয়া? এক প্রস্থ বিছানা তার সঙ্গে। সেই খাটের মাপের

তোষক চাদর বালিস। শীতকাল হলে নতুন লেপ বা কম্বল একখানা।

আমি চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে চলেন—আরে, সে কী ব্যতিব্যস্ত আয়োজন যদি দেখতিস? এত্তবড় (হাত ঘুরিয়ে থালার আয়তন দেখিয়ে) কাল কষ্টিপাথরের থালায় জুঁইফুলের মতন ভাত সুন্দর চুড়ো করে বেড়ে, সাদা পাথরের বাটী গেলাসে নানা তরকারি আর জল। আরে, গুরু-পুরুত এলেও তেমন খাতির তোরা করতে পারবি না। আমি ছিলুম বাড়ীউলি বুড়ীর বাবাঠাকুর। একবার ওকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছিলুম। সেই থেকে সে আমাকে সত্যি সত্যি 'ঠাকুর' করে তুলেছিল। আর, সেই বস্তীর ঘরে ঘরে যত মেয়ে ভাড়াটে ছিল, আমায় তারা ডাকত বাবাঠাকুর। আমায় দেখলে তাদের আহ্লাদের সীমা থাকত না। সবাই মিলে আমাকে খাওয়াত। যত্ন-আত্মি করত।

যখনি ওখানে গেছি, নতুন খাটিয়ায়, নতুন বিছানায় ধোয়ামোছা একখানা ঘরে শুয়েছি। ওরা কিন্তু আমাকে আন্তরিকই ভালবাসত। কোনও দরকার তো ছিলনা আমাকে নিয়ে। আমি যে ওদের ঘেন্না করিনা, এইটুকু বুঝত বলেই বোধহয় সব্বাই এত ভালবাসত।

শরৎদা গল্প করেছেন—ঐসব পতিতাদের কাছ থেকে তিনি তাদের জীবনের ইতিহাস লিখে নিতেন। কে কেন কী করে এই পথে এসে পড়ল তিনি একখানি মোটা খাতায় লিখে রাখতেন। বর্মায় গৃহদাহে সে খাতাখানি নষ্ট হয়ে যায়। সেই খাতার জন্যে তাঁর খুব ক্ষোভ ছিল।

শরৎদা বলেছেন—আরে, ওদের কতবার বলেছি, খাটিয়াখানা একটা উঁচু চালে টাঙিয়ে রেখে দিও, বিছানাটাও ঐ সঙ্গে বেঁধে তুলে রেখ। তাহলে বারে বারে কিনতে হবেনা। যখন আসব, শমীবৃক্ষ থেকে খাটিয়া বিছানা নামিয়ে নিয়ে তাইতে লম্বা হয়ে পড়ব। তারা কিন্তু তা শোনেনি। বলত,—না, যতবার আপনি আসবেন, ততবারই আমরা নতুন খাটে নতুন বিছানায় আপনাকে নারায়ণ করে শোয়াব। এটি সেই বুড়ীর ঝোঁকের ব্যাপার ছিল।

শরৎদা পতিতা পল্লীতে ওদের ক্রেতা হয়ে আনাগোনা করেননি, একথা কিন্তু অনেকবারই বলেছেন।

বলতেন—আমি ছোটবেলা থেকে সাপ ধরতে পারতুম। সাপের গর্তে অনেকবার হাত দিয়ে সাপ ধরেছি। ওদের বিষদাঁত কী করে ভেঙে দিতে হয় শিখেছিলুম। বিষাক্ত সাপে আমি কক্ষনো ভয় পেতুমনা; কিন্তু বিষকন্যায় আমি বরাবর আতঙ্কিত থেকেছি। বিষাক্ত সাপ যথেষ্ট ঘেঁটেছি, বিষকন্যা কিন্তু কখনও কোনওদিন ছুঁইনি।

আমি শরৎদার একথা বিশ্বাস করি। পতিতাদের তিনি এমনভাবে দেখতে পেতেননা, যদি তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দেহের মোহে জড়িত

থাকত। পতিতারাও বোধহয় এই অদ্ভুত প্রকৃতির পুরুষমানুষটির কাছে এমন মন খুলে তাদের জীবনের সব কথা বলতে পারতনা বিশ্বাস করে। ওখানকার আরও অনেক গল্প শরৎদার মুখে শুনেছি। এমন সহজ গলায় অতি স্বচ্ছন্দভাবে ওদের গল্প আন্তরিক করুণায় বলতেন, যাতে মনে হত, ওদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অন্য সকলের মত ছিলনা সম্ভবত। সাবিত্রী চরিত্রটি বাঁকুড়ার একটি মেয়ের। তার ভগ্নিপতি তাকে বিয়ে করবে বলে কলকাতায় এনেছিল। অত্যন্ত তেজস্বিনী দৃঢ় প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে. গ্রামীণ সম্পন্ন গৃহস্থঘরের মেয়ে।

পতিতাদের ইতিহাস সংগ্রহ করার 'হবি'তে কাটিয়েছেন এককালে। ওদের প্রতি তাঁর করুণা আর বেদনাবোধের অবধি ছিলনা। বলতেন, প্রকৃতি-গত স্বভাবেও অনেকে ঐ জীবন কাটায় এটা ঠিক বটে, বেশির ভাগই কিন্তু অবস্থার ফেরে পড়ে আব পুরুষের প্রবঞ্চনার দরুণ ঐ পথে থাকতে বাধ্য হয়।

অদৃশ্য তর্জনী

৮

মানুষ-শরৎচন্দ্রের মোটামুটি একটি রেখাচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এর মধ্যে একটি জরুরী তথ্যও জানিয়েছি। সে-তথ্যটি এই,— ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রদের ক্ষুদ্র সাহিত্যচক্রের মহিলা সদস্য, বিভূতিভূষণ ভট্টের ছোটবোন, 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'দিদি' উপন্যাস লেখিকা নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পে উপন্যাসে বালবিধবা চরিত্র না আঁকলে ভাল হয়। এর জবাবে শরৎচন্দ্র জানিয়েছিলেন—কলমে আপনা হতে যা এগিয়ে আসে, তাকে রোধ করে রাখা উচিত নয়। তবে, এমন বালবিধবা চরিত্র কখনও তিনি আঁকবেননা যাতে অনুরোধকারিণীর মনে কিংবা মর্যাদায় আঘাত লাগে।

শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নের জন্য পাঠক ও সমালোচকদের কাছে এই তথ্যটি বিশেষ জরুরী মনে হয়।

শরৎচন্দ্রের মনের আকাশে সে-সময়ে একটি অদৃশ্য তর্জনী শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ও সাহিত্যকে নিঃশব্দে নিয়ন্ত্রণ করতো। যে-নিয়ন্ত্রণকে শরৎচন্দ্রের হৃদয় কোনও দিন অস্বীকার করতে পারেনি। যে-নিয়ন্ত্রণের ফলে, শরৎচন্দ্রের জীবনও যেমন, সাহিত্যও তেমনি দিক্ বদল কবে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। প্রথম জীবনে নিজের শিল্পকে অন্যের মুখ-চাওয়া করে রাখার মধ্যে শিল্পীর যে অসামান্য আত্মত্যাগ আছে,—ব.উন্ডুলে বেহিসেবী মানুষ বলেই তা সম্ভব হয়ে থাকবে। এই আত্মসমর্পণের কোনও স্পষ্ট প্রতিদান তিনি সারা জীবনে কখনও পাননি। সে নিয়ে তাঁর যে বেদনা ছিলনা তা নয়। তবু প্রশ্নহীন ভাবে এই বিদ্রোহী যুবক এক অন্তঃপুরিকার বিভ্রান্ত চিত্তের ব্যথিত নির্দেশ মাথা নত করে পালন করে গিয়েছেন। বিন্ধ্যপর্বতের মত নুইয়ে রেখেছিলেন নিজের সমুন্নত তেজ আর যৌবনের বিদ্রোহী সত্তাকে, এক অদৃশ্যচারিণীর সম্মানে।

শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন কেন, কেনই বা

তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে আকস্মিক কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন?

অবান্তর হলেও আমি এই তথ্যটি জানার পুরো পটভূমিকা বলব। কারণ, এইদিনই প্রথম তিনি নিজ মুখে আমার কাছে নিরুপমা দেবীর বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন। এমন একটি পরিবেশ সেদিন ছিল—যেখানে নিসর্গই হয়ত তাঁকে গ্রন্থি উন্মোচনে সহায়তা করেছিল এক বিশেষ নিভৃতির সৃষ্টি করে।

বেয়াল্লিশ বছর আগের কথা। সে ছিল এক বর্ষার দিন। সকালে বেলা দশটা নাগাদ চন্দননগরে সাহিত্যসভা করতে বেরিয়েছিলাম শরৎদার সঙ্গে আমরা স্বামী-স্ত্রী। সভা-টভা শেষ হলে স্বর্গীয় হরিহর শেঠের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে তাড়াতাড়ি কলকাতার দিকে ফেরা হচ্ছে, আকাশের অবস্থা একটুও সুবিধের নয়। যাত্রার অল্প সময় পরেই প্রবল জোরে বৃষ্টি নেমে এল,—সঙ্গে ঝোড়ো বাতাসের উদ্দামতা, তীব্র বাজের আওয়াজ, বিদ্যুতের ঝল্‌কানি। শরৎচন্দ্র গাড়ি থামাতে বললেন। তাঁকে উদ্বেগে একটু যেন বেশী উত্তেজিত দেখা গেল। তিনি মোটর থেকে নেমে পড়ার জন্যে বালকের মত অধীর।

আমার স্বামী বললেন—এত ঝড়বৃষ্টিতে কোথায় নামবেন এখানে? তা হলে বরং ফিরে চলুন হরিহরবাবুর বাড়ি।

শরৎচন্দ্র বললেন—ঝড় জলে দুর্যোগে পথে ঘাটে মানুষ কোথায় আশ্রয় নিয়ে থাকে? সামনে যেখানে যা পায় সেইখানেই। ঐ তো স্ট্যাণ্ডের ওধারে রাস্তার ওপরেই সুন্দর সুন্দর পাকা বাড়ি রয়েচে। চল না—একটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ি।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে লাল রঙের একটি একতলা সুদৃশ্য বাংলোর সামনে রাখল। আমরা শরৎদার সঙ্গে ভিজতে ভিজতে নামলুম। মাথার উপরে আকাশ তখন ঘন ঘন বিদ্যুতের চাবুকে ফেটে পড়ছে চৌচির হয়ে,—কানের পর্দা ফাটান বাজের আওয়াজ।

বাংলোর বারান্দায় গিয়ে উঠলে সূঁচলো-দাড়ি এক মুসলমান বেয়ারা এসে স্যালিউটের ভঙ্গিতে সেলাম করল।

শরৎদা জিজ্ঞেস করলেন—ভেতরে কারা আছেন? আমরা অল্পক্ষণের জন্যে আশ্রয় চাই।

নিচু নম্র গলায় চোস্ত উর্দুতে বেয়ারাটি বলল—সাহেব পরশু ট্যুরে বেরিয়েছেন, কাল ফিরবেন। মেমসাহেব বাচ্চারা বোম্বাইতে আছেন। কুঠিতে সে ছাড়া এখন আর কেউ নেই।

শরৎচন্দ্র বিব্রত গলায় বললেন—তাহলে তুমিই না হয় ঘর খুলে আমাদের

একটু বসতে দাও। বৃষ্টি কমলে আমরা কলকাতা চলে যাব।

বেয়ারাটি সম্ভ্রম ও সৌজন্যের ভঙ্গিতে চওড়া বারান্দার একপাশের একটি শার্সিকাচের বড় দরজা খুলে দিল। আমরা প্রকাণ্ড হলঘরে ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়লুম।

ঘরে ঢুকে শরৎচন্দ্র ছাদ থেকে দেয়াল মেঝে চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করে বললেন—এঘরে এসে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। মনে হচ্চে, এখানে যেন আমি ছিলুম।

আমার স্বামী হেসে বলেছিলেন—ভালো করে একটু মনে করুন না, ঠিক মনে পড়ে যাবে।

শরৎদা প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা একটা ইজিচেয়ারে বসে পড়ে চুরুট ধরাতে ধরাতে বলেছিলেন—পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই। এই রকম ঘরে এসে পড়লে পূর্ব-জন্মের স্মৃতি নড়ে ওঠে। কেমন যেন কী-একটা মনে হতে থাকে। ক্ষুধিত পাষাণের মতন গল্প সহজেই মগজে আসে। তারপরেই তিনি তাঁর সর্বক্ষণের মেজাজে অর্থাৎ ব্যঙ্গ-গূঢ় অথচ সহজ কৌতুকতরল কথাবার্তায় ফিরে এলেন। বললেন—নরেন, ভূতের গল্প লেখার এটি একটি চমৎকার ঘর, নয় ?

স্বামী হেসে বললেন—লিখুন না বসে, কাগজ কলম জোগাড় করে দিচ্চি।

আমি তখন ধরে বসলুম—বড়দা, বৃষ্টি থামতে সময় নেবে, আপনি একটা ভূতের গল্প বলুন।

বিনা প্রতিবাদে তিনি ভূতের গল্প শুরু করলেন। তাঁর বাবার মুখে শোনা। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার আকর্ষণীয় বাক্‌শিল্পের সঙ্গে যাঁরা বাস্তবে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা জানেন—শরৎদার গল্প বলা কেমন ছিল। অন্যের পক্ষে তা প্রকাশ করা সহজ নয়।—রোমহর্ষক ভূতের গল্প বিস্তার করে করে যথা-সময়ে গুটিয়ে এনে শেষকালে অনির্দেশ্যতার মধ্যে মিলিয়ে দিলেন। আমার স্বামী গল্প শেষ হওয়ার আগেই সাবেকী ভারী কৌচে ঘাড় কাৎ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাতাসের গুমরোনি আর বৃষ্টির আছড়ানি তখনও দুর্বল হয়নি। শরৎদা একটু চঞ্চল হয়ে বললেন—চা খেতে ইচ্ছে করচে রে। অনেকক্ষণ বকেছি।

ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে আমি বেয়ারাকে খুঁজে নিয়ে তার হাতে একটি টাকা দিয়ে দোকান থেকে এক কাপ বা দুকাপ চা সংগ্রহ করে দিতে পারবে কিনা জানতে চাইলুম। সে একগাল হেসে, ম্যয় খুদ্‌হি বনা শক্‌তা--বলে সেলাম ঠুকে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে তিন পেয়ালা ধূমায়মান গরম চা পাওয়া গেল পরিচ্ছন্ন পেয়ালা-পিরিচে। স্বামী তখন ঘুমের অতলে

পৌঁছচ্ছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর নাসাধ্বনি নিয়ে আমাকে রাগিয়ে তুলবার চেষ্টায় নানা কৌতুক করছেন।

কথাবার্তা ক্রমশ এমনদিকে মোড় ফিরছে, যার ফলে মনে মনে শরৎদার উপরে আমি রেগে যাচ্ছি। স্বামীকে জাগিয়ে তুলে অপ্রস্তুত করতে চান বুঝে শরৎদার মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় কাপ চা-টা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, এটা নষ্ট হবে, আপনি সদ্গতি করে দিন। আচ্ছা বড়দা,—একটা কথা অনেকদিন থেকে আমার জানতে ভারী ইচ্ছে। আপনাকে বলতেই হবে। ভাগলপুর থেকে একবার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন আপনি। আবার কলকাতা থেকে বর্মায় আপনি কাউকেই না জানিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কেন? আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও কেউ জানতে পারেনি —আপনি অকস্মাৎ কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

শরৎচন্দ্র চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন—জানতে পারলে ওরা কি পালানো পণ্ড করে দিত না? যেতে দিত কি আমাকে? বললুম—সুরেনমামার মুখে শুনেচি, কলকাতায় আপনি ওঁদের কী-একটা জরুরী প্রোগ্রামের ভার নিয়েছিলেন তখন। নাটক টাটক হবে বোধহয়। কাক-পক্ষীও জানতে পারেনি, একদিন সকালে দেখা গেল তোরঙ্গ, বাক্স, বইটই, জামাকাপড়, মায় বাঁশিটা পর্যন্ত নেই। শরৎচন্দ্র উপভোগের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলেছিলেন— সে-সব নামমাত্তর কড়িতে বেচারামবাবুর গলিতে পাঠিয়ে তবেই তো সাগর ডিঙোতে হনুমান-লাফ দিয়েছিলুম। আমি ব্যগ্র হয়ে বলেছিলুম— কিন্তু, কেন? কেন বড়দা? বলুন না সত্যি কথা। আমাকে ধোঁকা দেবেন না. বানিয়ে বলবেননা। না-বলতে চান বলবেননা, আমি কষ্ট পাবনা। মিথ্যে ধোঁকা দিলে খুব কষ্ট পাব জানবেন।...বলুন না, কেন সব বিক্রি করে দিলেন?

করুণ চাপা হাসিতে জবাব দিয়েছিলেন—এবারে তো আমি পদাতিক সেনা নই, নৌ-সেনা যে! পদযাত্রায় পয়সা-কড়ি লাগেনা। সমুদ্র যাত্রায় তা নয়। তবে নিজের সব সম্পত্তি বেচে ফেলেও কিছু ধার করতে হয়েছিল বৈকি!

—কে ধার দিল বড়দা?

—তোমাদের ভদ্দরলোকেরা নয়। তাঁরা বুদ্ধিমান। আমার মতন চাল-চুলোহীনকে তখন বিশ্বাস করত চাল-চুলোহীন লোকেরাই। বিপন্নকে বিশ্বাস করে তারা ধার দিতে পারত। টাকা দিয়েছিল একটা মুখ্যু ঠিকে-ঝি। তার বাসায় গিয়ে টাকা নিয়েছিলুম। তার টাকাটা মনি-অর্ডারে সেই বছরেই শোধ করে দিয়েছিলুম আমি। যদিও আসল দেনা শোধ হয়না। অনেকক্ষণ চোখ বুজে নিস্তব্ধ রইলেন। বোধহয় মনটা অতীতে তখন ডুবে গেছে।

আমি আবার মিনতি করে বলেছিলুম—আমি কোনও দিন কাউকে বলব না কথা দিচ্ছি আপনাকে। বলুন না, কেন ওরকম হঠাৎ দেশ ছেড়ে চলে গেলেন?...

তেমনিই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলেছিলেন—ছোট একটা চিঠি পেয়েছিলুম একজনের। মুদিত চোখ খোলেননি। ঐটুকু বলেই আবার চুপচাপ।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তখন থমকে গেছি। কথা কইতে আর ভরসা হচ্ছেনা। এই একটু আগেই আতঙ্কভরা অলৌকিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে ভূতের গল্প জমিয়ে তুলেছিলেন এই মানুষটিই, কে বলবে?

আমি নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর মুদিত চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে আমার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিষণ্ণ উদাস হাসলেন।

একটা চিরকুট এসেছিল ডাকে। ছোট্ট কয়েকটি লাইন।

...এখানে যোগাযোগ কখনও আর রাখবেননা। আপনি অনেক দূরে চলে যান। আমাকে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন।—ব্যস্! এক লাফে সাগর-পার।... অবিশ্যি আগে থেকেই যাব-যাব ভাবছিলুম। দপ্ করে দেশলাই কাঠি জেবলে দিল ডাকে-আসা লাইন ক'টা। দু'তিন দিনের মধ্যেই বিলিবন্দেজ করে ফেললুম। দেরী করিনি।

আমি ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে ফেলেছিলুম—কে বড়দা, কে? ঐ ডেথ্-সেনটেনসের মতন হুকুম—

আবার তাঁর সেই বরফ-ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর। জানতে চেয়োনা। জানতে চাইতে নেই।

এই চিরকুটের কথা শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা। তার মর্মার্থ মোটামুটি যা স্মরণে আছে, সাবধানে যথাযথভাবে দিতে চেষ্টা করলুম। 'নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন' কথাটি স্পষ্ট মনে আছে। কারণ বরাবর মনের মধ্যে ঐ ক'টি কথা আমি অনেক নাড়াচাড়া করেছি। শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি যে কারুর পক্ষে শ্বাস-রোধী হতে পারে, এর অর্থ তখন ঠিক বুঝতে পারতুমনা। এতদিনে বয়স আর অভিজ্ঞতা অর্থ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

সেদিন দুর্যোগ থামলে আমরা বাড়ি ফিরেছিলুম। দীর্ঘ পথে শরৎচন্দ্র গাড়ির ভিতরে একটিও কথাবার্তা বলেননি। সমস্ত পথ অন্যমনস্ক ছিলেন।

এর কয়েকদিন পরে এক সময়ে আমার কাছে এসে বলেছিলেন—আমি জানি, তুমি পেটে কথা রাখতে পারবেনা। মেয়েমানুষের পেটে কথা হজম

হয় না, ব্রহ্মশাপ আছে।

আমি সেদিন তাঁর পায়ে হাত রেখে বলেছিলুম—এই আপনার পা ছুঁয়ে রাখলুম। কোনও দিন কথার নড়চড় করবনা।

করিনি শরৎদার কাছে কথার নড়চড়। মুখে কোথাও উচ্চারণ করিনি। শরৎদাকে নিয়ে কিছু লিখিওনি আমি। লিখিনা। লিখতে পারিনা। লিখতে বসে কলম আটকে গেছে। মনে হয়েছে—সত্যভঙ্গ করছি।

৯

আপনা থেকেই শরৎচন্দ্রের কাছে যা জানতে পেরেছি এখন বলে যাব। বলা উচিত। সত্য তথ্য হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। এখন সামাজিক সেইসব বাধা নেই। তাঁরা দুজনে নিন্দা-সুখ্যাতির অনেক ঊর্ধ্বে। এখন এই তথ্য কোথাও পারিবারিক মর্যাদায় ঘা দেবেনা। এখন মানুষের সামাজিক মন লোহার খাঁচায় কঠিন বন্দী নয়। সেদিন পরিবেশ পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল।

দ্বিতীয় তথ্য এই। ভাগলপুরে অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে অনেক লোকই তাঁকে পীড়াপীড়ি করতেন। তিনি এক এক জায়গায় এক একটি কারণ গল্প করতেন। কখনও বলেছেন—বাবার সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য পাথর বিলিয়ে দিয়েছিলেন বলে বাবা তিরস্কার করেছিলেন—সেই অভিমানে নিরুদ্দিষ্ট হন। আবার কাউকে বা বলেছেন -মামার বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপুজোর পঙক্তিভোজে রক্ষণশীলেরা উচ্ছৃঙখল শরৎচন্দ্রের (যিনি অব্রাহ্মণের শব দাহ, অব্রাহ্মণের ঘরে বসবাস আহার-বিহার করেন) হাতের পরিবেশন গ্রহণ করতে আপত্তি করায়, সর্বসমক্ষে অপমানিত শরৎচন্দ্র সেই রাত্রেই ভাগলপুর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে সন্ন্যাসীদের দলে মিশে যান। এইরকম আরও দুই একটি গল্প তাঁর নিরুদ্দেশের কারণ বলে লোকমুখে ছড়ান ছিল। তিনি কোনোটারই কোনও দিন প্রতিবাদ করেননি।

উল্লিখিত একটি গল্প আমরাও তাঁর মুখে শুনেছি আগে। নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ তিনি প্রকাশ করেননি লোকসমাজে। তখন আমরা হিন্দুস্থান পার্কে পাঁচ নম্বর বাসায় সাময়িকভাবে বাস করি। শরৎদা প্রতিদিনই পাঁচ নম্বরে আসতেন। একদিন তাঁর মেজাজ খুবই বিষণ্ণ ছিল। অন্যদিন যে-সময়ে আসতেন, তার প্রায় ঘণ্টা আড়াই আগে, বেলা তখনও তিনটে বাজেনি, শরৎদার পায়ের চটির আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলুম। বিষণ্ণমূর্তি শরৎদা, সঙ্গে কোনও

সঙ্গী নেই, একলা। এখানে যখন আসতেন, সঙ্গে প্রায়ই কেউ না কেউ সঙ্গী নিয়ে। আমাদের পরিচিত বা অপরিচিত কেউ। একলা শরৎচন্দ্রকে অসময়ে আসতে দেখে বলে ফেলেছি—এ কী বড়দা? এমন অসময়ে যে!

ব্যস্! চট করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—ভুল হয়েছে। এটা তোমার অসময় বুঝতে পারিনি। যাচ্ছি, পরে যথাসময়ে আসব। আমি ব্যাকুল হয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলুম।—লক্ষ্মীটি বড়দা, আমি খুশিই হয়েচি। মুখ দিয়ে বিস্ময়টা ঐরকম ভাষায় বেরিয়ে গেল। বসুন, গুণনিধিকে তামাক দিতে বলচি।

বড়দা হাসলেননা, কৌতুক করলেননা, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—সাদাচুল বুড়ো হয়ে গেছি বলে রক্ষে। নইলে, এখুনি তাড়িয়ে দিতে। বলতে, আমার স্বামী এখন বাড়ি নেই, এমন অসময়ে আপনার আসা উচিত হয়নি। চলে যান। আমার সুনাম নষ্ট হবে।

আমি জিভ কেটে বলেছিলুম—বড়দা, যা মুখে আসে, তাই বলতে আপনার বাধে না? আমার কাছে আমার স্বামীর বন্ধুবান্ধবেরা যে-কোন সময়ে যখন খুশি আসেন, বসেন, খাওয়া দাওয়া করেন, তার কোনও সময়-অসময় নেই এটা কি আপনি জানেননা? আমার মনে কক্ষনও কিচ্ছুই হয় না, আমার স্বামীরও না। আসলে কি জানেন, আমার তো কখনও মনেই থাকেনা আমি মেয়েমানুষ কিংবা পুরুষমানুষ!

এইবার তিনি প্রসন্ন হেসে চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর একটি নির্দিষ্ট ডেকচেয়ার ছিল, সেটি অন্য কাউকে কখনও আমরা ব্যবহার করতে দিতুমনা। গড়গড়া এল। আমি তাঁর চেয়ারের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলুম।

মাথার চুলে বিলি কাটায় তাঁর মেজাজ প্রফুল্ল হত। অন্য কোনও দিন বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুলে বিলি কাটতে দিতেননা। সামনে এসে বসবার জন্যে তাড়া দিতেন। বলতেন—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস, দুর্বল মানুষ, কষ্ট হবে। সামনে এসে বোস্, গল্প করি। মুখ দেখতে না পেলে গল্প করতে পারিনা।

দশ পনের মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে যে-মানুষ অস্থির হয়ে বসিয়ে দেন—সেই মানুষ নিঃশব্দে চোখ বুজে তামাক টানতে লাগলেন সমানে। কলকে নিবে আসছে দেখে গুণনিধি নিজে থেকে আগুন বদলে দিয়ে গেল। ও'র কোনও খেয়ালই যেন নেই। আমার পা বেশ টনটন করছে তখন, কিন্তু মনে মনে জেদ করে আছি, উনি বসতে না বললে বসবনা। অনেক পরে সেদিন চৈতন্য হল তাঁর। তাও ব্যস্ত বা লজ্জিত হলেননা। শান্ত গলায় বললেন—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করছেনা?

আমি বললুম—করলেই বা!

ঘাড় উঁচু করে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—করলেই বা? আমি ভেবেছিলুম বলবে—না, না, কিছু কষ্ট হচ্চেনা।

আমি বললুম—মিথ্যে কথা বলব কেন?

আবার তিনি একটু অবাক সুরেই বললেন—মিথ্যে কথা বলতে গরজ নেই তোমার? তাই তো!

তারপরে আবার চুপচাপ। আমি তখন বেশ একটু রেগে গেছি। তাঁর সামনে গিয়ে নিচু চৌকির ওপরে দুম করে বসে পড়ে বললুম—না-ই বা কেউ আমাকে বসতে বলেন, তাতে আমার বসা কিচ্ছু আটকায়না।

উদাস হাসলেন। বললেন—কিন্তু বেশ আটকাচ্ছিল সেটা তো দেখা গেল স্পষ্ট। নরেন আসুক, সে কাকে ডিগ্রি দেয় দেখা যাবে।

আমি জবাব দিলুম না। জানি, এই চুপ করে থাকাটা শরৎদা একেবারেই সইতে পারেননা। কথা কওয়াবেনই।

শরৎদা এদিন দারুণ সিরিয়স মুডে। এই মুডের শরৎচন্দ্রকে বেশ ভয় পেতুম। তিনি আস্তে আস্তে বললেন—তোমরা, মেয়েরা, তোমাদের নিজেদের হাত পা মাথার চেয়েও বেশী দাম দাও, অন্য লোকে কে কী বলবে, কে কী ভাববে! সুনাম জিনিসটার জন্যে তোমরা পারনা এমন কাজ নেই। আশ্চর্য।

আমি তো তখন মনে মনে আড়ষ্ট। ওঁর কথার তাৎপর্য যে কী, কিছুই আন্দাজ করতে পারছিনা। অস্বস্তিতে নিশ্বাস রোধ করে নিস্তব্ধ আছি।

উনি আপন মনে বলে চলেছেন—এ আমি এমনিই অদ্ভুতরকম দেখেচি, আর দেখচি জীবনভর—কিছুতেই এর মূল্যটা কোথায় খুঁজে পাইনি। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে, নিজের সহজ প্রকৃতিকে, নিজের রক্তমাংসকেও এমন করে অস্বীকার করে একটা বানানো ফানুস হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে—এটা মেয়েমানুষ জাতকে না দেখলে বিশ্বাস করতুমনা।

আমার অস্বস্তি ক্রমশই বাড়ছে। শেষে মুখ খুললুম। কার কথা মনে করে এসব কথা মনে হচ্চে বড়দা?

—যার কথায় তিন ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেছলুম।

—সে কী?

—হ্যাঁ। একটা চিরকুট এসেছিল। 'আপনি এ দেশ ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যান। আর এখানে আসিবেন না। আমাকে এভাবে নষ্ট করিবেন না।'

—আপনি তো চন্দননগরে বলেছিলেন, বার্মা গিয়েছিলেন চিঠি পেয়ে। প্রথমবার তো নিরুদ্দিষ্ট হন বাবার ওপরে অভিমান করে।

না। দ্বিতীয়বারে অপরাধ করেছিলুম; একটা চিঠি লিখে ফেলেছিলুম: নির্দোষ নির্মল সে-চিঠি। কিন্তু, সেটা অন্য লোকদের হাতে পড়েছিল। চিঠি

লেখাটাই তো মৌলিক অপরাধ। ভালমন্দের প্রশ্নই ওঠেনা। ফলে—ডাকযোগে নির্বাসনদণ্ড এসে গেল। আর, প্রথমবারে ঠিক তা নয়।

আমি বুঝেছিলুম, যে-কারণেই হোক আজ শরৎদার মনের ভিতরটায় খুবই একটা তোলপাড় চলেছে। আমার মনে যথেষ্ট উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা হলেও, কিছুই যে করার নেই, এটা জানতুম। সম্পূর্ণ নীরব থাকাই এই সময়ে ভাল। কোনও কারণে বিচলিত মানুষটির মন হয়ত এখানে দুটো একটা কথা বলে হালকা হতে চাইছে। এখন কথা না বলে মন দিয়ে শোনাই উচিত। আমার অনুমান ভ্রান্ত হয়নি। সেইদিন শরৎচন্দ্র নিজে থেকেই বলেছিলেন উপরের তথ্যটি। এটি নিয়ে আমি কৌতূহল মেটাবার জন্য কোনও প্রশ্ন কখনও তাঁকে করিনি। জানতুম, ওখানটা তাঁর সবচেয়ে বেশী নরম জায়গা, গোপন জায়গা, পবিত্র জায়গাও বটে।

ভাগলপুর থেকে আর কলকাতা থেকে শরৎচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার প্রকৃত কারণ বিশ্বসংসারে একটিই মাত্র মানুষ তখন জানতেন—তিনি নিরুপমা দেবী।

সেই চিরকুটে লেখা লাইন ক'টি শরৎচন্দ্রের বুকের পাঁজরে আগুন-অক্ষরে উৎকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। তাঁর সাহিত্যে বারবার শুদ্ধাচারিণী বাল বিধবার মুখে ফুটে উঠেছে—ঐ একই কথা। যা তিনি নিজে পেয়েছিলেন একটি কঠোর নিষ্ঠাশীলা বালবিধবার কাছ থেকে। তাঁর 'মন্দির' গল্পে পড়ি—'কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল—আর তুমি আমার সামনে এসো না।' পড়ি—'কঠিন স্বরে অপর্ণা চম্পকাঙ্গুলি দিয়া বহির্দেশ দেখাইয়া বলিল—যাও—'

'বড়দিদি'তে অন্তঃপুরিকা বালবিধবা মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে নিজের হৃদয়ের অন্তঃপুরে অনধিকার প্রবেশ করতে দেখে ভয়ে আতঙ্কে তাঁকে বাইরে থেকে তাড়িয়ে দিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুদ্ধিমতী মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলাফলের কথা এখানে তুলছিনা।

তারপরে দেখা যায়, শুধু পরিবারের পটভূমিকায় নয়, গোটা 'পল্লী-সমাজে'রই পটভূমিকায় কঠোর সংযমপরায়ণা হিন্দু বালবিধবা রমা। রমার মত তীক্ষ্ম বুদ্ধিমতী, বিচারশক্তিশালিনী মেয়েরও মুখ থেকে সেই একই কথা আগুনের অক্ষরে অবিকল উদ্ধৃতির মত বেরিয়ে আসে—'আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে ক্ষতি। আমি মিনতি করচি রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট করো না, তুমি যাও—যাও এদেশ থেকে।'

'পথনির্দেশ' বইতে হেম প্রকৃতিগত বিদ্রোহিনী। হিন্দু বালবিধবা তাকেও হতে হয়। সেও প্রার্থী গুণীন্দ্রকে কঠোর প্রত্যাখ্যান করে। তবে, তার প্রত্যাখ্যান সংস্কার-অন্ধতায় বা সমাজভীতিতে নয়, অভিমানে। বালবিধবাদের কঠোর সংযম, হৃদয়ভরা অকৃত্রিম প্রেম, আর নৈকট্য থেকে প্রিয় ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে

দেওয়া, সকলেরই মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে প্রকাশিত।

ভাগলপুরে একটি ছোট চিরকুট পেয়ে শরৎচন্দ্র উধাও হয়ে গিয়েছিলেন এটি সত্য। শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা এই নারীর জীবনে এই 'নষ্ট করা' বা নষ্ট হওয়া ভয়টি নিতান্ত অমূলক ছিল। শরৎচন্দ্র কোনও দিনই তাঁর ইচ্ছার উপর নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেননি। করতে চাননি কখনও। অথচ, এই একই ভয়, একই চিন্তা ফিরে এসেছে 'পথনির্দেশে' হেমের মুখেও।

'বুঝেই বলচি। তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যা বলচো, আমি স্পষ্ট করে তোমার মুখের সামনেই তা বলচি। তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও। বিধবার আবার বিয়ে কি গুণিদা?'

এই 'নষ্ট করা' শব্দটি শরৎচন্দ্রের মনে তীক্ষ্ন-বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আমার অনুমান। যেহেতু, নিরুপমাকে সামাজিক অর্থে নষ্ট করা তাঁর কল্পনারও অনেক সুদূরে ছিল সন্দেহ নেই।

নিরুপমা তাঁর কাছে প্রথম থেকে বরাবরই অতি মূল্যবান একটি পবিত্র আধারের মত। তাঁর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাকে পর্যন্ত অত্যন্ত সাবধানে. সতর্ক যত্নে তিনি মনে মনে নাড়াচাড়া করতেন। যেন ভেঙে না যায়. হাতের দাগে মলিন না হয়. কোনোখানে 'খুঁতে' হয়ে না যায়। প্রিয়জনের এই দুর্লভ দুর্মূল্য অনুভবটির যথাযথ মূল্য নির্ণয় বা মান নির্ণয় নিরুপমা করতে পেরেছিলেন কিনা, বুঝতে পারা যায়না। হয়ত বা একে সামান্য মানে দেখে সাধারণ মনে বুঝে ভুল করে ছোট আয়তনের মধ্যে নিরুপমা ধরেছিলেন। সেইজন্যই তিনি এত ভয় পেতেন। শরৎচন্দ্রের বাইরেটা মোটামুটি সামান্য ছিল। কলঙ্কও ছিল কিছুটা। নিরুপমা তাঁর জ্যোতির্ময় সত্তাটিকে বাইরের তুচ্ছ আবরণের মধ্যে ঝাপসা দেখেছিলেন কি? যেমন, তাঁর কাছে 'ধর্ম' আর 'ধর্মকর্ম' এক হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র হাজার চেষ্টা করেও দুটির মধ্যে যে আশমান-জমিন ফারাক সেটি তাঁকে বোঝাতে পারেননি। তেমনি তাঁর কাছে হয়ত ভালবাসা অর্থাৎ শুভ-বাসনা (ভাল-শুভ, বাসা-বাসনা) মৌলিক অর্থে প্রকাশিত না হয়ে 'কামনা' রূপেই শঙ্কিত করে তুলেছিল। শরৎচন্দ্রের স্বভাবে তো 'দেওয়া'ই ছিল প্রধান. তা কি তাঁর অগোচরে থেকেছে? দিতে পারাটাই ছিল তাঁর আনন্দ, নেওযার দিকটায় নজর ছিলনা। দিতে পারলেই যেন পাওয়ার তৃপ্তি অনুভব করতেন। চেয়েছেন কি কখনও কিছু? মনে তো হয় না। তাঁকে দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছিল, এইখানেই ছিল তাঁর কষ্ট, আমার যতদূর অনুমান হয়।

পাছে প্রতিদানের অবশ্যকর্তব্যে পড়ে যেতে হয় এই আশঙ্কায়

নিরুপমা নিতে পারতেননা কিছুই, কেবলই ঘা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আঘাত করেছেন বারবার।

তাঁকে চিঠি লেখার অপরাধে (হয়ত সে-চিঠি অন্যের হাতে না পড়লে কিছুই ঝামেলা হতনা) ভাগলপুর থেকে কলকাতাতে চিঠি লিখে ভর্ৎসনা করাটা নিরুপমার পক্ষে অনর্থক ভয়ের প্রকাশ বলে আমার মনে হয়েছে। কিন্তু প্রথম নিরুদ্দেশের সময় ভাগলপুর ছেড়ে দূরে সরে যেতে বলাটা বোধহয় অযৌক্তিক হয়নি। সে-সময়ে শরৎচন্দ্রের লাগম-ছেঁড়া মন, বাঁধনশূন্য জীবন নিরুপমা দেবীর পক্ষে পারিবারিক এবং মানসিক নিরাপত্তা নষ্ট করার হয়ত বা অনুকূলেই ছিল। নিরুপমা সদা-সতর্ক থাকতেন, যাতে ভুল করেও কোনও দুর্নাম না রটে।

পরে আমার মনে হয়েছিল, সেদিন তিনি অত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন কেন? সেদিন কি তিনি কোনও চিঠি পেয়েছিলেন, বা কোনও আঘাতকর সংবাদ?—বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে অন্যত্র এসে অমন অবসন্ন মুহ্যমান হয়ে রইলেন কেন?—সুস্পষ্ট জানতে পারিনি কিছু।

১০

নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর পরে কোনও একটি অখ্যাত পত্রিকায় বেরিয়েছিল —শরৎচন্দ্র ও নিরুপমা দেবীর মধ্যে ভালবাসা ছিল। নিরুপমা দেবীর সাহিত্য-জীবনে শরৎচন্দ্রের কিছু দানও আছে। তিনি নিরুপমার রচনা সংশোধন করে দিতেন। এমনকি, 'অন্নপূর্ণার মন্দির' বইখানিতে শরৎচন্দ্রের হাত আছে।

এই দায়িত্বহীন খবরটি পড়ে উপন্যাসলেখিকা অনুরূপা দেবী অত্যন্ত বিচলিত ও উত্তেজিত হন। 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় অতি কঠোর, অসংযত ভাষায় মৃত শরৎচন্দ্রকে প্রচুর কটূক্তি করেছিলেন। তিনি বলেন, অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণ-বিধবা নিরুপমার সঙ্গে—বাড়ি থেকে বিতাড়িত, দুশ্চরিত্র, নেশাখোর মূর্খ বাউণ্ডুলে শরৎচন্দ্রের কখনও কোনওদিন কোনও সম্পর্ক ছিলনা। থাকা সম্ভবও ছিলনা। নিরুপমা কড়া পর্দানসীন অভিজাত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। অনুরূপা তাঁর ঘনিষ্ঠ সখী এবং সাহিত্যসৃষ্টির উৎসাহদায়িনী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রেরণায় নয়, সুরূপা ও অনুরূপা দেবীব প্রেরণায় আর প্রভাবে নিরুপমা সাহিত্যে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র জীবনে নিরুপমাকে কখনও চাক্ষুষ দেখেনওনি। তাঁর ছোটদা বিভূতি ভট্ট নিরুপমার লেখা তাঁদের সাহিত্যসভায় দেখাতেন, হাতে লেখা 'ছায়া' পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। সেই সূত্রে নিরুপমার পরিচয় শরৎচন্দ্র জেনেছিলেন মাত্র। আসলে শরৎচন্দ্র ভাল লোক ছিলেন না, নিজেকে সম্মানিত করার মতলবে এইসব বাজে আপত্তিজনক গল্প রটনা করেছেন।

অনুরূপা দেবীর সেই তীব্র কটূক্তিপূর্ণ লেখাটির প্রতিবাদ করার জন্য প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র ও নিরুপমার সাহিত্যজীবন শুরুর সময়ে অনুরূপার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব তথ্য তুলে তিনি লিখেছিলেন। অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা তাতে ছিল। সে-লেখার প্রতিবাদ অনেক পরের যুগের মানুষ আমরা, কোন সূত্র নিয়ে করতে পারি? সমকালীন মানুষ উপেনবাবু,

সুরেনবাবু, সৌরীনবাবু এঁরা সেই সাহিত্যচক্রে যুক্ত ছিলেন, এঁরা করলেও করতে পারেন, আমরা বলেছিলাম। তারপরে আমি নিরুপমা দেবীরই বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা স্মৃতিচারণা থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গী আর ঘটনাগত তথ্যগুলি উদ্ধৃত করে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রতিবাদের আকারে পাঠাই। প্রকাশক হরিদাসবাবু ও সম্পাদক জলধর সেন সেই রচনাটির শিরোনাম দিয়েছিলেন "নিরুপমা দেবীর শ্রাদ্ধে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ"। এটি নিয়ে সে-সময়ে কিছুটা আলোড়নও হয়েছিল। নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর পরেই এটি ঘটেছিল। প্রতিবাদটিতে ওঁদের দেওয়া নামটি আমার পছন্দ হয়নি।

আমি এখানে ১৩৪৪ সালের 'ভারতবর্ষ'খানি হাতের কাছে পেয়েছি। এখান থেকে নিরুপমা দেবীর শরৎচন্দ্র সম্পর্কে মনোভঙ্গি কি রকম ছিল পাঠকদের জন্য কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে দিই। এতে নিরুপমা দেবীর মনের চেহারাটি কিছুটা আমরা দেখতে পাব।

(**নিরুপমা দেবীর লেখা**)

'আজ তাঁহার* শ্রাদ্ধ তিথিতে একটা শ্রাদ্ধ তিথির কথা মনে পড়িতেছে। যাহাতে তিনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় অবরোধপ্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেদিন আমার স্বামীর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধদিন। উক্ত যমানিয়া নামক গঙ্গার ছাড়ের উপরে আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি ঠাকুরবাড়ি ছিল। তাহাতেই উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আমার এক মাতৃতুল্যা বিধবা ভ্রাতৃজায়া আমাকে সেইখানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলে দেখিলাম—দাদারা বা ভগ্নীপতি কেহই সেখানে উপস্থিত হন নাই। (বোধ হয় দুঃখে) মাত্র ছোটদা আর একজন কাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে স্বেচ্ছা-সেবকের কার্য করিতেছেন। পরে বুঝিয়াছিলাম, তিনিই শরৎদাদা। উক্ত কার্যের দান আদির মধ্যে তাঁহাদের একটা ভুল হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে আমি পুরোহিতকে তাহা নিবেদন করিলে তাঁহারা সেটি সংশোধনার্থে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং অসঙ্কোচে বড় ভাইয়ের অধিকারে আমাকে উদ্দেশ করিয়া শরৎদাদা বলিলেন—"দ্যাখো দেখি, কতটা হাঙ্গামে পড়তে হল—ভুলটা এতক্ষণ

---

*—'আজ তাঁহার শ্রাদ্ধ তিথিতে'—অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ তিথিতে। শরৎচন্দ্রের তিরোধানের এক মাস পরে নিরুপমা দেবীর এই লেখাটি ১৩৪৪ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর মাসখানেক বাদে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় অনুরূপা দেবীর শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অপ্রিয় রুক্ষ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

পরে ধরিয়ে না দিয়ে তখনি দিলে না কেন?" আমি খুবই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম।

সেদিন ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভীমরুল উক্ত শ্রাদ্ধকার্যের মধ্যেই আমাকে মোক্ষমভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল; কিন্তু সেটা এমন সময়, যাহার মধ্যে চঞ্চল হওয়া বা আসন ত্যাগ করা উচিত মনে হয় নাই। যখন সেটা রক্ত বহাইয়া দিয়াছে, তখন তাঁহারা জানিতে পারিয়া বিষম ব্যস্তভাবে তাহার প্রতিষেধার্থে ছুটাছুটি বাধাইয়া দিলেন। ছোটদার সঙ্গেই শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে একবার দধি, একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।—শ্রাদ্ধান্তে যখন উক্ত ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে বাড়ি ফিরিতেছি—দেখি তখন শরৎদাদা আমাদের বাড়ির দিক হইতে পুঁটুলির মত কি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ছোটদার হাতে দিলেন। ছোটদা তাহা ভ্রাতৃবধূর হাতে দিলে দেখি এক-খানা পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গহনা—শ্রাদ্ধের পূর্বে যাহা বাড়িতে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মনের উত্তেজনায় বোধ হয় সে সময়ে আবার সেগুলো লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে জিদ সেদিন জয়ী হইতে পারে নাই। মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া তো কাঁদিতেই ছিলেন–ছোটদা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছে এবং একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছেন—এ দৃশ্য সেদিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজ কার্যে লজ্জা আনিয়া দিয়াছিল।'

এই ঘটনাটির উল্লেখে এবং আরও অনেকগুলি নিরুপমা লিখিত শরৎচন্দ্র-সম্পর্কিত তথ্যে মাননীয়া অনুরূপা দেবী আর নিজের ভ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেননি।

এই 'দেখা' হবার অনেক আগে থেকেই নিরুপমা ও শরৎচন্দ্র সাহিত্য-চর্চার মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিলেন। ভাগলপুরে কয়েকটি অল্পবয়সী বন্ধু মিলে সাহিত্য আলোচনার জন্য যে ক্ষুদ্র সভা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন—এ সম্বন্ধে নিরুপমা দেবীর লেখা উদ্ধৃত করছি।

'শ্রীমান সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, আমার ছোটদা—ইঁহাদের সঙ্গেই আমার প্রতি-যোগিতা চলিত। শরৎদাদাই বিষয়-নির্বাচন করিয়া দিতেন এবং ছোটদার মারফত আমি পাইতাম।...সমালোচনা শক্তির বিকাশও শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সঙ্গীগুলির মধ্যে আনিবার নানাবিধ পথনির্দেশ করিতেন।...এইরূপে সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার আদি গুরুস্থানীয় ছিলেন।'

নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কী রকম মনোভাব পোষণ করতেন, লোকসমক্ষে চিরদিন অপ্রকাশিত থেকে গেছে। শরৎচন্দ্রের কাছে কিন্তু অপ্রকাশিত ছিলনা। শরৎচন্দ্রের ভিতরকার শিল্পী মানুষটিকে এই অন্তঃ-পুরে অদৃশ্য দূরবর্তিনী যে প্রথম থেকেই চিনেছিলেন, তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটি ছোট গল্প। একদিন নিরুপমার দাদা—"আমাদের সেই ক্ষুদ্রপরিসর সাহিত্যচক্রে (যাহাতে তদানীন্তন বাঙলার বিখ্যাত লেখকদিগের গদ্য, উপন্যাস এবং কাব্য কবিতাদি পঠিত ও আলোচিত হইত; সেইখানে) তাহা হাজির করিলেন। অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান'। শুনিলাম, দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইহার লেখক। গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা সকলে অভিভূত, তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প করলেন যে,—এই গল্পটি পড়ে একজন ন্যাড়াকে মারতে ছুটে। তাকে তখন এই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে বেড়াতে হয়। ক্রমে বৌদিদি, দাদার নিকটে তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন 'অভিমান'-এর লেখকের উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই উদাসী কবি-স্বভাববিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিম দিকে যে প্রকাণ্ড মসজেদ ছিল, (শুনা যাইত তাহা নাকি শাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত। কোনো গভীর রাত্রে সেই মসজেদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণচত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো 'যমানিয়া' নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌকে শুনাইয়া বলিতেন—'এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড!'...আমাদের দল একদিন সেই স্মৃতিসমাধি হইতে বায়ুপথে ভাসিয়া আসা গানের একটি লাইন আবিষ্কার করিল—

'আমি দু'-দিন আসিনি—দু'-দিন দেখিনি
অমনি মুদিলি আঁখি—'

এই স্মৃতিচারণায় লেখিকা সব কথাই যদিও বহুবচনে বলে চলেছেন, তবু একটি লক্ষণীয় আছে। ঘটনাটি তিনি প্রায় চল্লিশ বছর আগের তাঁর স্মৃতি থেকে তুলে আনছেন। একদা বাতাসে ভেসে আসা সেই গানের পঙক্তির কথাগুলি, তাঁর বর্ণিত 'দলে'র কারুর স্মৃতিতে এমন স্থির হয়ে থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। এতে অনুমান করা ভুল না হতে পারে, সেই কড়া অবরোধে বন্দিনী তরুণীটির শিল্পীহৃদয়ে ওই উদাসী তরুণটির বাঁশীর সুর, গানের কলি, সাহিত্যশিল্পের অন্তস্পর্শিতা গভীরভাবেই স্পর্শ করেছিল। তিনি চল্লিশ বছরেও সেই ভেসে আসা গানের কলিটি ভুলে যাননি।

নিরুপমা দেবীর মুখের কথাই আবার শোনাই :

'দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু বাঁশী কখনও সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের রচিত আরও একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল :

"গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল
আঁধার আজি কুঞ্জবন।"

আমাদের পাড়া খঞ্জপুরেরই তিনি অধিবাসী ছিলেন, সেজন্য উক্ত মসজেদ, নদীতীর প্রভৃতি তাঁর বিচরণ স্থান ছিল এবং দাদাদের কাছে প্রায়ই আসিতেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম—তিনি আমাদের ছোটদাদারই বিশিষ্ট বন্ধু। ইহাতে আমাদের দল বিশেষ গর্বই বোধ করিয়াছিল।

আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোটদা তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁর সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ওই সব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত।...পরে শুনিলাম শরৎদাদা নাকি তাঁহাকে (ছোটদাকে) বলিয়াছেন, ওই একটি ভাব একটি কথা ছাড়া বুড়ি যদি আরও পাঁচ রকম ভেবে লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হবে।...তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটি লিখিয়া তাঁহাদের খুশি করি,—তাহার কয়েক ছত্র মনে পড়িতেছে।...

ধরণীর কোমল বুকেতে কত শান্তি ঢাকা আছে ভাই,
নদী তীরে কোমল শয্যায় কে গো তুমি ঘুমায়েছ তাই।
নদী গায় সকরুণ তান, হু হু করে উঠিছে বাতাস,—
এ বুঝি তোমারি খেদগান,—এ বুঝি তোমারি দীর্ঘশ্বাস। ইত্যাদি

আজও মনে আছে—সেই ক্রম-বর্ধিতাকার খাতাখানার কথা,—যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশেপাশে তাঁহার তরুণ জীবনের সাহিত্যরুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল।'

আমি শরৎচন্দ্রের মুখে একাধিক বার শুনেছি—বুড়িকে কবিতা লেখা ছাড়িয়ে গদ্য লেখা উপন্যাস লেখা আমি শিখিয়েছি হাতে ধরে। এই 'হাতে-ধরে শেখানো' কথাটির মানে, লেখিকা তাঁর রচনাগুলি অন্দরমহল থেকে বাইরে শরৎচন্দ্রের হাতে পাঠাতেন, আর শরৎচন্দ্র সেই রচনা বিশেষ যত্ন করে সংশোধন করে তার সঙ্গে নানা মন্তব্য (সাহিত্য সম্পর্কিত) নিরুপমাকে লিখে পাঠাতেন। নিরুপমা অনুগতা ছাত্রী হয়ে সেগুলি গ্রহণ করতেন। জনসমাজে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের লেখাতে পরবর্তী কালে যে নিরুপমা দেবী তাঁর মতামত লিখে পাঠাতেন এ-খবরটি উহ্য ছিল। এইটি একটি জরুরী তথ্য।

শরৎচন্দ্র বিদেশ থেকে বিভূতিভূষণ ভট্টকে চিঠি লিখতেন। সেই চিঠির সঙ্গে নিরুপমাকেও নিরুপমার রচনা সম্বন্ধে মতামত জানিয়ে বা সাধারণ কুশল প্রশ্ন করে সংক্ষিপ্ত চিঠি দিতেন। একবার নিরুপমাকে লেখা শরৎচন্দ্রের কোনও একখানি চিঠি নিয়ে পরিবারের মধ্যে অসহিষ্ণু আপত্তি ওঠে। তার পরেই নিরুপমার হাত থেকে সংক্ষিপ্ত কয়েক লাইন চিঠি আসে কলকাতায়,—যার ফলে শরৎচন্দ্র নিজেকে সকলের সামনে থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেন।

অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট হন। তিনি সাহিত্যচর্চাও এই সময়টিতে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। কারণ, সাহিত্য নিয়েই নিরুপমার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র। সাহিত্য ছাড়লে নিরুপমার সঙ্গে সম্পর্কও বিলুপ্ত হয়। তাই হয়ত কলম পরিহার করেছিলেন। এর আগের বার ভাগলপুরে এই একই ব্যাপার ঘটেছিল। শরৎদার বর্মা চলে যাওয়ার খবরটি চন্দননগরে তাঁর মুখে শুনেছিলাম, এর কয়েক বছর পরে হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে ভাগলপুরের প্রথম নিরুদ্দেশের কারণটি তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনেছি। এদিন আমি প্রশ্ন করিনি,—তিনি আপনা হতেই বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের লেখা যখন 'যমুনা'য় আর 'ভারতবর্ষে' ছাপা হতে লাগল নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের লেখার উপরে নিজের মতামত তাঁকে মাঝে মাঝে লিখে জানাতেন। এর আগেও, ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের রচনার খাতা নিরুপমার ছোটদা নিরুপমাকে পড়তে দিতেন—শরৎচন্দ্রের সেই লেখা সম্পর্কে নিরুপমার মতামত শরৎচন্দ্রের হাতে পেঁছুত। এইখান থেকেই নিরুপমার সাহিত্যবোধ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধার উদ্ভব। সকলের দৃষ্টির আড়ালে দুটি তরুণ তরুণীর সাহিত্যকে অবলম্বন করে বন্ধনহীন হৃদয়ের গ্রন্থনা ভাগলপুরেই গ্রথিত হয়েছিল।

নিরুপমা শরৎচন্দ্রকে তাঁর রচনা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর অভি-নন্দন জানিয়েছিলেন বর্মাতে। শরৎচন্দ্রের কোনও উপায় ছিলনা উত্তর দেবার। তিনি তাঁর মন খুলতেন নিজের মুদ্রিত রচনারই মধ্যে। সাহিত্যের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকত তাঁর নিজের মনের ভাবনা চিন্তা সুখ দুঃখ। যথাস্থানে পেঁছতেও গোলমাল হতনা।

শরৎচন্দ্র বালবিধবা চরিত্র না আঁকলে ভাল হয় এই অনুরোধটি, কবে, কোনখানে নিরুপমার কাছ থেকে এসেছিল আমি জানিনা। অনুরোধটি নিরুপমাদেবীর, এইমাত্র জেনেছি শরৎদার নিজের মুখ থেকে। আমি নিজে ঐ নিয়ে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করতে সাহসী হইনি কখনও। নিরুপমার কাছে শপথ তিনি ভাঙেননি তাঁর জীবনে। এখানে শরৎচন্দ্রের মন অসহ স্পর্শাতুর ছিল, ভাল করে জানি। প্রশ্ন করার উপায়ই ছিলনা কোনও লোকের। তাঁর উপন্যাসের কথোপকথনে, নায়ক নায়িকাদের আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণে, শরৎচন্দ্র মেয়েদের সংস্কারান্ধ দৃষ্টির সামনে নারী-হৃদয়ের যথার্থ রূপটি খুলে ধরতে চেয়েছেন।

১১

দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর উপরোধে পড়ে আমি কলম ধরেছি। স্বেচ্ছায় নয়। সোৎসাহেও নয়। আমার লেখা অনেকের পছন্দ না হতে পারে। কারণ, জীবনের সত্য প্রায়ই অপ্রিয় হয়ে থাকে। আমার লেখা জীবন-নির্ভর। এই লেখা কোনও গবেষণা নয়—কল্পনার তো প্রশ্নই ওঠেনা। কারুর কোনও থীসিস প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা আমার কাজ নয়। যা একান্ত সত্য বলে নিজে জানি, শুধু সেটুকুই লিখছি। যে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় আছে বা যে-কথা আমার সুস্পষ্ট মনে নেই, সেই বিষয়গুলিতে আমি একেবারেই হাত দিচ্ছিনা।

কোনও গবেষকের সিদ্ধান্ত যদি সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যনির্ভর হয়, তবে আমার 'কাল্পনিক' উক্তিতে তাঁর বিচলিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আমার সাধ্য কী, যা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাকে 'কাল্পনিকতা ও অসত্যে'র সাহায্যে 'নিজের উদ্দেশ্য সাধনে' ব্যবহার করি।

শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করেননি। যে যাই নিন্দাবাদ করুন, আমার যা সুনিশ্চিত জানা, আমি তাই জানিয়ে যাব। আমার 'ইষ্ট' একটিই, আমার 'উদ্দেশ্য' একটিই—মানুষ শরৎচন্দ্রকে বাস্তব সত্যের আলোয় সুস্পষ্ট করা।

যে ভ্রান্ত প্রয়াস ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ছিল, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তার সমাপ্তি ঘটেনি। আশা করি, ভবিষ্যতের গবেষকরা এটি লক্ষ করবেন। শরৎচন্দ্রের ভাব-মূর্তি রক্ষার জন্য যে ভ্রান্ত উপায় একদিন এখানে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এখনও হয়ে চলেছে, তার ফলে তাঁর ভাবমূর্তি যে ঝাপসাই হয়ে যাচ্ছে, এটি এঁদের নজরে আসেনা।

সমাজরক্ষকদের অঞ্চলছায়ায় তিনি কোনও দিনই বাস করেননি। বর্তমানেও সেই অঞ্চলছায়া তাঁর যশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন নেই।

আমি মনে করিনা শরৎচন্দ্রের জীবনে কোথাও এমন কোনও কলঙ্ক আছে যা ভবিষ্যতের কাছে প্রকাশ করা যায় না বা গোপন রাখা প্রয়োজন। যতদিন

সমকালের প্রয়োজনে, বিশেষ ব্যক্তিদের প্রয়োজনে গোপন রাখা উচিত ছিল, গোপন রাখা হয়েছে। তাঁর জীবন ছিল খোলামেলা—তাতে ঘোমটা টেনেছেন তাঁর আত্মপরিজন আর বন্ধুবান্ধবরাই, নিজেদের সামাজিক আর লৌকিক প্রয়োজনে। তিনি নিজে আপন জীবনের উপর ঘোমটা টানেননি।

এই ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশক্ষণে শরৎচন্দ্রের আত্মীয় পরিবারের মধ্যে যাঁরা এ সম্পর্কে যতটুকু অবহিত, তাঁরা সত্য উচ্চারণ করতে পারলে ভবিষ্যৎ-কালের কাছে দায়িত্বপালন করে যাবেন। শরৎচন্দ্রের বন্ধুপর্যায়ভুক্ত প্রিয় মাতুল উপেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের পরিবারের লোকেরা এ সম্পর্কে যা জানেন, কুণ্ঠা না করে উচ্চারণ করতে পারলে বাংলাসাহিত্যের কাছে তাঁদের দায়িত্বপালন করে যাবেন। এ-সত্য উচ্চারণে এখন সংসারে বা সমাজে কারও কোনও হানি হবেনা। কেবলমাত্র সংস্কার-দুর্বল মনে কিছুটা অস্বস্তি ঘটবে—উপায় তো তার নেই।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ষাট বছর সময় কেটে গেলেও, সেই একই মনোবৃত্তি সজীব রয়েছে,—যে-মন সংস্কারকে সত্যের আগে স্থান দেয়। সংস্কারের চাপে সত্যকে অস্বীকার এবং অপ্রমাণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সেই মন নিয়েই আমাদের দেশের গবেষকরাও কাজ করেন যদি, এটি একান্তই হতাশার বিষয় হবে নাকি?

যথার্থ সত্যভাষণে শরৎচন্দ্রের চরিত্রহনন হতে পারেনা। বিবাহ না করা সত্ত্বেও তিনি যে তাঁর জীবনসঙ্গিনীর প্রতি নিজের জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নানা বিরুদ্ধতার মধ্যেই যাবতীয় মানবিক কর্তব্য পালন করে গেছেন,— অন্যে অসম্মানের মনোভাব গোপনে পোষণ করলেও নিজে তিনি তাঁকে সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন, এইটিই মানুষ-শরৎচন্দ্রের বড় কথা। মানুষ শরৎচন্দ্রের দুটি বিশেষ পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

প্রথম—তিনি বাইরের সামাজিক সংস্কারকে আপন জীবনে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। আপন হৃদয়ের বা মানবিক নীতির সংস্কারই তাঁর কাছে প্রধান ছিল।

দ্বিতীয়—তিনি মানবিকতার দায় নিয়ে জীবন পালন করেছেন, সমস্ত জীবন স্বেচ্ছায়। কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় আদালতের আইনের আওতায় থাকেননি। ঈশ্বরের একটি অদৃশ্য মহৎ আইনে তাঁর বিশ্বাস আর নির্ভরতা ছিল।

এই দুটি সত্য হিরণ্ময়ী দেবীকে ঘিরে ফুটে আছে শরৎচন্দ্রের জীবনের পাতায়। যে-জন্যে আজ এ-তথ্য মুখ খুলে বলতে আমার কোনও বাধা আসছে-না ভিতর থেকে। আমি শরৎদাকে এবং বৌদিকে অশ্রদ্ধার চোখে কোনওদিন দেখিনি। দুজনকেই আমি ভালবাসতুম।

নিরুপমা দেবী সম্পর্কে আমি যা লিখেছি, তা শরৎদার কাছে টুকরো

কথাবার্তার মাধ্যমে যা পেয়েছি তা থেকে ধীরে ধীরে আমার মনে যেমন ধারণা গড়ে উঠেছে, সেইটুকুই জানিয়েছি। শরৎদা বিস্তারিত করে কোনও কথা বলতেননা। নিজে থেকে যতটুকু বলেছেন—সুস্পষ্ট নাম উচ্চারণ সব সময়ে না করলেও সেটি যে নিরুপমারই কথা, তা বুঝতে আমার ভুল হতে তিনিই কখনও দিতেননা। যেমন,—তোমরা মেয়েরা, পুরুষের মন যতখানি সহজেই বুঝে নাও সহজ ইনস্টিংক্টে, নিজেদের মন সম্পর্কে ততখানিই অন্ধ থেকে যাও। কিংবা, কে জানে—হয়ত ইচ্ছে করেই চোখ বুজে থাক, তাকাতে ভয় পাও। যখন একথাগুলি বলেছেন তখন দৃষ্টি দূর শূন্যে, হাতে গড়গড়ার নল, কণ্ঠস্বর উদাস গাঢ়, মৃদু।

কোনও সময়ে হয়ত তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলেছেন—নিজের চেয়ে তোমরা কাউকে ভালবাস না, এই মেয়েমানুষ জাত। আমি হয়ত রাগ করে বলেছি—মোটেই নয়। এই জাতটা ছিল বলেই আপনাদের জাতটা পৃথিবীর আলো দেখেচে, এই জাতটা নিজেদের গুঁড়িয়ে ধুলো করে আপনাদের জাতটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উঁচু করে তুলচে; আপনাদের জাতকে শক্ত মজবুত করতে, নিজেদের রক্ত হাড় পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে—এটা মিথ্যে প্রমাণ করুন আপনি, বড়দা?

শরৎদা আবার সেই বিবাগীর হাসি হেসেচেন। বলেছেন—ওটা তো বস্তু-জগতের ব্যাপারে এলে। আমি নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া তোমাদের মতন বইপড়া বিদ্যে নিয়ে কথা কইনা। তোমরা তো এখুনি মোটা মোটা বই ছুঁড়ে মেরে আমায় চুপটি করিয়ে দেবে! তোমার মতন বইয়ের বিদ্যে নয়, আমার বিদ্যে নিজেরই জীবন থেকে আমি ভাল জেনেই বলছি,—মেয়ে-জাত অতি নির্মম। এরা নিজেদের পুরোপুরি হাতে পায় বলে নিজের ওপরেই নির্মমতা সবচেয়ে বেশী করে।

কখনও বা বলেছেন—দেবী হতে পেলে তোমরা আর কিছু চাও না, আমি ভাল করেই জানি। তুমি নেহাৎ অনভিজ্ঞ, অভিজ্ঞতা কাকে বলে আজও জান না, নইলে তোমাকে একটা গল্প শোনাতুম। শুনলে থ হয়ে যেতে।

বার বার বলেছি—বলুন বড়দা, বলুন। আমি সব বুঝতে পারি বেশ ভাল করেই। আপনাকে তো আমি কখনও কোনও প্রশ্ন করিনা,—বুঝতে পারি বলেই তো প্রশ্ন করিনা, বড়দা।

শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ অত্যধিক গম্ভীর হয়ে গেছেন তখন। সিরিয়স কণ্ঠে বলেছেন—রাধু, দ্যাখ, একটা কথা বলে দিই—তোমার কাছে মাঝে মাঝে যা আমি গল্প করি, এ নিয়ে তুমি দ্বিতীয় লোকের সঙ্গে কখনও কোনও সময়েই আলোচনা কোরনা। করলে অন্যায় করবে।

বলার ভঙ্গীর মধ্যে একটি দৃঢ় আদেশের সুর ফুটে উঠেছে। আমি

সংকুচিত হয়ে বলেছি—আপনার কথা আমি মনে রাখব বড়দা। কিন্তু 'সব বুঝি' বললে কী হবে তখনও শরৎদার প্রত্যেকটি কথা ঠিক সুস্পষ্ট বুঝিনি।

নিরুপমা দেবী সম্পর্কে আমার ধারণা, আমার 'নিজস্ব মনোভঙ্গী' থেকে নয়—শরৎচন্দ্রেরই মনোভঙ্গী থেকে। শরৎচন্দ্রের হৃদয় সম্পর্কে তাঁরই কাছে নির্ভুল সত্যের সন্ধান না জানলে এ বিষয়ে মুখ খোলা কি কখনও সম্ভবপর হতে পারত আমার নিজের পক্ষে?—নানা দিনে শরৎচন্দ্রের কাছে শোনা সব কথা তো স্পষ্ট করা যায়না, পাঠকের কাছে বিষয়টি বোঝাবার জন্যেই নিরুপায় হয়ে নিরুপমা দেবীর লেখার শরণ নিতে চেষ্টা করেছি। নিজের কল্পনা পূরণের অভিপ্রায়ে নিরুপমা দেবীর লেখার মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে কিনা খোঁজ করিনি। শরৎদার মনোভাব ও হৃদয়ানুভবের আশ্রয় বা সংযোগ ওখানে যদি থাকে, সন্ধান করেছি। আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা বা অনুমানের প্রশ্নই এখানে নেই।

নিরুপমা দেবী সম্পর্কে আমার ধারণা যা হয়েছে, সেটি শরৎদার কাছে যা জেনেছি তাই থেকেই হয়েছে। তাঁর যে স্নিগ্ধ কোমল পবিত্র দেবীমূর্তি আমার মনে গড়ে উঠেছে, এটি শরৎদার থেকেই আমার মনে সঞ্চারিত, কল্পনা থেকে নয়। বাস্তবে হয়ত তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্বময় রূপের সঙ্গে এর মিল না থাকতেও পারে, এটি অসম্ভব নয়। আমি আগ্রহী গবেষক হলে আমার উদ্যম অন্য ধরনের হতে পারত। নিরুপমা দেবী সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার হয়তো চেষ্টা করতুম। আমার মনেই হয়নি, এ-সম্পর্কে তাঁর পরিবারের কাছে তাঁর সম্বন্ধে তথ্য জানতে চাওয়া কর্তব্য। শরৎচন্দ্রের মনে তিনি কোথায় এবং কেমন চেহারায় ছিলেন, আমি সেইটিই যতটুকু নিজে জেনেছিলুম তা একটুও পল্লবিত বা রঞ্জিত না করে সংক্ষেপে সাবধানে বলতে চেষ্টা করেছি।

তা ছাড়া আর একটি কথা। আমি তো শরৎচন্দ্র নিয়ে গবেষণা করছিনা। আমার নিজের জীবনের একটি সত্যকার অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে যাচ্ছি। এর জন্যে আমার বই-পড়া কাগজ-ঘাঁটার সামান্যই প্রয়োজন হয়েছে স্মৃতিকে সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্যে। কোথাও কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তথ্যসংগ্রহের দরকার হয়নি। নিরুপমা দেবীকে কখনও ঘরোয়া জীবনের মধ্যে আমি দেখিনি। আমি কয়েকবার মাত্র তাঁকে যতটুকু দেখেছি, তখন তাঁকে শান্ত, কোমল শুচিতাস্নিগ্ধ অথচ বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ বলেই আমার মনে হয়েছে। আমি তাই লিখেছি। আমার মনে হয়নি এ-সম্বন্ধে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ কর্তব্য। যতটা সম্ভব অকৃত্রিমতার মধ্য দিয়েই আমার জানাটুকু জানিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি।

আমি অনিচ্ছুক কলমধারী। নিজের উৎসাহে কলম ধরলে অনেক আগেই লিখতে পারতুম। বিতর্ক-জটিল ব্যাপারের মধ্যে পাছে পড়তে হয়, এই ভয়েই

তো মুখ খুলিনি শরৎদাকে নিয়ে।

কোনও কাউকে ছোট করা বা বড় করার অভিপ্রায় আমার নেই। এমনকি শরৎদাকেও বড় করে তোলা বা ছোট করা আমার মনোগত অভিপ্রায় নয়। তাঁকে যেমন দেখেছি এবং যেমন বুঝেছি তাই লিখে যাবার চেষ্টা করছি। এতে তিনি বড়ও হতে পারেন, ছোটও হতে পারেন এটি ইচ্ছাধীন নয়।

আমার লেখা কল্পনা-নির্ভর নয়, এটি আমি আবার উচ্চারণ করছি। সচেতন মনে, সত্যের প্রতি দৃঢ়নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেলুম। একে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত হবেনা। আমি নিন্দিত হব মাত্র। তাতে আমার জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি মাত্র বছরে শান্তিভঙ্গও হবেনা।

এই তথ্যগুলির জন্যে আমি কোনও দিন চেষ্টা কখনও করিনি; কোনও পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিনি। এই তথ্য আমি যার মাধ্যমে পেয়েছি, সংসারে তা অতি দুর্লভ বস্তু। বিধাতা দয়া না করলে সে-সামগ্রী চেষ্টা করেও মানুষ জীবনে পায়না। বিধাতা আপনা হতেই যেখানে দেন—সেখানেই মানুষ সত্যকার বিশ্বাস আর সত্যকার স্নেহ ভালবাসা পায়। এটা দৈবাৎ বললেও বলা চলে হয়ত। আমি শরৎদার স্নেহের আর বিশ্বাসের অমর্যাদা বোধহয় জ্ঞানত কখনও করিনি।

নিজের কৃতিত্বে নয়, তথ্যগুলি আপনা হতে আমার কাছে পৌঁছেছিল। না পৌঁছুলেই নিশ্চয় আমার পক্ষে ভাল হত। আমি এইসব তথ্য প্রাপ্তির উপযুক্ত মানুষ বলে নিজেকে তখনও মনে করতুম না, এখনও করিনা। সুযোগ্য ব্যক্তির কাছে এগুলি এলে, তাঁরা প্রতিদিনের প্রতি কথা প্রতি ঘটনা সাক্ষীদের নামসহ নিশ্চয় লিখে রাখতেন। আমি তখন জানতুম, এসব কথা কখনওই কোনও দিন আমার মুখ থেকে বেরুবেনা। তাই, অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছি। তবু, যা পারলুম, যতটুকু পারলুম পাঁচজন বিদগ্ধ ব্যক্তির পরামর্শে ও অনুরোধে লিখে রেখে গেলুম। একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কোনও ব্যাকুলতা আমার নেই। অতিরঞ্জন দূরে থাক, যথাসম্ভব অল্প সঙ্কেতেই প্রকাশের চেষ্টা করেছি, কতখানি পেরেছি তা জানিনা।

শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা বলতেন। কবি গিরিজা-কুমার ও তমাললতা বসুর একমাত্র সন্তান বুধুর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত উক্তির কথা এর আগে লিখেছি।

এই ব্যাপার নিয়ে পরে একটি ঘটনা ঘটেছিল যার উল্লেখ করে যাওয়া ভাল। কারণ, সে-ব্যাপারটি একটি পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে শরৎচন্দ্রের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে, অনেকেই স্মৃতিকথা লিখতে লাগলেন। অনেকেরই লেখায় একটি দুর্বলতা লক্ষ করা যেতে লাগল—স্মৃতিকথা-লেখকের কত বেশি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন শরৎচন্দ্র এটি প্রমাণ করার জন্যে লেখকের ব্যগ্রতা, কেউ অল্প পরিচয়কে গভীর পরিচয়, কেউ সাধারণ মেশামেশিকে ঘনিষ্ঠ মেশামেশি, কেউ সহজ বন্ধুত্বকে গভীর অন্তরঙ্গতার উঁচু ডিগ্রীতে তুলে লিখতে লাগলেন। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের বৈঠকখানায় অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা, ক্ষোভ, বিরক্তি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাস্য-পরিহাসের ঝড় বইতে দেখেছি। শরৎদাকে নিয়ে তখনই বেশ কাল্পনিক কথাও কেউ কেউ লিখে ফেললেন। এতে আমরা অনেকেই মনঃক্ষোভে দুঃখ পেয়েছি আর বিচলিতও হয়েছি সেই সময়ে। সকলেই বলাবলি করতেন—যেরকম হারে যার-যেমন খুশী লিখে যাচ্ছেন, ভবিষ্যতে সত্যিকথা যে কোনটা, কেউ খুঁজে পাবেনা।

কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'দীপালি' সাপ্তাহিকপত্রের স্বত্বাধিকারী সম্পাদক। আমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে এখানে আড্ডা দিতে আসতেন দূর মানিকতলা থেকে। আমরা দুজনেও তাঁর মানিকতলার বাড়ীতে অনেকবার গিয়েছি।

একবার আমাদের বাড়ীতে এক রবিবারের সকালে মহা হৈ-চৈ চেঁচামেচি। বৈঠকখানায় অনেকেই এসে জমেছেন। কবি বসন্তকুমারের সঙ্গে কবি গিরিজা-কুমারের সেদিন তর্ক প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে পেঁৗছেছিল। বসন্তকুমারের কণ্ঠস্বর ধৈবতগ্রাম-ঘেঁষা, গিরিজাকুমারের পঞ্চম-ঘেঁষা। স্বামী বলতেন—বসন্তের কোকিলকণ্ঠ।—সেদিনকার ব্যাপারটি ছিল—গিরিজাকুমারের স্ত্রী তমাললতা বসুর একটি রচনা বসন্তবাবু তাঁর পত্রিকায় ছাপার সময়ে তথ্য বদলেছেন বলে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন গিরিজাবাবু। বসন্তকুমার উচ্চগ্রামে চড়া সুরে বলছেন—তাঁর বদলাবার অধিকার আছে।

গিরিজাকুমার তাঁর চেয়েও অনেক চড়াগ্রামে বলছেন—অধিকার নেই।

তমাললতার কাছে বসন্তবাবু শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে একটি স্মৃতিচারণ নিয়েছেন। যাতে লেখা ছিল—'তুমি তো আঠার-উনিশ বছর পুত্র-সুখ ভোগ করে তারপর পুত্রশোকের দুঃখ পেয়েছ, আমি যে ছ' মাসও পুত্রসুখ পেতে না পেতেই পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা পেয়ে গেছি—'

বসন্তবাবু তাঁর কাগজে সদ্যোপরলোকগত শরৎচন্দ্রের পুত্রশোকের খবর ছেপে বিস্ময় সৃষ্টির দায়ে পড়তে চাননা। 'দীপালি' আজগুবি খবর ছাপে, রটে যেতে পারে। লেগে যাবে বাদ-প্রতিবাদের 'কিউ'। শরৎদা যখন জীবিত নেই, তাঁর মুখের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবে কে? গিরিজাবাবু বলেছিলেন—তুমি ঐ অংশটি কেটে বাদ দিতে পার। নতুন কথা নিজের

ইচ্ছেমত জুড়ে দিতে পারনা। বসন্তবাবু বলেছিলেন—আলবৎ পারি। আমার সে-রাইট আছে। সকলেই জানে তিনি অপুত্রক ছিলেন। ঐরকম একটা তথ্য এই শোকের মধ্যে আমার কাগজে ছেপে আমি কাগজের বদনাম কিনতে পারিনা। ইত্যাদি।

সেদিন সেখানে চার পাঁচজন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তার মধ্যে আমার স্বামী এবং আমিও ছিলুম। উপস্থিত সকলেই গিরিজাকুমার বসুর অভিমত সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ পছন্দ না হলে সম্পাদক কোনো অংশ বাদ দিতে নিশ্চয়ই পারেন, লেখকের যদি নিষেধ না থাকে। তিনি নিজের ইচ্ছেমত অন্য কথা বসাতে পারেননা।

আমার স্বামী যে একখানি সংক্ষিপ্ত শরৎজীবনী সে-সময়ে লিখেছিলেন —তার বীজ কিন্তু ঐদিনেই। শরৎচন্দ্রের একটি পুত্র হয়েছিল, এই তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বইটি লেখা।

দায়িত্বশীল লোকেরা বলতে লাগলেন, শরৎচন্দ্রের জীবনের যেগুলি সঠিক তথ্য, সেগুলি এই বেলাই মুদ্রিত হওয়া উচিত। পরে আরও বেশি তথ্য সংগ্রহ করে বড় বই হবে। মোটামুটি সত্যকার তথ্যগুলি মিথ্যের ভিড়ে শেষ-কালে না হারিয়ে যায়। পরে, যাচাইয়ে যা টিকবে তা থাকবে, যা টিকবে না তা আপনিই বাদ যাবে। শরৎচন্দ্রেরই মুখে "এই যে আমার মোটেই ছেলেপুলে হয়নি" কথাটি বসানয় এবং সেটি তমাললতা বসুর হাতের লেখায় প্রকাশ হওয়ায় এঁরা সকলেই বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। এই ঘটনার পরেই কথা উঠল—শরৎচন্দ্রের যে একটি ছেলে হয়েছিল, এটি সাধারণ্যে প্রকাশ হওয়া উচিত। তখনকার মানুষ অনেকেরই ভাবনা হল, সঠিক তথ্য যা টুকরো টুকরো ছড়িয়ে আছে, সেগুলি এখনই মুদ্রিত হয়ে না থাকলে পরে প্রমাণ করা মুশকিল হতে পারে।

'বাতায়ন' সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আর তখন-কার সাহিত্যিকেরা অধ্যাপকেরা অনেকেই এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। আর স্বামীর উপরে ছোট করে সংক্ষিপ্ত জীবনীতে কিছু যথার্থ তথ্য তুলে দেওয়ার ভার পড়ল। হরিদাসবাবু বলেছিলেন—তিনি শরৎচন্দ্রের একটি বিস্তৃত প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশ করতে চান। সে-কাজে যথেষ্ট সময়, উপকরণ সংগ্রহ আর সাবধানতার দরকার। সংক্ষিপ্ত জীবনীখানি তাপসী প্রেসের স্বত্বাধিকারী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য পাঠশালা-প্রকাশনী থেকে প্রকাশের আগ্রহ করেন। এর আগে তিনি অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দিয়ে 'জগদীশচন্দ্র' নামে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। আমার স্বামীর লিখিত 'শরৎচন্দ্র' সংক্ষিপ্ত জীবনীটি তাঁদের দ্বিতীয় বই।

কথাবার্তা আলোচনায় স্থির হয়েছিল, হিরণ্ময়ী দেবী আর নিরুপমা দেবী

সংক্রান্ত তথ্য সে-বইতে প্রকাশ করা চলবেনা। কারণ, তাঁরা তখন জীবিত। ব্রহ্মদেশে শান্তি দেবীর ব্যাপারটি এবং ছেলের কথাটি লেখা হল। লেখা হল আবৃত ভাষায়। কারণ, আনুষ্ঠানিক বিয়ের কথা কোনদিনও শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা যায়নি। সন্তান হওয়ার কথা আর সন্তান সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ও বাৎসল্যমিশ্রিত উৎসুক অনুভূতির কথা তিনি নিজের মুখে বলেছেন।—ঘুমন্ত বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হত ঐ কচি ঠোঁট খুলে ও যখন উচ্চারণ করবে 'বা-ব্বা'—সেটা শুনতে আমার কেমন লাগবে? কল্পনা করেই তো শরীরে তখন যেন কাঁটা দিত—

শরৎদার মুখে এতটাই সিরিয়স করে না শুনলে আমার স্বামী ঐ তথ্যটি বাঁচাতে একটা বই লেখায় হাত দিতেননা। বইটি প্রকাশ হওয়ার পরে অনেকেই এটি 'গাঁজাখুরি গল্প' বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমার স্বামী হাসতেন। বলতেন—এটি খুব স্বাভাবিক। নিজে শরৎদার মুখে সিরিয়স করে না শুনলে, আমিও কখনও বিশ্বাস করতুমনা। দুনিয়ার কোথাও চিহ্ন রাখেননি শরৎদা এই খবরটির। অদ্ভুত মানুষ।

প্রমথ ভট্টাচার্য মশায়ও শরৎদার বর্মায় আনুষ্ঠানিকতাশূন্য বিবাহের পত্নী পুত্রের কথা হরিদাসবাবু, জলধরবাবু ও নরেন্দ্র দেবের কাছে 'ভারতবর্ষ' অফিসে গল্প করেছেন, ও'দের সবার মুখেই শুনেছি।

শান্তি দেবী শরৎচন্দ্রের সন্তানের জননী। তাঁকে উল্লেখ করতে হলে শরৎচন্দ্রের 'স্ত্রী-পুত্র' ভিন্ন কোন অভিধায় উল্লেখ করা যেত ঐ বইতে? কিন্তু শরৎদার মুখে যে একাধিকবারই শোনা গেছে—বর্মায় ঐ পাড়ার বাঙালী সমাজটিতে বেশীর ভাগ লোকই আনুষ্ঠানিকতাশূন্য মিলনে মিলিত হয়ে বিবাহিত দম্পতির মর্যাদায় তাঁদের পরিচিতমণ্ডলের মধ্যে বাস করতেন। শরৎদা ঠাট্টার সুরে একে শৈববিবাহ বলতেন। বলতেন—গান্ধর্ববিবাহ রোম্যাণ্টিক প্রেম-নির্ভর। শৈববিবাহ জীবনের বাস্তব প্রয়োজন-নির্ভর। যাঁরা দেশ থেকে সমাজ অনুমোদিত আনুষ্ঠানিক বিবাহে বিবাহিত হয়ে সেখানে গিয়েছেন, তাঁদের মর্যাদার অহংকার নাকি দারুণ ছিল। ওখানে একটি নিয়ম ছিল, অসবর্ণ নারী-পুরুষে মিলিত জীবন যাপন করলে বিবাহিত দম্পতির পরিপূর্ণ মর্যাদা পেতেননা। শরৎদা বর্মায় স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং তাঁদের স্বামী-স্ত্রী বলেই সকলে মেনে নিয়ে থাকবেন। বিবাহের আনুষ্ঠানিক কোনও ব্যাপারের কথা শরৎচন্দ্রের মুখে কোনও দিন কখনও শুনিনি। হলে তিনি নিশ্চয়ই সে-কাহিনীর উল্লেখ করতেন। কণ্ঠীবদল ফুলের মালা বদল যতটুকুই যাই হোক না কেন, তার উল্লেখ না করে নিঃশব্দ থাকতেননা। ছেলের সূত্রেই তার মায়ের কথা যৎসামান্য

উল্লেখ করেছেন। হঠাৎ ফুলটা গাছ সুদ্ধু উপড়ে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল
—বলেছিলেন। কোনও দিন বলেননি কোনও ধরনের কিছু অনুষ্ঠান সেখানে
হয়েছিল। হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই কিছুমাত্রও বলতেন মনে হয়।

১২

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় সুলেখিকা নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা করে গিয়েছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে লেখিকা নিজের সম্পর্কে প্রত্যেকটি কথাই বহুবচনে উল্লেখ করেছেন। কোনোখানে একবচনে উল্লেখ করেননি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দূরত্বের মধ্যে রেখেছেন। তবুও লেখিকার স্মৃতিচারণার প্রত্যেকটি বক্তব্যের মধ্যে এই হতভাগ্য সৎশিল্পীটির প্রতি তাঁর মনোভাব যে সহানুভূতি-কোমল আর শ্রদ্ধাদৃঢ়, এটি পরিষ্কার সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

নিরুপমা দেবী তাঁর নিজের কালে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে জনপ্রিয় সুলেখিকা রূপে সম্মানিত ছিলেন। পরে তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করে বহরমপুরে থাকতেন। কলকাতায় কদাচিৎ আসতেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ সামান্যই হত। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা প্রকাশ ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স-এ বই প্রকাশের সূত্রে আমার স্বামীকে কখনও সখনও কিছু খবরাখবর দিতে পোস্টকার্ড লিখতেন। বিজয়ার সময়ে ছাড়া আমি কখনও তাঁকে চিঠি লিখিনি।

শরৎদার লোকান্তরের নয়-দশ বছর বাদে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমরা রাজপুতানা ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম সকন্যা স্বামী-স্ত্রী, একটি ভৃত্যসহ। সেবারে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন হরিদাসবাবুর ছেলে সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমরা মথুরায় আগ্রা হোটেলে উঠে সেখান থেকে টঙ্গা নিয়ে বৃন্দাবনে গিয়েছিলুম। নিরুপমা দেবীর বৃন্দাবনের ঠিকানা আমার স্বামীর জানা ছিল। বৃন্দাবনে দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে আমরা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে দেখা করে আসার জন্য তাঁর বাসায় গিয়ে পেঁছিলুম। একটি পাথুরে গলির মধ্যে একখানি দোতলা বাড়ির উপরতলা থেকে নিচে পাথর বাঁধানো আঙিনায় তিনি নেমে এলেন, খবর পেয়ে। তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়। ছেলেদের মত ছোট ছোট করে মাথার চুল ছাঁটা, একখানি কেটের থান পরা আর কেটেরই সেমিজ গায়ে!

নিরাভরণা, শীর্ণ মুখশ্রী।

বালিকা নবনীতা ও শ্রীমান সরোজসহ আমাদের দুজনকে দেখতে পেয়ে চোখে মুখে তাঁর তীব্র বিস্ময় আর আনন্দ দীপ্ত হয়ে উঠল। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে একটা অপ্রত্যাশিত কান্ড করলেন; ব্যাকুল ভাবে দুহাতে জড়িয়ে আমাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। আমরা সকলেই খুব অপ্রতিভ হতভম্ব হয়ে পড়লুম। কল্পনায় ছিলনা তিনি আমাদের দেখে এতটা বিচলিত হবেন। কিন্তু—কেন? কিছুই তখন কারুর আন্দাজে এলনা। অল্প কিছুক্ষণ আমায় বুকে চেপে ধরে দরদর ধারে চোখের জল ফেলার পরে—অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন—তোমরা দুজনে এসেচ? তোমরা আমাকে দেখে যেতে কলকাতা থেকে আমার কাছে এসেচ?...তোমরা আমার কত আদরের জিনিস। তোমরা শরৎদার রাধু-নরেন। তোমাদেরকে শরৎদা কত ভালোবাসতেন!

তাঁর অশ্রুবাষ্পজড়িত কথা ক'টি শোনার পরে তখন আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছুল তাঁর বিচলিত হওয়ার হেতু।

শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের নয় বছর পরে বৃন্দাবনে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ। তখন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুশোক উত্তপ্ত নয়, আগুননেভা ছাইয়ের মৃদু উষ্ণতায় পরিণত, কালের নিয়মে। হতচকিত আমার মনে হয়েছিল—ওঁর কি তাহলে আমাদের আকস্মিক দেখে—বিদ্যুৎ চমকের তীব্রতায় শরৎদার কথাই মনে পড়ে গেল? মনে হল কি, আমরা শরৎদারই লোক, তাঁর কাছ থেকেই আসছি?—সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলদেহে আত্মসংবরণে অক্ষম হয়ে পড়েছেন?

তাঁর দুই চোখে সেদিন ঝরনার ধারা বার্ধক্যশীর্ণ মুখখানি প্লাবিত করে নিঃশব্দে ঝরে পড়েছিল। আমাদের মনে কষ্ট হয়েছিল খুবই, নিজেদের বড়ই অপরাধী বলে অনুভব করেছিলুম।

একটু পরেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন নিজেই। আমরা সেদিন বেশিক্ষণ তাঁর কাছে থাকতে পারিনি। টঙ্গাওয়ালা তাড়া দিচ্ছিল। আত্মসংবরণের পরে লজ্জিত হয়ে আমাদের যত্ন করে বসাবার জন্যে, খাওয়াবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। শরৎদার সম্পর্কে কিন্তু আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করেননি। আমরাও নয়। তাঁর কাছে বসতে আমাদের সেদিন সময় ছিলনা। নিরুপমা তখন বৃন্দাবনে তাঁর অতিবৃদ্ধা মায়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বিদায়ের মুহূর্তে টঙ্গার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বার বার বলতে লাগলেন—কত ভাল যে লাগল রাধু,—তোমরা ঠিক মনে করে গলি খুঁজে বার করে আমাকে দেখতে এসেছ। খুব ভাল লাগল। আমি তো এখন সংসারে মরেই গেছি মনে হয়। কলকাতা থেকে কেউ যে মনে করে আমাকে দেখতে আসতে পারে—ভাবতেই পারিনি।

গাড়িতে বসে হতভম্ব হয়ে সেদিন ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিলুম। কেউ একটিও কথা কইনি। চোখের সামনে ভেসে রইল সমাজ ও সংসারের কাছে উৎসর্গিত একটি বয়োজীর্ণ করুণ নারীমূর্তি। মনে রইল, আমাদের দেখা-মাত্র তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার সেই আকস্মিক উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি। হঠাৎ দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে দুহাত বাড়িয়ে আমাকে তাঁর উপবাস-শীর্ণ বুকে আগ্রহে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলা। কেন? কেন? কী মর্মন্তুদ বেদনায় তিনি নিঃশব্দে সংগোপনে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে চলে গেলেন লোকচক্ষুর আড়ালে সারা জীবন ধরে? আমি সেদিন মুখ দিয়ে একটিও কথা উচ্চারণ করতে পারিনি। বাড়ি ফিরে এসেও নয়। আমার স্বামীও না। আমাদের ভ্রমণসঙ্গী শ্রীমান সরোজও সেদিন যথেষ্ট অবাক হয়েছিলেন কিন্তু কোনও মন্তব্য করেননি।

অনেক দিন কেটে গেলে তারপরে আমরা স্বামী-স্ত্রী নিজেরা দুজনের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সংসারের বাইরে বাণপ্রস্থে বাস করছেন যে-মানুষটি,—সংসারী জীব আমরা, ওখানে গিয়ে হানা না দিলেই ভাল হত। আমাদের গায়ে সংসার-গন্ধ, সে-গন্ধে তপস্বিনী-জীবনে স্মৃতির আলোড়ন উঠলে, যন্ত্রণা আর ক্ষতি ছাড়া ফল কিছুই নেই। ওঁর অন্যমুখী নিভৃত শান্ত জীবনে আমরা যেন ঢিল ছুঁড়ে তরঙ্গ বিক্ষেপ সৃষ্টি করে এলাম। মনে মনে খুবই লজ্জা ও অনুতাপ হয়েছে এর জন্যে।

নিরুপমা দেবীর জীবনচর্যায় কৃচ্ছ্রসাধনা বরাবর ছিল। আহার-বিহারে অত্যন্ত শুদ্ধাচার পালন করে চলতেন। নিজের দৈহিক আরামের প্রতি লক্ষ তো ছিলই না, বরং বরাবর কঠোরতাই পালন করতেন শুনেছি। কথাবার্তা বেশ কোমল ছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। মুখে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির আভা; তার সঙ্গে ছিল নরম বিষণ্ণতা। এইটি আমার নিজের দেখা নিরুপমা দেবী। শুনেছি, তাঁর নাকি প্রবল সাহসিকতা ও প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল পারিবারিক ভূমিকায়। আমার দেখার সুযোগ হয়নি।

শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার প্রতি নিরুপমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে তিনি সম্ভবত ভয় করতেন। বরাবরই নিজেকে ব্যক্তি শরৎচন্দ্র থেকে অনেক দূরে সাবধানে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

নিরুপমা দেবীর সাহিত্যচর্চায় যোগ ছিল তাঁর ছোটদা বিভূতিবাবু ও শরৎচন্দ্র ছাড়াও আর একজনের। তিনি খ্যাতনাম্নী লেখিকা অনুরূপা দেবী। অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী পরস্পরকে 'গঙ্গাজল' বলে সম্বোধন করতেন। অনুরূপা দেবী প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি স্ত্রীজাতির সর্বতোভাবে গৃহসংসারের সেবিকা এবং আত্মোৎসর্গপরায়ণা হওয়া ছাড়া অন্য কোনও দিকে মন দেওয়া অনুচিত এই মতবাদ সমর্থন করতেন।

নারী জাতির ঐকান্তিকভাবে স্বামীর ইচ্ছানুবর্তিনী সেবাপরায়ণা হওয়া অর্থাৎ পাতিব্রত্য-পরায়ণা হওয়া উচিত এই ছিল তাঁর অভিমত। মেয়েদের সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও নমনীয়তা তাঁর আদর্শ ছিল। নিজের মতামত সম্পর্কে তিনি সর্বদা স্থির থাকা পছন্দ করতেন। এ নিয়ে কেউ অন্য মতের প্রশ্ন তুললে সেটি নাড়াচাড়া করতে দিতেননা বেশী। তাঁর পিতামহ মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ হিন্দু নারীর প্রাচীন আদর্শ তাঁর লক্ষ ছিল। তিনি নিজে কিন্তু তৎকালীন আধুনিকতার মধ্যে জীবন যাপন করতেন দেখেছি। মেয়েদের অবগুণ্ঠনের বিরোধিতা তাঁর অপছন্দ ছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা তিনি পছন্দ করতেন কিন্তু অবগুণ্ঠন ফেলে বাইরে পুরুষদের সঙ্গে চলাফেরা অনুচিত মনে করতেন। তাঁর ধারণা ছিল বহির্জগতে মেয়েদের কাজকর্ম করা মঙ্গলকর নয়। অন্তঃপুরই মেয়েদের একমাত্র কর্তব্যস্থান। কিন্তু তিনি নিজে পর্দানসীন কখনও থেকেছেন, কখনও থাকেননি।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে আমি পর্দার বাইরে দৃঢ়ব্যক্তিত্বে স্বপ্রতিষ্ঠ মর্যাদা-ময়ী নারীই দেখেছি। সুস্পষ্ট উচ্চারণে নিজের মতামত উচ্চকণ্ঠে বলার মত শক্তি ছিল তাঁর কলমের। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতুম।

আমার সঙ্গে নারীমুক্তি প্রসঙ্গে দুই একবার তাঁর বাদ-প্রতিবাদ হয়ে গেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। আমরা তখন পঞ্চাশ বছর আগে মেয়েদের পর্দাপ্রথা, অবগুণ্ঠন, পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা এবং মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ও অর্থকরীবিদ্যার আবশ্যিকতা নিয়ে কাগজে পত্রে লড়াই করি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের গরম তাওয়ায় বরফজল ঢেলে দেন। উঠতি বয়স তো তখন, সইব কেন? সজোরে প্রতিবাদ লিখে ফেলি। প্রবীণায় নবীনায় বাগ্‌যুদ্ধ। পাঠকেরা সকৌতুকে আনন্দ উপভোগ করেন। তখন তো এমন কাগজের দুর্ভিক্ষ ছিল-না। মাসিকপত্র সাপ্তাহিক পত্রওয়ালারা লেখা পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন। ছাপার উপযুক্ত লেখা হাতে পেলে খুশি হয়ে যেতেন। এখনকার সম্পাদকের হাত-পা বাঁধা সীমায়িত পরিসরের মধ্যে। এঁরা ভাল লেখা পেয়েও, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছেমত ছাপতে পারেন না, কারণ, মাপা জায়গা। অনেক লেখা বাদ দিতেই হয়। ফলে, দৃশ্য অদৃশ্য অনেক মানুষের রোষ উষ্মার পাত্র হয়ে থাকতে হয় পত্রিকা-সম্পাদকদের।

প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। বয়সের দোষ এটি। অনুরূপা দেবী কড়া রক্ষয়িত্রী ছিলেন স্বভাবগত। বরাবর তিনি তাঁর গঙ্গাজলের সাহিত্যজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের দিকে সতর্ক দৃষ্টির পাহারা রেখেছিলেন। নিরুপমা দেবী সাহিত্য নিয়ে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করার মত কাছাকাছি তাঁর গঙ্গাজলকে পেয়েছিলেন জীবনে। শরৎচন্দ্রের লেখা তাঁকে

করলেও, তাঁর কাছাকাছি এসে আলোচনার উপায় ছিলনা। তিনি নিজেই কঠোর সতর্কতায় বহু দূরেই সরে থাকতেন। শরৎদার মুখে শুনেছি, নিরুপমা চিঠি লিখতেন শরৎচন্দ্রকে। মনের সুখ দুঃখ বা জীবনের ভাল মন্দ ঘটনা হয়তবা লিখতেন। শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করে বলেননি সবকিছু। তবে নিরুপমার চিঠি যে তিনি পেতেন এটি তাঁর কথাবার্তায় অনেক বার প্রকাশ হয়েছে। অনুরূপা দেবী নিরুপমাকে ভালবাসতেন। তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায় সমস্ত অশুভ-থেকে তাঁকে দূরে রাখতে যত্ন নিতেন সন্দেহ নেই। দুই সখীর মধ্যে অকপট হৃদ্যতা ছিল। শরৎচন্দ্রের প্রতি অনুরূপা দেবীর বরাবরই বদ্ধমূল বিরূপ ধারণা ছিল। এটির কারণ, শরৎচন্দ্রের বেপরোয়া বাউণ্ডুলে জীবন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। গৃহহীন আশ্রয়হীন সংসারকর্মবিমুখ যে-ছোকরাটি তাঁদেরই মজঃফরপুরের বাড়ির বৈঠকখানায় একসময়ে মলিন কেশবেশে ভবঘুরে মূর্তিতে আশ্রিত হয়ে কাটিয়েছে, গানবাজনা নেশাটেশা করে,—সেই লোকটির কলমের লেখা যত ভালই হোকনা কেন, আদর্শে দৃঢ়চিত্ত অনুরূপা কোনও দিন সে লেখার দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেও চাননি। নিরুপমার মত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বিধবার সাহিত্য-টাহিত্য কোনও কিছুরই সংস্রবে আসার যে সে যোগ্য ব্যক্তি নয়, এইটিই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ কথা। নিরুপমা দেবী তাঁর সতীর্থ বন্ধুর শুভেচ্ছায় প্রতিবাদ করেননি, বরং তাঁর অভিমত মেনেই চলেছেন যতদূর সম্ভব। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সংস্রব ছিন্ন হয়নি বহুদিন। হৃদয়ের সংস্রব নিরুপমার ছিল কিনা জানিনা,—শরৎচন্দ্রের যে ছিল, এটি নিঃসন্দেহে জেনেছি।

১৩

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগটি বোঝার জন্য আমি প্রথমদিকের চারটি গল্প নিয়ে আলোচনা করব। চারটিরই নায়িকা বালবিধবা। এই আলোচনাতে লক্ষণীয় বিষয় তিনটি। প্রথমত দেখব, কেমন করে শরৎচন্দ্রের জীবন ও হৃদয়ের কেন্দ্রীয় সমস্যাটিই তাঁর সাহিত্যেরও কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত দেখব, কী করে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব উপলব্ধি নায়কদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে এবং নায়িকাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে নিরুপমার অন্তঃপ্রকৃতি প্রতিভাসিত। শরৎচন্দ্র অবশ্য নায়কদের অনেক বেশী আদর্শনায়ক করতে চেয়েছেন; নিজে যা ছিলেননা, নায়করাও তাই হত। কিন্তু নিরুপমার যা ছিলনা লেখক-দত্ত যথেষ্ট বিদ্রোহ-শক্তি সত্ত্বেও নায়িকাদের তা থাকতনা। লেখকের মনের মধ্যে দোষে গুণে নিরুপমার যে-ভাবমূর্তি ছিল, দোষে-গুণে নায়িকারাও তাই হয়েছেন। তঁদের গুণের সীমা ছিলনা, ত্যাগের সীমা ছিলনা। কিন্তু ত্রুটি ছিল মাত্র একটিই। সেই একটিমাত্র ত্রুটির মধ্যেই নিহিত গভীর ট্র্যাজেডির শিকড়।

তৃতীয়ত দেখব, সময়ের সংগে সংগে কেমনভাবে শরৎচন্দ্রের গোড়ার দিকের নায়ক-নায়িকারা মনে মনে বয়সে বেড়ে উঠছেন। নায়কদের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে নায়িকাদেরও চারিত্রিক ক্রমবিকাশ ঘটছে। সেইসংগে জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যাটির বিষয়ে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মানসিকতার, তাঁর ধ্যান-ধারণা, বুদ্ধি, বিশ্বাসেরও ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রথম দিকের চারটি নির্বাচিত রচনা থেকে এই পরিণতির ধারাটি লক্ষ করব। সর্বপ্রথমে দেখব, কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁর সর্বপ্রথম মুদ্রিত গল্প 'মন্দির' (১৯০৩/১৩০৯)।

তারপরে নেব 'ভারতী'তে প্রকাশিত আলোড়ন-তোলা গল্প 'বড়দিদি'। তারপরে 'পল্লীসমাজ'; শেষে নিয়েছি 'পথনির্দেশ'।

নামকরণগুলির মধ্যেই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাথমিক চেহারাটা ধরা পড়ে অনেকখানি।

সমস্যাটি প্রথমে নৈর্ব্যক্তিক : 'মন্দির'। তারপরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'বড়দিদি'। তারপরে সমাজ-নিবদ্ধদৃষ্টি 'পল্লীসমাজ', সমস্যার মুখোমুখি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। শেষটিতে সমস্যার সমাধান—'পথনির্দেশ'। নামকরণগুলিই যথেষ্ট নির্দেশ দেয় লেখকের মনের গতিপথের।

'মন্দির' গল্পে আমরা দেখেছি, কীভাবে অজ্ঞ, অন্ধ-হৃদয়বোধহীন, আচার-মুগ্ধ কিশোরী অপর্ণা তার অজাগ্রত হৃদয় নিয়ে নিজে ঠকছে, অন্যদেরও কষ্টের কারণ হচ্ছে। অমরনাথ এবং শক্তিনাথের মৃত্যুকে আধুনিক পাঠকেরা অতিরিক্ত সেণ্টিমেণ্টাল বলবেন। বলবেন, কাঁচা, অবাস্তব। সবই ঠিক কথা। কিন্তু, ঐ মৃত্যু দুটি না-ও যদি ঘটত, তবু অমরনাথের জীবন্মৃত্যুর কারণ হত অপর্ণা।

শক্তিনাথের হাত থেকে দেলখোস ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরে যদি শক্তিনাথ বেঁচেও থাকত, সে হত অন্য আরেক শক্তিনাথ।

ঐ মুহূর্তটিতেই প্রথম শক্তিনাথের মৃত্যু ঘটিয়েছে অপর্ণার অবোধ অন্ধতা। কিন্তু, এই গল্পে শুধু মৃত্যু নয়, একটি জন্মও আছে। অমরনাথের মৃত্যুতে যা হয়নি, শক্তিনাথের মৃত্যুতে তা ঘটল। গল্পের শেষ পংক্তিতে কুড়িয়ে আনা দেলখোস হাতে নিয়ে জন্ম হল যুবতী অপর্ণার। শক্তিনাথের মৃত্যুর আঘাত অপর্ণার সুপ্ত হৃদয়কে জাগ্রত করল।

এই অবুঝ অপর্ণা-চরিত্র ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়েছে 'বড়দিদি'র মাধবী চরিত্রে। যে, নিজের মনের সবটা বোঝে না, অথচ আবছা উপলব্ধি করে। অপর্ণার ঘুমন্তযৌবন, তার অজাগ্রত হৃদয়ানুভূতি মাধবীতে জাগ্রত। সুরেন্দ্রের সারল্যে মাধবী বিব্রত। মাধবীর মনের মধ্যে আপন দুর্বলতা বিষয়ে সচেতনতা আছে বলেই, সুরেন্দ্রের নিষ্কলুষ অনাবৃত হৃদয় মাধবীকে ভীত করে, সন্ত্রস্ত করে। মাধবীর মুখেই সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আমরা প্রথম শুনি সেই দণ্ডাদেশ—যে-দণ্ড মাথায় নিয়ে মাধবীর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যেতে সুরেন্দ্রের পাঁজর চূর্ণ হল গাড়ি চাপা পড়ে। এখানে গাড়ির তলায় চাপা না পড়লেও সুরেন্দ্রের পাঁজর আস্ত ছিলনা। ঘটনাটি অর্থহীন নয়, ব্যঞ্জনাময়।

সুরেন্দ্র চলে যাবার পরে মনোরমার সখী-সুলভ কৌতুকে মাধবী কেঁদে ফেলে। মনোরমা বলে, 'সামান্য কৌতুক সইতে পারলে না বোন?' মাধবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, 'আমি যে বিধবা দিদি।' মনোরমা বলিল, 'কিন্তু গেল কেন?'—'আমিই যেতে বলেছিলাম।'

মাধবীকে শরৎচন্দ্র পিতৃগৃহে সমগ্র পরিবারের প্রয়োজনের ভিত্তিতে মর্যাদায়, সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। সুশৃঙ্খল গৃহকর্ত্রীত্বে তার সকলের

প্রতি সমান যত্ন, সমান দৃষ্টি। মর্যাদাময়ী নারীত্বে আর আত্মসুখভোগের ইচ্ছারহিত দেবীত্বে তাকে গড়ে তোলা হয়েছে। এই দেবীত্বময়ী মাধবীরই হৃদয়ে মানুষী প্রেমের বিকাশ শরৎচন্দ্র এমনই কুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন—প্রায় সত্তর বছর আগের বাঙালী পাঠকদের মনে সে-ছবি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, বরং করুণ বেদনা আর সহানুভূতি উদ্রেক করেছে। নিন্দায় মুখর হতে কুণ্ঠিত হয়েছে তখনকার সংস্কারবদ্ধ মনও। কারণ, মাধবী সংসারধর্মে ত্রুটিশূন্য, মাধবী সংযতপ্রকৃতি। লেখকের শক্তির মান কতদূর, এখানে প্রথমেই প্রমাণ হয়েছে।

এত নিখুঁত নিরঙ্কুশ চরিত্রের মাধবী,—তবুও তার সখী মনোরমা স্বামীকে চিঠি লেখে—'মাধবী পোড়ারমুখী, জীবনে যাহা করিতে নাই, তাই সে করিয়াছে।' উত্তরে শরৎচন্দ্র যেন নিজেরই কথা বলছেন—'পত্র পাইয়া মনোরমার স্বামী মনে মনে হাসিল। মাধবী পোড়ারমুখী, তাহাতে সন্দেহ নাই...তোমাদের রাগ হইবারই কথা। বিধবা হইয়া কেন সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে।' তারপর তিনি একটি লতার কথা লেখেন—'আধক্রোশ ধরিয়া লতাইয়া লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জরী।' ('বড়দিদি' পৃ ৩৯-৪২)

এখানে শরৎচন্দ্র নিজের মনকে ব্যক্ত করেছেন। অফলা, অপুষ্পা যৌবন-বৈধব্যে তাঁর হৃদয়ে সমর্থন ছিলনা কোনও দিন। এ-রিক্ততা মূল্যহীন। বিশ্ব-প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীর প্রত্যক্ষ দেখা হওয়াটিও কতই সন্তর্পণে।—'সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া সে মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই। কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা। ক্রোড়ের উপরে সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড়দিদি?

—আমি মাধবী।

সুরেন্দ্র চক্ষু মুদিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—আঃ তাই।

এখানে ভাষা সম্পূর্ণ প্রতীকী। গভীরতম। অস্পষ্টচেতন সুরেন্দ্র কোনও দিন নিজের হৃদয়ের ভাষা সুস্পষ্ট বোঝেনি। আমি এই অংশটুকুর প্রত্যেকটি পদের অর্থ যেভাবে বুঝেছি, বলার চেষ্টা করি।

'সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রের জ্ঞান হইল'—এখানে 'সন্ধ্যার পরে' কথাটি এবং 'জ্ঞান হইল' কথাটি আমার কাছে গভীরতম অর্থে তাৎপর্যময়। 'চক্ষু মেলিয়া সে মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল'—'চক্ষু মেলিয়া কথাটিও আমার কাছে গভীর দ্যোতনাপূর্ণ। 'মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, কপালের কিয়দংশ ঢাকা'—'মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই' কথাটি অত্যন্ত অর্থবহ। মাধবীর

হৃদয় ও মনের অবগুণ্ঠন মোচনের প্রকাশ্য ইঙ্গিত এটি। 'ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া বসিয়াছিল' এই পদটিও মাধবীর অন্তর্জগতের অবস্থা প্রকাশ করছে। সুরেন্দ্রনাথকে নিজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতির অভিব্যক্তি বলা যায়। 'কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড়দিদি?'

—'আমি মাধবী।'

এখানে 'তুমি বড়দিদি?' আর 'আমি মাধবী' প্রশ্নোত্তরটির মধ্যে চিরকালের মানব-মানবীর হৃদয়ের ভাষা যেন ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রশ্ন আর এই উত্তরের মধ্যে অন্ধ হৃদয়ের ভাষা অক্ষরের রেখায় প্রকাশিত হয়েছে। হৃদয়ের গভীর অনুভব আজও অক্ষরে যৎসামান্যই প্রকাশ হয়। সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ যে ভাষাতীত অনুভবের পীড়ন বহন করে চলেছে—এখানে শরৎচন্দ্র সেই 'না-বলা বাণীর ঘনযামিনী'র থেকে একটি বাণী আলোয় তুলতে পেরেছেন।

অতি উচ্চস্তরের চিত্রশিল্পী মাত্র দু'চারটি রেখার টানে যেমন অনেকখানি কিছু,—অনেক সুন্দর কিছু বা ভয়ংকর কিছুকে ফুটিয়ে তোলেন,—সাধারণ সহজ দু'একটি বাক্য ব্যবহারের মধ্যে দুই এক পংক্তিতে সেই ধরনের অভিব্যক্তি শরৎচন্দ্রের লেখায় দেখতে পাই।

এর পরের লাইনটি আরও অতলস্পর্শী। 'সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদিয়া মৃদু-স্বরে বলিল,—আঃ, তাই।'

এখানে ভাষা একেবারেই অতল অন্তরঙ্গস্পর্শী। যে-উপলব্ধি মুখের ভাষায় আনা সম্ভব নয়, সেই উপলব্ধিকে ভাষায় ফোটাতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র।

এখানে 'চক্ষু মুদিয়া' আর 'মৃদুস্বরে' এরাই প্রধান ভাষা,—'আঃ, তাই' বাক্যটি ব্যঞ্জনা-নিবিড়।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীর মুখোমুখি বোঝাপড়া হয়নি। অপরিণতচিত্ত অপর্ণা আর শক্তিনাথের মতই সুরেন্দ্রনাথও মাধবীর প্রতি নিজের মনের গভীর অনুরাগের প্রকৃতি চিনতে পারেনি। 'বড়দিদি' নামটিকেই সে গহন হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গোপন কস্তুরী করে তুলেছিল। তারই নিবিড় সৌরভে সারা-জীবন বিভোর থেকেছে। 'বড়দিদি' নামটি বড়ত্বে এবং দিদিত্বে পূর্ণ থেকে গেছে চিরকাল। অদৃশ্য গৃহদেবতার পুণ্য নামের সঙ্গে যাকে তুলনা করেছেন লেখক। সে-পুণ্যনাম মানুষ হয়ে সুরেন্দ্রের চাওয়া পাওয়ার জীবনে নেমে আসেনি। যদিও, বড়দিদির একদা-দেওয়া আঘাত থেকেই রক্তক্ষরণ হয়ে বড়দিদিরই কোলে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

মাধবীর শেষ পর্যন্ত নিজের হৃদয়কে চিনতে পারাটি লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরম উপভোগ মনে করি। এখানে তাঁর হৃদয়ের নিজস্ব সার্থকতার পরিতৃপ্তি।

শরৎচন্দ্রের সংকেত-কুশলতা 'বড়দিদি' বই থেকেই সার্থক হয়ে শুরু।

আমার মনে হয় 'বড়দিদি' বইখানি পড়ার পরেই সম্ভবত লেখকের কাছে নিরুপমার অনুরোধ এসে থাকতে পারে 'বালবিধবা চরিত্র আপনি না আঁকলে ভাল হয়'।

শরৎচন্দ্র আমার কাছে চিঠিতে 'গারজেন' বলে নিরুপমা দেবীকেই উল্লেখ করেছিলেন। এই 'গারজেন' শব্দটি কৌতুকচ্ছলে লিখলে৷ এটি সত্যের ভিত্তিতেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রকৃতিসুলভ নিয়মে গভীর বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হালকা কৌতুকের সুরে যেমন প্রকাশ করতেন, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি আপনা থেকেই একজনকে নিজের 'গারজেন'-এর পদে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। এটি বহির্লোকের ব্যাপার নয়, অন্তর্লোকের ব্যাপার। বাইরে এর কোথাও কোনও প্রকাশ দেখা যায়নি; সুতরাং, বাইরে খোঁজাখুঁজি বৃথা।

বন্ধনহীনবিদ্রোহী বেপরোয়া যে-মানুষটি উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিলেন কৈশোরকাল থেকে, সেই মানুষটিই স্থির ধৈর্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন একটিমাত্র মানুষের সংযম-সুন্দর স্মরণের সামনে রেখে। সত্যিই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কড়া তাগাদাদার তিনি ছিলেন। এই কড়া তাগাদা মুখে বা লেখায় যতখানি না হোক,—তাঁর হৃদয়ের উৎসুক প্রত্যাশাই ছিল শরৎচন্দ্রের কাছে সবচেয়ে বেশি কড়া তাগাদা। কঠোর সমালোচকও তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন, কারণ শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকখানি বই প্রকাশ হলেই পড়ার পরে তাঁর সম্বন্ধে নিজের মতামত খোলা মনে লিখে পাঠাতেন লেখকের কাছে। লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির এইটিই ছিল নিরুপমার প্রধান পুরস্কার। শরৎচন্দ্রের লেখার উৎকৃষ্ট সমঝদার তাঁর চেয়ে আর কেউ ছিল, শরৎচন্দ্র মনে করতেননা। তাঁর সাহিত্যরস গ্রহণশক্তির প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা ছিল অসীম।

হতে পারে এটি শরৎচন্দ্রের নিজেরই মনের দুর্বলতা, কিন্তু তাঁর ধারণার নড়চড় দেখিনি।

শরৎচন্দ্রের প্রকৃতিতেই ছিল দেওয়ার জন্যে উন্মুখতা। পাওয়ার জন্যে তত নয়। তিনি নিরুপমাকে কিছু দেওয়ার জন্যে, তাঁর কিছু করার জন্যে চিরদিন ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু নিরুপমার নেওয়ার উপায় ছিলনা। নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল কিনা জানিনা। শরৎচন্দ্রের কোনও দান কোনও উপহার তিনি গ্রহণ করেননি, একমাত্র সাহিত্য সম্পর্কে পরামর্শ ও উপদেশ ছাড়া। তিনি নিজে মুখ ফুটে শরৎচন্দ্রের কাছে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যরচনা। শরৎচন্দ্রের লেখার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের অবধি ছিলনা—এটি শরৎচন্দ্রের উপলব্ধিগোচর ছিল।

সকলেই জানেন, শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকতে নিরুপমার রচনা পড়ে এতই

খুশি হয়েছিলেন, একটি সোনার ফাউণ্টেন পেন তিনি নিরুপমাকে পাঠিয়েছিলেন।—দেখতে পাছে খারাপ ঠেকে কারও চোখে, তাই তার সঙ্গে বিভূতিভূষণ ভট্টকেও একটি কলম একসঙ্গেই পাঠিয়েছিলেন। ছোট পার্সেলটি এসেছিল বিভূতিভূষণেরই নামে, কিন্তু সে-কলম শরৎচন্দ্রকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর হৃদয়েরই নিদর্শন যে সোনার কলম,—এটি বুঝে সেটি গ্রহণ করা হয়নি। ঘটনাটি আমার বইয়ে পড়া তথ্য হলেও শরৎচন্দ্রের মুখেও শুনেছিলুম,—সোনার কলম কোনও মানুষকে দেওয়া হয়নি, কলমকেই দেওয়া,—এটা ওরা বুঝতে পারেনি।

১৪

'মন্দির' গল্পে যে-প্রেম দুপক্ষের কাছেই অস্ফুট, অস্পষ্ট, 'বড়দিদি'তে সেই প্রেম একপক্ষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয়, সে-হৃদয়টি কিন্তু নারীর হৃদয়। মাধবী নিজেই সুরেন্দ্রকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, নিজেকে রক্ষা করার জন্য, নিজে দুর্বলতা থেকে বাঁচবার জন্য। অসামাজিক সুরেন্দ্রের শিশুসুলভ প্রকাশ্য ভালবাসা, সামাজিক নীতি ও আচারবন্ধ মাধবীর মানসিক নিরাপত্তার প্রতিকূল ছিল।

ধর্মোন্মাদ আধা-সন্ন্যাসিনী অপর্ণা যেমন পারিবারিক মমতাবন্ধ মাধবীতে উত্তীর্ণা—মাতৃহীন, সামাজিক দায়িত্ববোধশূন্য, সরল কিশোর শক্তিনাথও সুরেন্দ্রনাথে পৌঁছয়। এখন আছে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, আছে পৈতৃক সম্পত্তি, মাতামহের জমিদারী। তেমনি আছে তার হৃদয়ভরা শূন্যতা, মাতৃস্নেহের প্রবল বুভুক্ষা। নেই তার যুবোচিত আত্মনির্ভরতা। সুরেন্দ্রের যা-যা নেই, মাধবীর তা স্বভাবগত মূলধন। প্রভূত স্নেহ আর প্রবল আত্ম-নির্ভরতায় মাধবী পূর্ণযুবতী। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মুখোমুখি তাকে দাঁড় করাননি লেখক। তাদের পরস্পরের কাছে মন খোলার সুযোগ দেননি। সুরেন্দ্র-নাথ যুবক হয়ে মাধবীর কাছে এসে দাঁড়ায়নি—দাঁড়িয়েছে স্নেহার্থী অঞ্চল-ছায়াকাঙ্ক্ষী শিশু হয়ে। অথচ, মাধবীর তাকে আশ্রয় দেবার শক্তি নেই, সাহস নেই; সমাজের কঠিন শিকলে বন্দী সে। সমস্ত হৃদয় ছুটে যেতে চায় যার দিকে, তাকেই দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে হল মাধবীকে।

বালবিধবার মনের এই নিরুপায় যন্ত্রণা, নিরুচ্চার আর্তি অদৃশ্য নিঃশব্দ ভিতরে বাজছে আছড়ে-পড়া ঝরনার জলকল্লোলের মত উন্মাদ কান্নার ধ্বনি। এই নিরুপায়তা থেকে পালান ছাড়া গতি নেই। মাধবী, অথবা সুরেন্দ্রের মৃত্যু প্রয়োজনীয় ছিল সত্যকে ধামাচাপা দেবার জন্য। তৎকালীন সমাজের সামনে এই ভয়ংকর প্রশ্নটি খোলাখুলি উপস্থাপনা করার মত মনের জোর তখনও হয়নি শরৎচন্দ্রের। মজা কিন্তু, প্রাণ ধরে তিনি তাঁর সর্ব-

গুণান্বিতা, জীবনবঞ্চিতা, বালবিধবা নায়িকাদের মৃত্যু ঘটাতে পারেননি। যদিও তখনকার সাহিত্যে সেটাই ছিল সহজ সমাধান। মরতে হয়েছে কুন্দনন্দিনীকে, রোহিণীকে। কিন্তু শরৎদা মেরে ফেলেছেন তাঁর নায়কদের। যে-নায়করা জীবন-সমস্যা সমাধানে অক্ষম—তাদের বাঁচতেও দেননি লেখক। শক্তিনাথকে না, সুরেন্দ্রনাথকেও নয়।

'পল্লীসমাজে' ঘটল সেই বিস্ফোরণ। সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ালেন শরৎচন্দ্র রমা ও রমেশকে নিয়ে। রমা এবং রমেশ উভয়েই পরিণত, পূর্ণবয়স্ক, দায়িত্বশীল সামাজিক মানুষ। আদর্শবাদী উচ্চশিক্ষিত রমেশে এখনও আছে সারল্য। সহজ বিশ্বাস আছে, আছে পবিত্রতা, কিন্তু সে নিজের হৃদয়ানুভূতির গতিপ্রকৃতি চেনে। নিজের চাওয়া-পাওয়া বিষয়ে তার মনে কোনও অস্পষ্টতা নেই। সুরেন্দ্রনাথে যা হতে পারেনি, রমেশে তা হয়েছে। রমেশ আত্মনির্ভর, বলিষ্ঠ পূর্ণযুবক। শিশু নয়, সে পুরুষমানুষ। রমাও জানে নিজের মনের গতি-প্রকৃতি। সে জানে সবই, বোঝে সবই, কিন্তু মানতে পারে না সত্যকে। সমাজ-দেশাচার, সমকালীন নিয়ম কানুনের দ্বারা রমার মনের বিচারবুদ্ধিতে হাতকড়া আঁটা। রমা সুনাম দুর্নামের ভাবনায় আত্মহারা, স্বার্থপর। সে-স্বার্থপরতা নিজের পারিবারিক মর্যাদা ও ছোট নাবালক ভাইটির মুখ চেয়ে। যা নিজেকে এবং রমেশকেও শেষ করে দেয়। কড়া কর্তব্যবোধ আর সামাজিক কল্যাণবুদ্ধিকে হাতিয়ার করে নিজেরই সঙ্গে নিজের লড়াই তার। রমেশের মুখে শুনি—'সেদিন আমার কেন জানিনে অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল, তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর,—কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না।... ভেবেছিলাম, কোনও কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছাওয়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব।'—পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, এ কয়টি কথা কার বাস্তবজীবন থেকে উদ্ধৃত? আমি তো দেখি, লেখক নিজের জীবনের আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা আর যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত কথাগুলি তাঁর নায়কের মুখে বসিয়ে দিয়ে আরাম চেয়েছেন। সেইজন্যই হয়ত কথা ক'টি এত বেশি প্রাণবন্ত। রমার মুখে শুনি—'আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি।' তারপরেই শরৎচন্দ্র লিখছেন—"রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল—না, তুমি যাও—আমি মিনতি করচি রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট কোরো না, তুমি যাও।—যাও এদেশ থেকে—' কিন্তু এ কার মুখের নির্মম কথা তিনি তাঁর বইয়ের নায়িকার মুখে তুলে দিয়ে অক্ষয় করে গেছেন!

রমা ও রমেশের ভালবাসা, সমকালীন অনড় কানুন মেনে বিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। শেষ পর্যন্ত রমা, রমেশেরই হাতে তাব ছোট ভাইটিকে মানুষ করার ভার দিয়ে জ্যাঠাইমার সঙ্গে কাশী যাত্রা করে। রমেশকে মেরে না ফেলে,

এবার রমাকেই নির্বাসনে পাঠান শরৎচন্দ্র। এখানে কিন্তু একটি বিনিময় লক্ষণীয়। রমেশের জীবনে রমার জীবনের কর্তব্য ন্যস্ত রইল। রমেশের ভবিষ্যৎ শূন্য নয়, তারই হাতের মুঠিতে ধরা আছে রমার বাৎসল্যকেন্দ্র, যতীন,— রমার পিতৃবংশের ভবিষ্যৎ। রমাও একা নয়, তার সঙ্গে চলেছেন রমেশদার পিতৃবংশের মূর্ত অতীত,—রমেশের জ্যাঠাইমা। জীবনে প্রত্যক্ষ মিলিত না হলেও তারা পরস্পরে বিশ্বাসের বিনিময়ে একে অন্যের কর্তব্য-দায়িত্ব বিনিময় করে নিয়েছে। এই বিনিময়ের তাৎপর্যে পাঠকের সচেতন থাকা উচিত। বইয়ের উপসংহারটি যথেষ্ট তাৎপর্যময়।

শেষ পর্যন্ত 'পল্লীসমাজ'কেও ছাড়িয়ে ওঠেন শরৎচন্দ্র। দেন 'পথনির্দেশ'। এই নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পথের নির্দেশ।

'হেম' একটু আলাদা ধরনের মেয়ে, সে ঘরসংসারের চেয়ে বই পড়তেই বেশী ভালবাসে। তার বাল্যবিবাহ হয়নি, সে শিক্ষিতা, এটি লক্ষণীয়। রমা এখানে হেম হয়ে উঠেছে; যে-রমার মধ্যে পুরুষমানুষের যোগ্য জমিদারী পরিচালনার বুদ্ধি আর ক্ষমতা ছিল,—ছিলনা বাইরের বই-পড়া বিদ্যা। হেমের বুদ্ধি ও বিদ্যা দুই-ই আছে। আর আছে সাহস। যা রমার একটুও ছিলনা। সে নিজেই উপস্থিত করেছে গুণীন্দ্রের কাছে নিজের হৃদয়। হেম বিদ্রোহিণী। বিবাহে সে ঘোরতর অনীহা জানায়, গুণীন্দ্রের কাছেই বরাবর থাকতে চায়। ব্রাহ্ম গুণীন্দ্রের এঁটো থালাতে ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও জোর করে ভাত খেতে বসে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়না।

হেমের বিঘ্ন হেমের মধ্যে নয়—বাইরে সুলোচনার মধ্যে। মা সুলোচনাই সমাজবদ্ধ জীব,—এখানে তিনিই হেম-গুণীন্দ্রের মিলনে বাধা। হেম যেমন মুক্তমনা, পঠনপ্রিয়, আত্মনির্ভর নবীনা নারী,—গতানুগতিক হিন্দুমনের মেয়ে নয়, গুণীন্দ্রও তেমনি মুক্তমনা, উচ্চশিক্ষিত, হিন্দু সমাজের গণ্ডী 'উত্তীর্ণ' ব্রাহ্ম পুরুষ। তার নিজের কোনও দিক থেকেই কোনও বাধা নেই। তার নিজের কোনও দিকে বাধা না-থাকাটাই তার মহৎ বাধা। সে কিছুতেই নিজের ইচ্ছাকে তার আশ্রিত দুটি দুর্বল মানুষের উপর চাপাতে পারেনি। গুণীন্দ্রের চরিত্র উঁচু, সৎ। এখানেও বিয়ে হলনা। লেখকের যে তাহলে একজনের কাছে শপথভঙ্গ হয়ে যায়। শরৎচন্দ্রের সামনে বুঝি ভেসে ওঠে সেই দূর-বর্তিনীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার অদৃশ্য তর্জনী। যে-তর্জনী তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সন্ন্যাসী আর ভবঘুরেদের দলে, সাগরপাড়ি দিইয়েছে সাহিত্যচর্চা ছাড়িয়ে। সুরেন্দ্র পড়েছে গাড়িচাপা আর রমা পালিয়েছে কাশীতে,—সেই তর্জনীরই কি নিঃশব্দ অস্তিত্বে শরৎচন্দ্র হেমের সুস্পষ্ট করে বিধবাবিয়ে দিতে পারেননা ব্রাহ্ম গুণীন্দ্রের সঙ্গে? যদিও তাদের মিলনেই বইয়ের পরি-সমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখক।

'পথনির্দেশে' কিন্তু নায়ক বা নায়িকার মৃত্যু ঘটে না, মৃত্যু ঘটেছে তাদের বাধা সুলোচনার। যে-সুলোচনা হিন্দু সমাজেরই অন্ধ সংস্কারের নির্মম প্রতীক। শরৎচন্দ্র এবারে মৃত্যু ঘটালেন সেই সামাজিক বিঘ্নের। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সুলোচনা স্বীকার করে যাচ্ছেন তাঁর ভ্রান্তি, তাঁর ত্রুটি—'আমার অপরাধ যে কত বড় গুণী, সে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।...লোকে সৎমার গল্প করে, আমি সৎমার চেয়েও তার শত্রু।' হেমকে বুকে নিয়ে সুলোচনা বলেন—'আজ আমি কাঁদতাম না হেম, যদি না তোকে এমন করে নষ্ট করতাম। আমি লজ্জায়, দুঃখে, তোর মুখের পানে চাইতেই পারচি না মা।...আমার হাত ছিল, সে হাত আমি নিজের হাতেই কেটেচি। তুই বলচিস মন্দ কপাল, কিন্তু তোর মত ভাল কপাল এ রাজ্যে একটি মেয়েরও ছিল না—যদি-না আমি মাঝে পড়ে সমস্ত নষ্ট করে দিতাম। অন্যান্য পাপের উপায় আছে, কিন্তু জেনেশুনে পাপ করার কোথায় মোচন পাব মা?'

এখানে এর প্রত্যেকটি বাচ্যার্থের মূলে আছে প্রচলিত কালে অতীত-নির্দিষ্ট প্রাচীন নিয়মের অচলতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ। সুলোচনাকে দিয়ে সেই অচল নিয়মের পাপ স্বীকারোক্তি।

এর পরে সুলোচনা স্পষ্ট করেই গুণীর বিষয়ে কন্যাকে পথনির্দেশ দেন—'কোনো দিন তার অবাধ্য হোসনে মা, কোনো দিন তাকে দুঃখ দিসনে।...তার যা ধর্ম, তোর ধর্মও তাই। এ আমার আদেশ নয় হেম, এ তাঁর আদেশ। যাঁর আদেশে তোরা এক দিনের দেখাতেই চিরকালের মত এক হয়ে গিয়েছিলি।...যিনি অন্তর্যামী, যিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে বসে কথা কন, তাঁকে অস্বীকার কোর না। তাঁকে অমান্য কোর না।...কিন্তু তোদের ওপরে আমার এই শেষ অনুরোধ রইল মা, আমার অন্যায়, আমার পাপকে চিরকাল স্বীকার করে আমার দুষ্কৃতিকে তোরা অক্ষয় করে রাখিসনে।'

প্রাচীন হিন্দু সমাজের নিয়মনিষ্ঠার অনিবার্য বিলুপ্তির মুখে শরৎচন্দ্র সুলোচনার মুখ দিয়ে শেষ স্বীকারোক্তি করিয়েছেন। এর পরে সোজাসুজি খোলাখুলি হিন্দু বালবিধবা হেমের মুখে ভালবাসার কথা বসান লেখক। যদিও তা হিন্দু সতীত্বের আদর্শের মাপে মাপে। হেমের প্রণয়ের ভাষায় যে-সততা, যে-পবিত্রতা, তাতে বিধবাবিবাহের বিষয়ে হিন্দু কুসংস্কারকে যথেষ্ট কুশলতার সঙ্গে এড়ান হয়েছে, মালিন্য কিছুই নেই।

হেমই বলেছে—'গুণিদা, বিধবার বিয়ে হওয়া কি ভাল? গুণী চোখ বুজিয়াই বলিল, তুমি কি বল?'

গুণীন্দ্রের পরম কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি যখন এল,—গুণীন্দ্র নিজেই তখন প্রস্তুত নয়।

গুণী বলিল—'যারা সতী-লক্ষ্মী তারা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে।

বিধবা হলে তার মুখ মনে করে আর বিয়ে করে না। তোমার মার মত মরণকালে তাঁরা স্বামীর কাছে যাচ্ছি মনে করেন।'

হেম বলিল—'আমাকে তোমরা জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়েছিলে। আমি সতীলক্ষ্মী, তাই মরণকালে তোমার কাছে যাচ্ছি এই কথাই মনে করব। আচ্ছা গুণীদা, মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব?'

'তাহার কথার মধ্যে জড়তা নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জার লেশমাত্র নাই। এ যেন কাহার কথা কে বলিয়া যাইতেছে।...গুণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল।'

এইখানে শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্য অতি সূক্ষ্ম ও গভীর। তিনি দুটি চরিত্রেরই মৌলিক চেহারা সুস্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন ঐ কয়েকটি লঘু কৌতুকের পাতলা আবরণে ঢাকা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে।

হেমের মন নির্ভীক, সে সমাজকে গ্রাহ্য করেনা। তার কাছে নিজের হৃদয় মন আর আশা আকাঙ্ক্ষা একটুও অস্পষ্ট নয়।

গুণীন্দ্র স্বভাবত মহৎহৃদয়, তার উপরে উচ্চশিক্ষিত। সে নিজের এবং হেমের কার কোনখানে অবস্থিতি, তা জানে। সে সচ্ছল ধনী, সুশিক্ষিত বিদ্বান এবং অসহায়া হেমের আশ্রয়দাতা। হেম কপর্দকশূন্য, উচ্চশিক্ষিতা নয়, হেম গুণীরই আশ্রিত মানুষ। জ্ঞানের কোটীতে হেম গুণীন্দ্রের সমতুল নয়। এই ব্যবধান অভিমানী হেমকে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনোখানে আঘাত দিতে পারে এ-সম্পর্কে গুণীন্দ্রের সচেতন সতর্কতা সর্বদা ছিল। তাই, তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা নিজের হৃদয় এবং নিজের মতামত হেমের কাছে মুক্ত-কণ্ঠে বলা। হেমের পক্ষে যা সম্ভব ছিল তার আশ্রয়হীন আত্মীয় বন্ধুহীন জীবনের জন্য,—আশ্রয়দাতা হওয়ায় গুণীন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব ছিলনা।

কথাসূত্রে হেমের তোলা পরম মুহূর্তটি পার করে দিয়েই কিন্তু গুণীন্দ্রের মনস্থির হয়ে গেল। পরদিন সকালে গুণী যখন কথাটা পাড়ল,—হেম সংক্ষেপে বলিল ছিঃ, ও কি আবার একটা বিয়ে?

শরৎচন্দ্র একবার ওড়না তুলে হেমের মনের ভিতরের নির্মুক্ত সৌন্দর্যটি দেখিয়ে আবার তা চাপা দিয়ে দিলেন।

গুণীরই উপরে অভিমান করে গুণীকে প্রত্যাখ্যানের পর হেম নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কাশীবাসী হল; দীক্ষা নিল; শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে গেল। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেলনা। শেষ পর্যন্ত গুণীন্দ্রের রোগের সংবাদে হেম ফিরে এল। তারপরে হেম ও গুণীন্দ্রের শেষবার মুখোমুখি হওয়া। শরৎদা তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে মুখোমুখি। হেমকে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে গুণীন্দ্রনাথ স্থিরকণ্ঠে বলেন—'চলো হেম, আমরা কাশী চলে যাই'। হেম ও গুণীন্দ্রের এই কাশীযাত্রা কিন্তু রমার কাশীযাত্রা নয়। কাশী তখন ছিল হিন্দুসমাজের সমাজবহির্ভূত এমন একটি পবিত্র স্থান,—সমাজে যাদের

নিয়ে গণ্ডগোল হত, তারা কাশীতে যেত আশ্রয় নিতে। বানপ্রস্থীরা শুধু নয়, বিধবারা, কলঙ্কিনীরা, কুলত্যাগিনীরা যত সমাজ-চৌহদ্দির বাইরে কাশীতে। গুণীন্দ্র-হেমের কাশীযাত্রা সংসার ত্যাগ বা বানপ্রস্থ নয়, এ যাওয়া মিলনের যাত্রা। সমাজের নিগড়ের বাইরে নতুন জীবনের পানে যাত্রা। তাই—'হেম মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, চল, কিন্তু এই তোমার শেষ আদেশ। এ কি আমি সহ্য করতে পারব?' গল্পে এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন শরৎচন্দ্র।

সব দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, মান অভিমান বিচ্ছেদের শেষে এই প্রাপ্তি—একে চোখের জলের আনন্দে গ্রহণ করে হেম। মিলন বলেই একে সহ্য করতে পারা নিয়ে ভয়।

প্রকৃত গল্পটি এইখানেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এর পরেই আবার লেখকের সামনে উত্থিত হয় অদৃশ্য তর্জনী। পাঠক সমালোচকের চোখে ধুলো দিতে হবে—একজনের মনে শান্তি দিতে হবে। তাই শিল্প যাক ধুলোয় গড়াগড়ি—বই শেষ হয়েছে এক প্রক্ষিপ্ত স্তবকে। আগাগোড়া বাস্তবভিত্তিক বাস্তবধর্মী লেখার সমাপ্তিতে নিচে জুড়ে দিলেন কাঁচি-কাটা কাগজের তালি। নিখাদ আদর্শময় একটি গুরুগম্ভীর বক্তৃতা। যা উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসের বিপরীত।

গল্প যেভাবে শুরু আর যেভাবে তার আকৃতি গড়ে ওঠে,—তাতে গল্পের ওখানেই শেষ অতি সুস্পষ্ট। সুলোচনার শেষ ইচ্ছা পালনের মধ্যে, গুণী-হেমের মিলনের মধ্যেই 'পথনির্দেশ' দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। অথচ, মূল ভাবের বিরোধী, বিষয়বস্তু ও কাহিনীর সঙ্গে সংযোগশূন্য, অতিনাটকীয় এক সুদীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে গুণীন্দ্র এখানে সেই অদৃশ্য অনুশাসন পালন করেছে। শিল্পের প্রতি—আর নিজের প্রতি কিছুমাত্রও মায়ামমতা থাকলে এমন অদ্ভুতভাবে নিজের লেখা কেউ নিজহাতে ধ্বংস করতে পারে না—শরৎদা যা করেছেন।

নিরুপমা দেবী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যখন জানিনা, আমি তখন একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—বেশ রাগ করে,—'আপনি আমাকে বিয়ের জন্যে এত উপদেশ দিচ্ছেন, অথচ আপনার রমাকে হেমকে আপনি কাশী পাঠান কেন? বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে কেন মেরে ফেললেন বলে আপনি রাগারাগি করেন—অথচ নিজে তো একটিও বিধবা বিবাহ দেননি কোনও বইতে, কোনও গল্পে।'

শরৎদা খুব বিচলিত হয়ে বলেছিলেন—রমাকে কাশীতে আমি পাঠাইনি রাধু, পাঠাও তোমরাই। এই তোমরাই।

আমার দিকে আঙুল নির্দেশ করে তাঁর সেই ক্ষোভ আর নিরুপায় দুঃখ-ভরা মুখভাবের অর্থ সেদিন আমার কাছে একটুও স্পষ্ট হয়নি। আশ্চর্য

হয়েছি তাঁর অদ্ভুত উত্তর শুনে। তখন আমি তাঁর জীবনের অদৃশ্য ট্র্যাজেডির কথা কিছুই জানতুম না। অনেক পরে আমার কাছে তাঁর সেদিনের সেই সংক্ষিপ্ত অসংলগ্ন কথার জটিলতার অর্থ স্পষ্ট হয়েছিল। 'তোমরা' বলে সেই তর্জনী কার উদ্দেশে তুলেছিলেন, বুঝতে পেরেছি।

সাহিত্যের চেয়ে জীবন তাঁর কাছে বেশি জরুরী ছিল। তাই তিনি শিল্পের দাবী অনায়াসে অস্বীকার করেছেন, কোনও একসময়ে ব্যক্তিগত আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে। ফলে, নিজেকে ভবিষ্যৎকালের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও রক্ষণশীল এবং সমাজ মুখাপেক্ষী সংস্কারান্ধ বলে প্রমাণ করে গেছেন, নিজের প্রতি দৃক্‌পাত না করে।

একটি মাত্র মানুষের মান রাখতে এবং মন রাখতে, শিল্পের সহজ দাবী, জীবনবিশ্বাসের দাবী অস্বীকার করতে তাঁর বাধেনি। গল্পের শেষরক্ষায় তখন শরৎদা মন দেননি, মন ছিল নিরুপমার মুখ রক্ষায়। তাঁর কাছে নিজের শপথ রক্ষায়।

তাঁর কথাবার্তা থেকে আমি যা বুঝেছি, তাতে এই ধারণাই আমার দৃঢ়মূল হয়েছে।

নিরুপমা দেবীর যবনিকা-অন্তরালবর্তী অস্তিত্ব শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকর্মের পক্ষে প্রেরণাদায়ী ছিল। তাঁর লেখা পড়ে নিরুপমা দেবীর বিস্মিত উল্লাস এবং তাঁর আরও লেখা পড়ার জন্য সাগ্রহ অপেক্ষা—শরৎচন্দ্রকে লেখায় উদ্দীপিত অনুপ্রাণিত করে তুলত। তাঁর উৎসাহে, শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে, অনুপ্রাণিত শরৎচন্দ্র নিজেকে নিজের কাছে অনেক সুন্দর আর বড় করে অনুভব করতেন। নিরুপমার উৎসুক আগ্রহ মনে রেখে শরৎচন্দ্র তখন লিখে যেতেন। সে-লেখায় শিল্প-লক্ষ্যের পাশাপাশি থাকত বিপুল আনন্দানুভূতির সঙ্গে—'নিরুপমা পড়বেন' এই লক্ষ্যটিও।

শরৎচন্দ্রের মাঝে মাঝে স্বগত-কথন থেকে জেনেছি, তিনি জানতেন নিরুপমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে তাঁকে তাঁর শিল্পশক্তি। তাঁর সাহিত্য পড়ে নিরুপমার বিস্ময় হয়ে ওঠে দীপ্ত, আনন্দ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। কঠোর পর্দার আড়ালে থেকে পরস্পরের শিল্প বিনিময় ও শিল্প পরিচিতি, হৃদয়ানুভবে পৌঁছেছিল। শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন তাঁর রচনা নিরুপমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে। তিনি নিজে যে তাঁর থেকে বহু যোজন দূরের, এটিও তাঁর জানা। সাহিত্যই ছিল ওঁদের দুজনের মনের সংযোগসূত্র।

শরৎচন্দ্র বলেছেন—তিনি চিঠিও লিখতে পেতেন না তাঁকে। তাঁরই নিষেধ ছিল। মাঝে মাঝে তুচ্ছ প্রয়োজনীয় কথা বা অপ্রয়োজনীয় কথা চিরকুটে লিখে পাঠিয়েছেন। তাও যেত তাঁর দাদা বিভূতি ভট্টকে লেখা চিঠির সঙ্গে। সরাসরি

নিরুপমাকে নয়।

একবার একখানি সরাসরি চিঠি কলকাতা থেকে নিরুপমারই নামে পাঠানর ফলে—নিরুপমা কলকাতায় শরৎচন্দ্রকে লিখলেন—আপনি আমার সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ রাখবেননা। এখানে কখনও আসবেননা, অনেক দূরে চলে যান। আমায় নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন।

শরৎচন্দ্রের প্রতিটি বালবিধবা নায়িকার মুখে নিরুপমার 'দূরে চলে যান' কথাটি শরৎচন্দ্র অক্ষয় করে রেখে দিয়ে গিয়েছেন।

তিনি শুধু দেশ ছেড়েই চলে গেলেননা, সাহিত্য ছেড়েও চলে গেলেন। সমুদ্র-পরপারে বর্মায় গিয়ে তিনি কলম ছেড়ে ছবি আঁকা, গান-বাজনা আর গভীর পড়াশুনোয় ডুবে রইলেন।

আমার মনে আছে, একবার তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—আপনি বর্মায় সাহিত্য রচনা ছেড়ে ছবি আঁকায় মাতলেন কেন?

উত্তরে বলেছিলেন—দেশের সঙ্গে সাহিত্য আমার একাত্ম। দেশত্যাগীই যখন হতে হল, সাহিত্যত্যাগীই বা হব না কেন? তবে—বারদুনিয়ার সাহিত্য পড়াশুনো ছিল বৈকি। বেশী নয়, অল্পস্বল্প। বেশী ছিল, দর্শন আব বিজ্ঞান। তাছাড়া ছবিটবি আঁকতুম, গানবাজনাও ছিল কিছুটা।

আর একবার সাহিত্য আলোচনা করতে করতে বলেছিলেন—সাহিত্যেব জন্যেই আমাকে দেশত্যাগী হতে হয়েছিল, পেটের জন্যে নয়। একটাই পেট তো মাত্র।

তারপরে তাঁর সেই রহস্যময় অস্পষ্ট ভাষায় অন্যমনস্ক উদাসস্বরে স্বগতোক্তি করেছেন—সাহিত্যের জন্যে দেশত্যাগী হয়েছি, নিরুদ্দেশ হয়েছি—আমি ছাড়া এ-খবর আর কেউ জানেনা। সাহিত্য আমাকে কম দুঃখ দেয়নি।

পরে দূরমনস্কতা থেকে ফিরে এসে শেষে সহজ গলায় বলেছেন—হ্যাঁ, জীবনে সবকিছু দুঃখের দামও শেষকালে সাহিত্য থেকেই পেয়ে গেলুম। পাওনার বেশীই পেয়েছি হয়তবা।

আমার মনে হয়েছে, শরৎচন্দ্র তাঁর বইগুলির মধ্য দিয়ে কোনও কোনও জায়গায় নিরুপমার সঙ্গে কথা কইতে চেয়েছেন। নিজের কথা বলা, নিজের বিষয়ে ভাবা তাঁর প্রকৃতি ছিল না। তিনি হয়ত তাঁর লেখায় নিরুপমারই হৃদয়কে বার বার খুলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন নায়িকার মাধ্যমে। 'শ্রীকান্তে' সুস্পষ্ট ভাবেই অনেক জায়গায় এটি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় পর্বে তো বটেই।

নিরুপমা দেবী নিজে সাহিত্যশিল্পী ছিলেন। বোহেমিয়ান শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তাটিকে ভাল করে দেখতে পেয়েছিলেন মনে হয়। তাঁর গভীর রাতে বাঁশী বাজানো, গান গাওয়া, অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়ান—কিছুই তাঁর

কাছে অসমঞ্জস ঠেকেনি, সাংসারিক অন্য মানুষদের যেমন অনুচিত ঠেকত। অন্যেরা সকলেই সে-সময়ে এই বখাটে ছেলেটিকে অপছন্দের, উপেক্ষার ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন। কেউ কেউ হয়তবা করুণার দৃষ্টিতে। শরৎচন্দ্র সশ্রদ্ধ অভিনন্দন দৃষ্টি বোধহয় জীবনে সর্বপ্রথম পেয়েছেন এই অন্তরাল-বর্তিনীর কাছ থেকে,—যিনি ছিলেন তাঁরই মত সাহিত্যপ্রেমী, সাহিত্যসাধনারত। অন্তরের যোগ ঘটেছিল এইখানেই, দেহ ছিল ও'দের বাধা।

নিরুপমা দেবীর রচনাশক্তিকে শরৎচন্দ্র বেশ অভিভূত দৃষ্টিতে বিচার করতেন দেখেছি। তাঁর মুখে একাধিকবার শুনেছি, সমকালীন উপন্যাস লেখক লেখিকাদের মধ্যে নিরুপমার লেখাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। নিরুপমা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন, তাঁর সমস্ত কিছুই তিনি প্রশংসনীয় মনে করতেন। নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের রচনার গভীর অনুরাগী ছিলেন সন্দেহ নেই—কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি কখনও কোনোখানে দুর্বলতা প্রকাশ করেননি. বরং সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দূরত্বই প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনি অতিশয় সাবধানী ছিলেন। বাইরের মানুষদের তো বটেই,—নিজেকেও হয়ত বেশী বিশ্বাস করতেননা,—তাই অসম্পৃক্ত ঔদাসীন্যে অনেকটা তফাতেই থেকেছেন।

শরৎচন্দ্রের লেখায় নর-নারীর হৃদয়সমস্যায় নারীরই হৃদয়-বিশ্লেষণ বেশী দেখা যায়। তাঁর মুখে অনেকেই শুনে থাকবেন—মেয়েরা পুরুষের হৃদয় একনিমেষেই চিনে নিতে পারে, এটি বিধাতার দেওয়া শক্তি ওদের। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, ওরা নিজের হৃদয় নিজে চিনতে পারে না। যেমন মানুষ নিজের মুখ নিজে দেখতে পায়না।

একটি কথা আমার মাঝে মাঝে মনে হয়। বলতে এটি অমানবিক শোনালেও. বলেই ফেলি। শিল্পের পক্ষে অনেক সময়ে নিয়তির নিষ্ঠুরতাই আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়. নিরুপমা দেবী যদি শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতায় উদিত হয়ে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করার অল্প কিছুকাল পরে অস্ত যেতেন, তাহলে শরৎচন্দ্রের শিল্পী-আত্মা মুক্ত থাকত। কোনও দায়. কোনও ভার সেখানে ছুঁয়ে থাকত-না।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পজীবনে কাদম্বরী দেবীর মত, নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের শিল্পযাত্রার প্রথম দিকেই যদি অন্তর্হিতা হতেন, তাহলে শরৎ-সাহিত্য প্রবাহিত হত ভিন্ন খাতে, ভিন্ন ধারায়, স্বচ্ছন্দ মুক্তির মধ্য দিয়ে। কারণ, শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তায় গৃহবন্ধন. সমাজবন্ধন তখন একেবারেই ছিলনা। অন্তরালবাসিনী নিরুপমার জীবিত অস্তিত্ব শরৎচন্দ্রকে যেমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিল. তেমনই তাঁর শক্তির পূর্ণ বিকাশে করেছিল বাধা সৃষ্টি। লোকনিন্দা. সমাজভীতিতে অনেক বড় শিল্পীই, এদেশে অন্তত, তাঁদের লেখনীর মোড় ঘুরিয়েছেন লক্ষ করা যায়। শরৎচন্দ্রের লেখার যিনি ছিলেন প্রেরণা, তিনিই

ছিলেন বাধা। যে-সব সীমাবদ্ধ মানসিকতার দায়ে আজ তাঁকে অভিযুক্ত করি আমরা, শিল্পী শরৎচন্দ্রের সে-মানসিকতা ছিলনা। এখানে ব্যক্তিসত্তাকে শিল্পী-সত্তা বলে সমালোচকেরা ভুল করলে, তাঁদের কিছু বলার নেই।

ভাবলে অবাক লাগে, এমন উত্তাল প্রাণশক্তিপূর্ণ এক শিল্পী তাঁর লেখনীকে চিরদিন সংবৃত করে রাখলেন একটি নারীর অভিমতের সম্মানে। ছটফটে, বেপরোয়া, নেশাখোর মানুষটি মেতে রইলেন এক আশ্চর্য কোমল গোপন উপলব্ধির নেশায়,—একটি গণ্ডীবদ্ধ মনের কাছে নতচক্ষু আত্ম-সমর্পিত হয়ে ফাঁসি দিয়ে রাখলেন নিজের শিল্পীসত্তার।

জানিনা, বিশ্বের শিল্প-ইতিহাসে শিল্পের শুরুর পর্বেই এই আত্মত্যাগের বা আত্মহত্যার নজির মিলবে কিনা।

তাঁর শেষ জীবনের লেখাগুলি লেখনীর পূর্ণমুক্তির মধ্যে লেখা। যার ফলে 'সবিতা'র মত চরিত্রও সেই কঠিন আবদ্ধ যুগে শরৎচন্দ্র সমাজের সামনে সরাসরি নিয়ে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তখন তাঁর ভুবনে তাঁর লেখা পড়বার লোক কেউ ছিলনা। এটাই হয়ত লেখনীর যদৃচ্ছা বিচরণের হেতু হতে পারে।

১৫

সেই দুঃখী মানুষটির সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল, তাঁকে সংসারে বেশীর ভাগ মানুষই ভুল বুঝেছে বা উল্টো বুঝেছে। তিনি বলতেন—আঙুলে-গোনা কয়েকজন মাত্র মানুষ তাঁকে সঠিক দেখতে পেয়েছে বা বুঝতে পেরেছে। এটি তাঁর অভিমানী মনের বদ্ধমূল ধারণা ছিল।

এই আঙুলে-গোনা কয়েকজনের সামনের সারিতে যে নিরুপমা দেবী ও অনিলা দেবী ছিলেন এটি আমার ব্যক্তিগত স্থির ধারণা। শরৎচন্দ্রের নিজের ধারণায়, তাঁর সঠিক বিচারক আর কে ছিলেন জানা নেই।

আমার কাছে শরৎদা মাঝে মাঝে নিজের মনের দুঃখ কখনও কখনও প্রকাশ করেছেন বলে—কেউ যেন ভুল করে অনুমান না করেন, শরৎচন্দ্র কথিত এই 'আঙুলে-গোনা' কয়েকজনের অন্যতম একজন আমি। আমি জানি তা নয়। সত্য বলতে কী, তখন আমি তাঁর মুখের বাচ্যার্থ-অতিক্রান্ত ভিন্নার্থস্পর্শী ভাষাও বুঝতে পারতুমনা সবটা। তাঁর কথার মানে খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তুম। মনে হত, অনেক কথাই তাঁর ঝাপসা, অস্পষ্ট রয়ে গেল।

অথচ সেই সময়কার সেই গ্রাম্যভাবাপন্ন, চঞ্চল প্রকৃতি, লঘুভাষী, অসংযত-বাক্ শরৎচন্দ্রকেই জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের তেতালার বৈঠকখানায় দেখেছি একেবারে অন্য একজন মানুষ।

একদিন বেলা চারটে আন্দাজ সময়ে আমরা কয়েকজন গুরুদেবের কাছে রয়েছি—অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যমশায় এসে গুরুদেবের কাছে মৃদুস্বরে কী-যেন নিবেদন করলেন। গুরুদেব বললেন—হ্যাঁ, এখানে নিয়ে এস। চারুবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে গুরুদেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা সকলে একটু অন্য ঘরে গিয়ে বস। আমি খবর পাঠালে এস। আমরা উঠে পাশের ঘরে গেলুম।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যমশায় শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পেঁৗছে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, গুরুদেব বললেন—তুমিও বস না হে। তারপর শরৎচন্দ্রের দিকে

তাকিয়ে হেসে বললেন—চারু থাকলে আমাদের কথাবার্তার অসুবিধে হবে-না—কী বল তুমি? শরৎদা শান্তভাবে মাথা হেলিয়ে হাসিমুখে ইঙ্গিতে জানালেন—অসুবিধে হবেনা। তারপরে তিনি চারুবাবুর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতেই নিজের পাশে ফরাসের ওপরে বসতে অনুরোধ করলেন। চারুবাবু এগিয়ে এসে শরৎচন্দ্রের কাছে বসলেন।

সেদিন দূর থেকে দেখলুম গুরুদেবের কাছে বসে আছেন একটি শান্ত, বিনীত, সলজ্জ নম্র মানুষ। শরীরে কোথাও তাঁর এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, চাউনিতে নেই অস্থিরতা, অনর্গল কথা তো মুখে নেই-ই—বরং একেবারে নির্বাক। মুখভাব কোমল, সলজ্জ, দৃষ্টি অবনম্র, একটু যেন বিষণ্ণ। প্রগলভতা কোনো-থানে দেখলুমনা।

গুরুদেবই সারাক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন। মাঝে মাঝে গুরুদেবের প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিংবা সংক্ষিপ্ত কথায় উত্তর দিচ্ছিলেন শরৎচন্দ্র। প্রায় পনের কুড়ি মিনিট পরে শরৎচন্দ্র ও চারুবাবু উঠে বেরিয়ে গেলে আমরা আবার সে-ঘরে এসে ঢুকতেই গুরুদেব কৃত্রিম কোপে বলে উঠেছিলেন—এ কী খবর না পাঠাতেই তোমরা ঘরে এসে ঢুকলে যে বড়? আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ায় অন্য মেয়েরা সকলে জোরে হেসে উঠলেন—গুরুদেব তাঁদের দিকে তাকিয়ে চাপা-হাসি—উজ্জ্বল মুখে বললেন—আমি তোমাদের বিরুদ্ধে ট্রেসপাসের চার্জ আনতে পারি, তা জান?

তাঁরা আরও বেশী হেসে বলেছিলেন—আনুনগে, ভয় করিনা।

পরে এই নিয়ে শরৎচন্দ্রকে বলেছি—সুন্দর ব্যবহার, মার্জিত আচরণ সবই আপনার জানা। অথচ পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে এমন অজ্ঞ অনভিজ্ঞ মানুষের মতন নিজেকে খেলো করেন যে কেন, কিছুতেই ভেবে পাইনা।

শরৎদা হেসে জবাব দিয়েছেন—ওটা তোমাদের গেঁয়ো দাদার কৃতিত্ব বলে ভুল কর না তোমরা। কৃতিত্বটা গুরুদেবেরই। তাঁর পারসন্যালিটিকে শুধু বিরাট বললেই বলা হয়না, দৈবীও বলতে পার। এমন কোনও মানুষ নেই—মানুষ কেন, বনের বাঁদরও তাঁর সামনে গিয়ে বসলে ভদ্র আর মার্জিত হয়ে যাবে আপনিই। এটা পারসন্যালিটির স্পেশ্যাল ম্যাগনেট বলতে পার।

শিবপুরে থাকতে শরৎদা যেমন ধরনের ছিলেন, বালিগঞ্জে যখন বাস করেছেন তখন অনেকটাই বদলেছেন ধরনধারণে। তবে, ভিতরের মানুষটি বরাবর একই ছিল।

তাঁর প্রথম জীবনে এবং যৌবনকালে আমি তাঁকে দেখিনি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৃথিবী

থেকে বিদায় নিয়েছেন। মাত্র ষোল বছর তাঁর সঙ্গে জানাশোনা। তার মধ্যে শেষের দিকে আট নয় বৎসর বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় নিকট আত্মীয়ের মত ছিলেন। এ-ঘনিষ্ঠতাও বাইরে যে খুব মেশামেশি বা আচরণনির্ভর ছিল তা নয়। ছিল মনের দিক দিয়ে, স্নেহের দিক দিয়ে। বালিগঞ্জে আমাদের নতুন বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় উনি প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়ি আসতেন শেষ জীবনে।

আমি শরৎদাকে তাঁর পরিণত বয়সেই দেখেছি। তখন তাঁকে যে-রকম দেখেছি, তার সঙ্গে যৌবনকালের বর্ণনা যা পড়েছি বা শুনেছি একটুও মিল ছিলনা। তাঁকে গান গাইতে আমি শুনিনি। ছবি আঁকতেও দেখিনি। তবে গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। মডার্ন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট পছন্দ করতেননা। বলতেন—বিধাতা যা আমাদের চৈতন্যের কাছে স্পষ্ট করে ধরেননি, অস্পষ্টতায় রেখেছেন, তাকে স্পষ্টতায় ধরবার চেষ্টা করা প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। এতে বিকৃতি সৃষ্টি হয়। লিভার, পিলে, স্টম্যাক, কিডনি, ব্লাড আর্টারি, ভেইনস, আমাদের শরীরে আছে—কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্যে আছে। তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে সামনে টেনে এনে সর্বসমক্ষে সর্বদা সাজিয়ে রাখা দরকার আছে কি? অস্তিত্বটা জানার মধ্যে থাকলেই হল, দৃশ্যমান করার প্রয়োজন শুধু শারীরবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যার ঘরে, অন্যত্র নয়।

আমাদের দেশে আর-কোনও সাহিত্যিক একটি বিশেষ দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের ধরনের সাহিত্যসাফল্য লাভ করতে পারেননি, এটি লক্ষ করার বিষয়। এইদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথও এ-ধরনের সফলতা অর্জন করেননি। সম্পূর্ণ নিঃস্ব একটি নতুন লেখককে মাত্র দুই একটি লেখা ছাপা হতে-না-হতেই প্রকাশকদের উৎসুক টানাটানি আর সম্পাদকদের বিপুল ব্যগ্রতার মধ্যে এমনভাবে পড়তে আর কাউকে তো দেখতে পাইনা। প্রথম লেখা ছাপার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে এত খুশির ঢেউ, আর বিস্ময়ের বিদ্যুৎও দেখা যায়নি।

অগ্রিম মোটা টাকার (সেকালের হিসেবে বেশ মোটাই) কনট্রাক্টে সই করে পুস্তক-প্রকাশক কর্তৃক দূর বিদেশ থেকে লেখককে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনার এ-সম্মান ইয়োরোপে সম্ভব হলেও এদেশে সে-যুগে একেবারেই অভাবিত ছিল নিঃসন্দেহ। তবুও তা সেদিন সম্ভবপর হয়েছিল। যা আজও পর্যন্ত আর হয়নি।

মধুসূদন বিদেশে মরণাপন্ন হয়েও দেশ থেকে কোনও প্রকাশকের সাহায্য পাননি; অবশ্য তখন প্রকাশক সংস্থা তেমন গড়েও ওঠেনি। তবে, বিদ্যাসাগরের মত গুণগ্রাহী এবং মহাপ্রাণ মানুষ সে-যুগে ছিলেন এ-যুগে যা নিশ্চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথের মত মহামহীরূহ, বিদেশে নোবেল প্রাইজ পাওয়া লেখককে নিজের দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বার্ধক্য-দুর্বল দেহে পাঁচজনের সামনে

দাঁড়াতে হয়েছে।

শরৎচন্দ্রই বোধহয় আমাদের দেশে প্রথম লেখক, যিনি তাঁর কলমের নিব থেকেই কলকাতা শহরে অট্টালিকা, পল্লীগ্রামে সুন্দর সুদৃশ্য আবাস, ফুলের বাগান, শস্যের জমি করেছেন। মোটরগাড়ী, ড্রাইভার, রাঁধুনী, দাস, দাসী ছাড়াও গৃহে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে প্রতিপাল্য যথেষ্ট সংখ্যায় রেখেছেন। অথচ এই মানুষটি সম্পূর্ণই স্বাধীন লেখক ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি নিজের জন্য, সচেতন মনে, বাণিজ্যিক পণ্য করে তোলেননি। কোনও সম্পাদক বা প্রকাশকের সাধ্য ছিলনা, তাঁদের ইচ্ছা বা সুবিধা অনুযায়ী তাঁকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেবার বা লেখার অদলবদল করিয়ে নেবার। সাধ্য ছিলনা তাঁকে দিয়ে আরও আধ ফর্মা বাড়িয়ে নিতে কিংবা ছাপার সুবিধের জন্যে আধ পাতা কমিয়ে নিতে। ধারাবাহিক লেখার ব্যাপারে সম্পাদকের অবস্থা তিনি বিপন্ন করুণ করে তুলতেন। বই ছাপার প্রয়োজনে প্রকাশকের জরুরী প্রয়োজনও তিনি মানতেননা। মৌলিক নাটক তো লিখলেনই না--পাছে তা স্টেজওয়ালারা অদলবদল করতে বলে তাঁকে দিয়ে তাদের হুকুম তামিল করায়।

সেই অদ্ভুত খেয়ালী, জেদী মানুষটিকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার সাধ্য কারও ছিলনা। প্রকাশক আর সম্পাদক সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর মন জুগিয়ে চলতেন। 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক লেখা অসমাপ্ত পড়ে আছে—অথচ 'বিচিত্রা'য় 'বসুমতী'তে নতুন উপন্যাস ধরেছেন। অভিযোগ করলে জবাব দেন—আমার কলম 'কল' নয়। কলের মতন দম দিলেই তরতর করে চলতে পারে না। যখন যেটা কলমে আসে—সেটা লিখি—যেটা আসতে চায়না—জোর করে লিখিনে। লিখতে পারিনে। একটি অলিখিত নিয়ম ছিল তাঁর,—তাঁরই মর্জির উপর নির্ভর করে চলতে হবে সম্পাদককে আর প্রকাশককে;—না যদি পোষায়, কারবার তুলে দিতে পারেন,—তাতে আপত্তি নেই।

ফণীন্দ্রনাথ পালের সংগে শরৎচন্দ্রের কারবার বন্ধ হওয়ার কারণ, শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছি—তাঁর উপরে ফণীবাবুর অভিযোগের চাপ সৃষ্টি। তিনি নিজের উপরে অন্যের চাপ সহ্য করতে পারতেননা। অথচ চরিত্রের একটি জায়গায় তাঁর দুর্বলতার অবধি ছিলনা। সেটি হচ্ছে মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা। যেখানেই তিনি একটু অকপট স্নেহের স্পর্শ পেয়েছেন তার প্রয়োজনে সেখানেই তিনি সব কিছু দিতে, সব কিছু অসীম সহিষ্ণুতায় সহ্য করতে প্রস্তুত। সেখানে কোনও অহংকার নেই, কোনও চাহিদা নেই কোন হিসেবেরও প্রশ্ন নেই। এত নরম, এত বিনীত, এত অহংশূন্য মানুষ তখন তিনি—যেন দিতে পেরেই, সহ্য করেই তিনি মহাধন্য। তাঁকে সরল ভালবাসা দিয়ে কিনে নিয়েছিল দেশের অশিক্ষিত মানুষেরা। বঞ্চিত উৎপীড়িতদের প্রতি তাঁর দুর্বলতার সীমা ছিলনা। পতিতাদের জন্য, বাল-

বিধবাদের জন্য তাঁর লেখনী যে সরব হয়েছে—এটির কারণ, এদের কোনওখানে কেউ সহায় ছিলনা সেদিন। সমাজ এদেরকে সুখী সার্থক মানুষদের প্রয়োজনে আর সেবায় নিয়োজিত রেখেছিল। তাদের সহজ স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার দিকে, সুস্থ জীবন যাপনের দিকে দৃক্‌পাত করেনি। সমাজের একপাশে এই অবহেলিত নিপীড়িত মানুষগুলির নিরুপায় অবস্থা শরৎচন্দ্রের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। তিনি তাদের জন্য স্বতঃপ্রেরণায় কলম ধরা হলেন।

দেশের পরাধীনতা দেশের মানুষকে যে মনুষ্যেতর জীবে পরিণত করেছে - এদেশের মানুষ একান্ত আত্মনিবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে জৈবিক নিয়মে কেবলমাত্র বেঁচে থাকতে পেলেই সন্তুষ্ট—এটিতে তাঁর মর্মান্তিক ক্ষোভের যন্ত্রণা ছিল। মনুষ্যত্বহীন বিকৃতবুদ্ধি মানুষে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ, এই অনুভব তাঁকে অধীর অস্থির করে তুলত। 'পথের দাবী'তে তাঁর এই মানসিক যন্ত্রণার ছবি অক্ষয় হয়ে ফুটে আছে।—'রাজত্ব করবার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি, তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিসনে।' মনুষ্যচেতনাসম্পন্ন একটি মৃত্যুমুখী মানুষের মুখে এই ক'টি কথা বসিয়ে তারই ফলস্বরূপ এঁকেছেন সব্যসাচী চরিত্র। সব্যসাচী চরিত্রে বৈপ্লবিকগুণ কতখানি, তাঁর একাগ্র বিপ্লবসাধনা কোন্ মানদণ্ডের এই নিয়েই হয়ত আমরা বেশী লক্ষ করি; কিন্তু শরৎচন্দ্র বিপ্লবী সব্যসাচীকে প্রধানত মানবিক গুণের ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছেন। মূলত তিনি মহৎ, মানবিক, তার পরে একনিষ্ঠ বিপ্লবী।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার অমানবিক সর্বগ্রাসী ও লোভের মূর্তি শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফুটিয়েছেন পাশাপাশি সামান্য কয়েকটি উদাহরণে। অনেক বেশী কথায় নয়, বইতে লেখকের নিজের বক্তৃতা নেই, সামান্য সামান্য দু'চারটি উত্তর প্রত্যুত্তরে কথায়-বার্তায় নিজের দেশের মানুষের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, সূক্ষ্ম অথচ গভীর খোদাই রেখায় আর কোনও বইয়ে সেদিন আমাদের দেশে এমন করে লেখা হয়নি।

অতি সাধারণ সাদামাটা কথায় সহজ গলায় শরৎচন্দ্রের নায়ক বলেন-- 'হা আমার পোড়া কপাল। দেশ মানে কি বুঝে রেখেচ খানিকটা মস্ত বড় মাটি, নদনদী আর পাহাড়? একটিমাত্র অপূর্বকে নিয়েই জীবনে ধিক্কার জন্মে গেল, বৈরাগী হতে চাও—আর সেখানে কেবল শত সহস্র অপূর্বই নয়, তার দাদারাও বিচরণ করেন। আরে,—পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হলো কৃতঘ্নতা। যাদের সেবা করবে, তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রি করে দিতে চাইবে! মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মত বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই,

স্নেহ নেই, সহানুভূতিই নেই—কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না—।'

সব্যসাচী নির্ভেজাল ষোল আনার বিপ্লবী। কিন্তু তিনি মানবিকতায় উজ্জ্বল। বিপ্লববাদিতায় সুস্থ মানবিক দৃষ্টি তিনি হারাননি। তাই ভারতীর হৃদয়ের সহজ অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতার প্রতি তাঁর স্নেহ ও মমতা প্রচুর। ভারতীর এই মানবিক গুণকে সব্যসাচী সুদৃঢ় স্বীকৃতির সম্মান দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি, কঠোর বিপ্লবী হয়েও।

মানুষের বহির্জীবনের চাহিদা আর অন্তর্জীবনের চাহিদা, দুটি দিকেই সমান নিরপেক্ষতায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে গূঢ়ার্থব্যঞ্জক রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে।

যৎসামান্য পরিধির মধ্যে ভারতী আর সুমিত্রা, অপূর্ব আর তলওয়ারকর চরিত্রে তিনি অনেক কিছুই বলে গিয়েছেন ও খুলে দেখার ইশারা করেছেন;—যা সুস্পষ্ট ব্যাখায় বুঝিয়ে বলতেন যদি, কয়েক খণ্ড বই হয়ে যেত।

'দেশ' বলতে তিনি বুঝেছিলেন, 'মানুষ', 'ধর্ম' বলতে বুঝেছিলেন 'মানুষ', 'সমাজ' বলতে বুঝেছিলেন 'মানুষ'। তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সন্ধান করে—স্পর্শ করে, লক্ষ করে, কেন্দ্র করে। তাঁর বাস্তব জীবনেও মানুষই ছিল মূল লক্ষ্য—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি একান্ত বিশ্বাস করি।

দুর্বল অপূর্বর অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা অনেকেরই চোখে স্পষ্ট হয়না। এমনকি ভারতীরও না। অথচ দেখতে পাই, নির্মম বিপ্লবী সব্যসাচীর সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে অপূর্বর দুর্বলতার মূল কারণ কোথায় তা অস্পষ্ট নয়।

অপূর্ব খারাপ লোক নয়। সে আত্মসুখী আত্মসর্বস্ব কোনও দিন ছিল-না। সেও আত্ম-উৎসর্গিত একটি মানুষ। যেখানে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে—সেখানে সে নির্ভীক, দুঃখসহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়চেতা। সে নিজের উৎসর্গ-কেন্দ্রে একনিষ্ঠ, একাগ্র,—তাই বিশ্বসংসারে অন্য অনেক কিছুরই খোঁজ রাখে-না। তারই ফলে, বাইরের অপরিচিত দুনিয়ায় সে অকেজো, দুর্বল, ভীরু। অপূর্বর মত একটি অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, সব্যসাচীর মত মানুষের কাছে যে অশ্রদ্ধেয় হয়না—এই পরমাশ্চর্য ঘটনাটি লক্ষণীয় বিষয়। শুধুমাত্র ভারতীর প্রেমাস্পদ বলেই সব্যসাচী তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন মনে করলে ভুল হবে। অপূর্ব সব্যসাচীরই মতন আত্ম-উৎসর্গিত মানব। সুমিত্রার প্রেম যে-কারণে ব্যর্থ, ভারতীর প্রেমও সেই একই কারণে লাঞ্ছিত, এটি সব্যসাচীর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঝাপসা থাকেনি। স্থান কাল পাত্রের প্রকারভেদে অপূর্বর জীবনে প্রশংসনীয় গুণটি অশ্রদ্ধেয় দোষে পরিণত হয়েছে। জাতির পরাধীনতাকে আর লাঞ্ছনাকে কেন্দ্র করে সব্যসাচীর সত্তা

কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে নিজেকে বিরাট বিস্তৃত করেছে আর জন্মদাত্রী মাতার নিরুপায় দুঃখ লাঞ্ছনাকে কেন্দ্র করে অপূর্বর সত্তা কেন্দ্রাভিগ শক্তিতে নিজেকে সংকুচিত করে গুটিয়ে ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে। মূলত দুজনেই কিন্তু উৎসর্গিত মানুষ। স্থান কাল পাত্রের প্রকারভেদে মঙ্গলই অমঙ্গল হয়ে ওঠে।

নতুন কাল আর পুরনো কালের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। নতুন কালের প্রয়োজনের সঙ্গে আগের কালের সুগঠিত সুদৃঢ় বিশ্বাস আর সুদীর্ঘ অভ্যস্ততার দ্বন্দ্ব। নতুনকে পথ ছেড়ে দিয়ে পুরনোকে চিরদিন সরে যেতে হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে মানবিক মহৎ বৃত্তিগুলি বা গুণগুলির প্রকাশ কোথায় কেমনতরভাবে ফুটে ওঠে—অন্তর্দৃষ্টিশালী শিল্পীর নজরে তা এড়ায়না। অতি সামান্য কয়েকটি মাত্র আঁচড়ে অপূর্বদের পারিবারিক বর্ণনায় অপূর্বর মা বাবা ও দাদাদের উল্লেখ পাওয়া যায় 'পথের দাবী' বইতে। সেই যৎসামান্য উল্লেখ্য রেখাগুলির মধ্যে বহুবিস্তীর্ণ এক করুণ দ্বন্দ্ব নির্বাক ভাষায় নিঃশব্দে কথিত। এই বর্ণনাহীন অবর্ণনীয় কথন কিংবা অবর্ণিত বর্ণনার জুড়ি আমি কোথাও আজও পড়িনি।

অঙ্কনে—চিত্রকর ও দর্শক দুইয়ে মিলে ছবি হয়ে ওঠে; লেখক ও পাঠক দুইয়ে মিলে লিখিত বিষয়—সাহিত্যে পরিণত করেন। অভিনেতা অভিনেত্রী ও দর্শকে মিলে নাটক গড়ে তোলেন।

পাঠক সমাজের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধা থাকলে লেখক মাত্র দু-চারটি কথা কয়েই চুপ করে যান, বাকি কথাটুকুর ভার দিয়ে রাখেন পাঠকের উপরে। যেটুকু বলেছেন, তার মধ্যে যা রয়েছে—পাঠক নিজের খুশী মত তাকে সাজিয়ে নিতে অপারগ হবেন না তিনি জানেন। পাঠকেরা ভুল করতে পারেন কিংবা বিকৃত করতে পারেন সে-ভাবনা একটুও ছিলনা।

লেখক শরৎচন্দ্রের মানুষের উপর সুগভীর আস্থার এটিই একটি মহৎ প্রমাণ আমি মনে করি।

১৬

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমাকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করেন। এঁদের বিবিধ প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন—শরৎচন্দ্র সনাতন হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক আচরণে বিশ্বাসী ছিলেন কিনা। জিজ্ঞাসুদের মধ্যে কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে শরৎচন্দ্র যে গোঁড়া বিশ্বাসী ছিলেন এর সপক্ষে কিছু কিছু প্রমাণও জানিয়েছেন।

আমার ধারণা, শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন শেষ জীবনে। প্রথম জীবনে এর বিরুদ্ধ-বাদী বরাবর ছিলেন। তার নিজের মুখে এবং কৈশোর যৌবনের সমস্ত ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বা বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধবাদিতা শোনা ও দেখা গেছে। বর্ণভেদ তখন একটুও মানেননি। কিন্তু বিশ্বাসের কথা তুললে বলতে হয় তিনি আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী ছিলেনও এবং ছিলেননা-ও। যদিও ঈশ্বর-বিশ্বাস তাঁর দৃঢ়মূল ছিল এতে কোনও প্রশ্ন নেই। আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে তাঁকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে আমি কোনও দিন দেখিনি। কিন্তু আলোচনার সময়ে আনুষ্ঠানিক ধর্মের সপক্ষে আর বিপক্ষে দুই তরফেই তাঁকে ব্রীফ নিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। এই বিষয়টি আমি যেরকম বুঝেছি বলতে চেষ্টা করব। বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর বেশ আকর্ষণ ছিল। তাঁর স্বাভাবিক মনঃপ্রকৃতির অনুকূল ছিল বৈষ্ণব ধর্মের রস সাধনা। বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি নিরপেক্ষ নির্মম যুক্তিবাদীকেও বেশ দেখা যেত। এই যুক্তি-বাদের তীক্ষ্ণশরে তিনি অনেক কিছুই টুকরো টুকরো করে ফেলতেন দেখেছি। তাঁর সত্তার মধ্যে দ্বৈতের বৈপরীত্য ছিল সুস্পষ্ট। এই দ্বৈতের অস্তিত্ব নিখিল সংসারে এবং মানুষেরও মধ্যে সর্বত্র বর্তমান। একাধিক বিভিন্ন অস্তিত্বের সমষ্টি নিয়েই তো সমগ্রতা বা পূর্ণতা।

তাঁর প্রথম জীবনে যে বিশ্বাস আর বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, শেষ জীবনে তা শান্ত সংহত হয়ে এসেছিল।—শেষ জীবনে তিনি

প্রথম জীবনের অনেক অভিমতকে বদলে অন্য কথা বলেছেন। এটিও জীবনেরই একটি নিয়ম।

ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক সময়েই আমাদের আলোচনা হয়েছে। বলতেন—ঈশ্বরবিশ্বাস নেই এমন মানুষ দুনিয়ায় নেই জানবে। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু বস্তুবাদে বিশ্বাসী—তাদের কাছে ঈশ্বর বস্তু বা বিজ্ঞান রূপেই প্রকাশিত হয়েছেন। আসলে—বিশ্বাসই ঈশ্বর। সে বিশ্বাস যাকে বা যা-কিছুকে অবলম্বন করে দৃঢ় হয়ে উঠুক না কেন। সর্বং খল্বিদং যখন মানছ, তখন বিশ্বাসকেই ছুঁয়ে ঈশ্বর চিনে নিতে হবে। সংসারে বিশ্বাসহীন মানুষ নেই। মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ঈশ্বর বানিয়ে নিলে উপভোগটা জমে ওঠে। যেমন রবিবাবু। রবীন্দ্রনাথ নিজের রুচি মর্জি মনের সঙ্গে মিলিয়ে ঈশ্বর তৈরি করে নিয়েছেন। ঈশ্বরকে উনি বন্ধু বানিয়ে নিয়ে প্রাণ মন খুলে সুখদুঃখের কথা কইছেন, প্রভু বানিয়ে নিয়ে নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, প্রেমিক বানিয়ে নিজে প্রেমিকার ভূমিকায় সোহাগে আদরে ডুবে আছেন।

কখনও এমন কথাও বলতেন শরৎচন্দ্র, নাস্তিকরাই ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ কাছাকাছি জেনে রেখ।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে চিকিৎসা করতেন গ্রামের দরিদ্র মানুষদের, নিজের পরিবারের মানুষদের, বন্ধুবান্ধবদের। হোমিওপ্যাথির বই আর ওষুধের বাক্স ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ দিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই পড়তে দেখেছি। রাত্রিবেলায় নাকি তাঁর চিকিৎসার বই পড়ার সময়। তখন গোলমাল কানে আসেনা, মন একাগ্র হয়, এ-কথা মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি। রোগের লক্ষণ আর উপসর্গের পাশে ওষুধের নাম লেখা ছোট একখানি ডায়েরী বুক ছিল। ছোট ছোট কাগজের স্লিপেও রোগের লক্ষণ রোগীর নাম ও বিভিন্ন ওষুধের নাম লেখা দেখেছি। আমার একবার খুব জ্বর হয়েছিল, সে-সময়ে তিনি মহেশ ভট্টাচার্যের দোকানে নিজে গিয়ে একটি ছোট ওষুধের বাক্স কিনে এনে আমার ঘরে রেখেছিলেন। তার সঙ্গে একখানি গৃহচিকিৎসা বই। বইখানি হারিয়ে গেছে, ওষুধের বাক্সটি এখনও আমার কাছে রয়েছে। হারানো গৃহচিকিৎসা বইখানির পিছনের পাতায় তাঁর হাতে লেখা অনেকগুলি ওষুধের নাম ও চিকিৎসার নির্দেশ ভায়লেট রংয়ের কালিতে লেখা ছিল। তাতে লিখে দিয়েছিলেন—ভোরে দাঁত মাজার পূর্বে পরিষ্কার জলে কুলকুচি করে ওষুধ খাবে,—তার বেশ কিছুক্ষণ পরে দাঁত মাজবে। টুথপেস্টে বা টুথ পাউডারে দাঁত মেজে ওষুধ খাবেনা।

গাছ-গাছড়ার টোটকা ওষুধও অনেক জানতেন। কারও কিছু টোটকা ওষুধ জানা থাকলে তার কাছ থেকে আগ্রহ করে জেনে নিয়ে লিখে রাখতেন।

গ্রামের লোকের টোটকা ওষুধেই অসুখবিসুখ সেরে যায় কিন্তু শহুরে লোকের সবসময়ে ফল হয়না। শরৎদা বলতেন—শহুরে মানুষ নানা কেমিক্যাল ওষুধে শরীরের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে ফেলে, তাই জন্যে টোটকার ফল পায় না। তাছাড়া, এদের মনে টোটকায় বিশ্বাস নেই। মনে বিশ্বাস না থাকলে ওষুধের ফল হয়না। শরীরকে মনই তো চালায়।

বালিতে না উত্তরপাড়ায় একবার কোন এক বিশিষ্ট ধনী মানুষের বাড়িতে গিয়ে 'রুফ-গার্ডেন' দেখে এসেছিলেন। তিন চার দিন ধরে শরৎদার মুখে তখন আর কোনও আলোচনাই নেই, শুধু সেই ছাদের বাগানের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা। সেই বাগানে লবঙ্গলতা ফুলে আর সাদা নীল অপরাজিতা ফুলে আচ্ছন্ন একটি চমৎকার লতাকুঞ্জ ঘর দেখেছেন। তার ভিতরে দুটি ধবধবে সাদা শ্বেতপাথরের শিলাবেদী।

শরৎদা কয়েকদিন ধরে সেই বাগানের নানা রঙের চমৎকার সুগন্ধ গোলাপের আর অল্প দূরে নৌকোভাসা গঙ্গাস্রোতের বর্ণনা যেন প্রাত্যহিক পাঁচালী পাঠ করে তুললেন আমাদের কানে। বলতে বাধ্য করলেন শেষে, আর শুনতে পারিনা। আপনার বাড়ির ছাদেও ঐরকম একটা লতাকুঞ্জ আর গোলাপ-বাগান তৈরি করান, আমরা সবাই গিয়ে মালীর কাজ করব।

আমাদের ধৈর্যচ্যুতির সময়ে খুব হেসেছিলেন অনেকক্ষণ। বলেছিলেন-দেখলে তো? যত সুন্দর কথাই হোক, আর অতিসুন্দর বর্ণনা হোক না কেন, মানুষ পুনরাবৃত্তি সইতে পারেনা। কারণ, মানুষের জীবনে পুনরাবৃত্তি নেই। তার দেহে পুনরাবৃত্তি নেই, মনে আর চিন্তায়ও পুনরাবৃত্তি হয়না। মানুষ জোর করে পুনরাবৃত্তি অভ্যাসে আয়ত্ত করে। নামতা মুখস্থ করে অঙ্ক কষে,—জপ করে করে মনকে এক জায়গায় বেঁধে রাখতে চায়। প্রতিদিন একই গীতা কোরাণ বাইবেল আবৃত্তি করে। প্রকৃতিকে শাসন করার জন্যে ঐ ব্যবস্থা। বিশ্বপ্রকৃতিতে দৃশ্যত পুনরাবৃত্তি থাকলেও আসলে ঠিক পুনরাবৃত্তি কোথাও নেই।

মেজাজ ভাল থাকলে, এক এক সময়ে চমৎকার কথা কইতেন। নিজের মনেই স্বগতোক্তির মতন করে, অন্য একদিকে তাকিয়ে বলে যেতেন দূরমনস্ক হয়ে।

সদাসর্বদা ব্যক্তিত্বে কিন্তু তিনি রীতিমত একটি গ্রামীণ মানুষ। ঝগড়া-ঝাঁটি বিরোধ বিসংবাদের খবরে একটুও নিরুৎসাহ নন। বরং বেশ আগ্রহে এগিয়ে প্রশ্ন করে করে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা শুরু করে দেন। আমরা অস্বস্তি বোধ করে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইলে আরও বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ করে

বলতেন—রোস না, ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিতে দাও সবটা। যদি বলেছি, অন্যের ব্যাপার জেনে আপনার কী হবে বড়দা? ওসব না শোনাই তো ভাল।

অদ্ভুত একরকম চাপা হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে জবাব দিয়েছেন—আমি গেঁয়ো লোক, ঝগড়াঝাঁটি দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে বালক থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম,—তোমাদের মতন বাছাবাছির মধ্যে তো মানুষ হইনি,—এসব আমার খারাপ লাগেনা বরং ঝিমোন মনটাকে বেশ খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দেয়। তোমরা মেয়েরা, একঘেয়ে ঘরকরনা নিয়ে থাক অন্য লোকের কুলুজি কানে শুনলে টক ঝাল আচারের মতন তখুনি জিভে না তুলে পারনা। বাদ-বিসংবাদ নিয়েই তো সারা দুনিয়া ঘুরপাক খাচ্চে। পৃথিবীর মহা মহাকাব্য গুলো কী নিয়ে রচনা হয়েছে খুলে দেখ। পৃথিবীর সব দেশের মীথ পড়ে দেখ—গীতা, পুরাণ, কোবাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল যেখানে যত পুঁথি দেখবে—ঝগড়া কলহ মারামারি, বাদবিসংবাদ নেই এমন বই পাবেনা। মেয়েমানুষ হয়ে পরের ঘরের বাদবিসংবাদে কান দিতে চাওনা—এটা কি স্বাভাবিক? এ তো স্বধর্মচ্যুতি। আত্মপ্রতারণাও বলতে পার।

কখনও বা বলতেন—তোমাদের মতন তো ব্রাহ্মপাড়ায় মানুষ হইনি। গাঁয়ের ঘোঁট পাকানোর আস্বাদ তুমি পাওনি ছোটবেলা থেকে। তোমাদের মতন ব্রাহ্মসমাজের আওতায় ছোট বয়েস কাটলে আমিও তোমার মতন পিউরিটান হতে পারতুম।

'ব্রাহ্ম' শব্দটি কিন্তু শরৎদা বিশেষ কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে লক্ষ করে বলতেননা আমি জানি। ওটি বলতেন নব্য পাশ্চাত্ত্যরুচিসম্পন্ন শহুরে শিক্ষিতদের। এঁরা সেকালে তখন গ্রামীণ সংস্কৃতি, গ্রামীণ রুচি ও রীতির দিকে বেশ অবজ্ঞার কটাক্ষেই চলতেন। গ্রামীণ অনেক কিছুই এঁদের কাছে তাচ্ছিল্যের বিষয় ছিল। যেসব উচ্চশিক্ষিত যুবা গ্রামীণ সভ্যতাপুষ্ট ছিলেন, শহরের পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্নরা তাঁদের করুণা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন· এটি শরৎদার কাছে বিশেষ আঘাতকর ছিল। এরই ফলে তিনি সে-সময়ে 'ব্রাহ্ম' শব্দ ব্যবহারে শহুরে এলিটদের প্রতি অনেক সময়ে শরনিক্ষেপ করেছেন। অনেকের ভুল ধারণা, তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পছন্দ করতেননা। তা কিন্তু ঠিক নয়। শহুরে উন্নাসিকদেরই তিনি বিদ্রূপ করতেন আমি জানি। 'পরিণীতা'য় তিনি হিন্দুসমাজ-পীড়িত সৎ ও সরল মানুষ গুরুচরণবাবুকে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়েছেন। হিন্দুসমাজভুক্ত শেখরনাথের মানসিকতার দুর্বলতা বিশেষ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। 'পথনির্দেশে'র ব্রাহ্ম যুবক গুণীন্দ্রনাথের মহৎ মনের ছবি তাঁর আঁকা কোনও হিন্দুসমাজভুক্ত যুবায় কোথাও দেখা যায়না। 'দত্তা'য় রাসবিহারী চরিত্র হিন্দুসমাজেও যথেষ্ট

আছে। 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে ফোঁটা তিলক হরিনামের আড়ালে রাসবিহারীর চেয়েও নিশ্চয় অনেক বেশি নিচু স্তরের। ধর্মের বর্মে মানুষ অনেক কুটিলতা অনেক হীন কাজ ঢেকে রেখে চলে। এর কোনও নির্দিষ্টতা নেই। ব্রাহ্ম দয়াল ধাড়ার চরিত্র মানবিকতায় উজ্জ্বল। অচলার পিতা কেদার বাবু ভণ্ড নন। তিনি অকপট এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী, তিনি নীতিবাদে নিষ্ঠাবান। সুরেশ এবং মহিম তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থীর আসনে দাঁড়ালে তিনি সুরেশের প্রতিই ঝুঁকেছিলেন তার আর্থিক সংগতির দিকে লক্ষ করে, এটি একটুও অস্বাভাবিক নয়। হিন্দু হলেও তার ব্যতিক্রম হতনা। শেষ জীবনে তাঁর নীতিবাদে ও সন্তানস্নেহে অন্তর্দ্বন্দ্বটি অতি করুণ। পাঠকের মন দুর্বল বৃদ্ধের প্রতি সহানুভূতিতে দ্রব করে।

হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান কোনও সমাজই তাঁর মনের মধ্যে উঁচু নিচু ছিল না। তিনি শুধু বিচার করতেন মানুষের মনুষ্যত্ব। খুঁজে বেড়াতেন মনুষ্যত্ব। হিন্দুসমাজেরই দোষ, ত্রুটি, ভণ্ডামি, কুটিলতা তিনি সব থেকে বেশী করে খুলে এঁকে গিয়েছেন। হিন্দুয়ানির মুখোশ সরিয়ে তার কুশ্রী মুখ প্রকাশ করে দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনীরচনায় শেষ সিদ্ধান্ত নিতেননা। ওটি থাকত পাঠকদের জন্য খোলা। ভীরুতার জন্যই সিদ্ধান্ত নিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন এই সিদ্ধান্ত যারা আমরা করছি—ভুল করছি আমরাই। সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে তিনি তাঁর দর্শনকে সীমায়িত করেননি, ফুরিয়ে দেননি। যে-পর্যন্ত তাকে এনে পৌঁছে দিয়েছেন যেদিক দিয়ে, সেই দিকটিতেই তো বিধৃত রয়েছে তাঁর অকথিত সিদ্ধান্ত। কী সিদ্ধান্তে পৌঁছন উচিত মানবিক দিক দিয়ে, সেটি পাঠকের মুখ থেকেই তিনি বলিয়ে নিতে চান।

এই নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমরা অনেকদিন অনেক তর্ক করেছি। তিনি বলতেন, লেখকের কাজ, সমস্ত বিষয়গুলি নিরপেক্ষতায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলা। সেটির পরিণতি কী হলে ভাল হয় সেটি থাকবে পাঠকের আওতায়। পাঠক নিজেই বলবেন কোনটি উচিত বা কোনটি হওয়া ভাল। শেষ সিদ্ধান্তটি যদি লেখক নিজে দিয়ে 'আমার কথাটি ফুরাল নটেগাছটি মুড়ুল' বলে গল্পটির ছিপি বন্ধ করেন—তাহলে শিশুরা যতই খুশী হয়ে নিশ্চিন্ত হোকনা—গল্পটিকে কিন্তু নটেগাছটির মতই মুড়িয়ে ফেলা হয়, সন্দেহ নেই।

গল্পকে শরৎচন্দ্র এমন জায়গায় এনে পৌঁছে দিতেন—যেখান থেকে পাঠক তার নিজের রুচি বিশ্বাস আর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিণতি কল্পনা করে

নিতে পারেন। তিনি বলতেন সাহিত্যশিল্পের সমস্তটাই লেখকের কল্পনার এলাকাবন্দী করে রাখলে পাঠকের কল্পনা কোথায় ঠাঁই পাবে? লেখকে পাঠকে মিলেই তো সাহিত্য। কেউ লেখে কেউ পড়ে এই সহযোগিতাই সাহিত্য। একা একা লেখক সাহিত্য গড়তে পারেনা পাঠকের জন্য জায়গা খুলে না রাখলে। সমালোচনা-সাহিত্য কী? সে তো পাঠকেরই মনের যুক্তির সৃষ্টি, আস্বাদনের সৃষ্টি। সমালোচনা-সাহিত্য না থাকলে পৃথিবীর বড় বড় লেখকেরা বড় হয়ে উঠতেন কেমন করে? পাঠকের চিন্তায়ই তো সাহিত্যের উন্মোচন।

'অরক্ষণীয়া' বইটিতে কাহিনী শেষ করেছিলেন এই শিল্পনীতিতেই। জ্ঞানদা ভাঙা চুড়ি ছড়ান ঘাটে গঙ্গাস্রোতে স্থির নিবন্ধ দৃষ্টিতে বসে। অতুল পিছনে নিস্পন্দ মূর্তি দাঁড়িয়ে। অতুলের মনের অবস্থা সামান্য এক দুই লাইনে মাত্র লিখিত ছিল। পরে বদলেছিলেন, লেখকের মনের দর্শন ও সিদ্ধান্ত এখানে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র প্রধানত অন্তর্জগতেরই শিল্পী ছিলেন।

মধ্যবিত্ত মানুষ ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র তাঁর রচনায় যেমন সার্থক প্রকাশিত হয়েছে এমনটি তাঁর আগে ভারতীয় সাহিত্যে দেখা যায়নি, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র ছোটগল্পগুলি ছাড়া। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী চরিত্র শরৎসাহিত্যের পথপ্রদর্শক। শরৎচন্দ্র নিজেও বার বার স্বীকার করেছেন। শরৎচন্দ্রের রচনা ঘটনার স্রোতে আপনিই এগিয়ে চলে, আপনিই নিজস্ব আকৃতি নিয়ে বেড়ে ওঠে বা গড়ে ওঠে।

নিজের জীবনে নানাধরনের আঘাত-খাওয়া এই আবাল্যদুঃখী মানুষটি চিরদিন সকলের কাছে নিন্দা উপহার পেয়েছেন। সংসারে নিন্দিত মানুষদের প্রতি তাঁর সমবেদনা ছিল। বঞ্চিত ও নির্যাতিতের প্রতি সহানুভূতি ছিল অকপট আন্তরিক।

সুন্দরের প্রতি, পরিচ্ছন্নতার প্রতি, সুরুচির প্রতি আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট। নিজে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসতেন। জামা কাপড় জুতো সবসময়েই সুপরিচ্ছন্ন থাকত। প্রতিদিনই সাবান দিয়ে মাথা ধুয়ে মাথা সর্বদা সুপরিচ্ছন্ন রাখতেন। বাবুগিরির প্রতি বিরাগ ছিলনা একটুও। কিন্তু প্রদর্শনীর রুচির প্রতি ব্যঙ্গ পোষণ করতেন। বাবুগিরি যথেষ্ট করলেও তা চোখে পড়ার মত না হলে তবেই সেটি সার্থক, এই ছিল তাঁর অভিমত। নিজে থান ধুতি লংক্লথের বেনিয়ান, সাদা কোট বা মটকা কাপড়ের কোট আর মটকার চাদর ব্যবহার করতেন। প্রত্যেকটি ব্যবহার্য জিনিস উৎকৃষ্ট কোয়ালিটির সামগ্রী ছিল। বিছানা বালিশ মশারি সর্বদা সুপরিচ্ছন্ন ধবধবে থাকা চাই। তামাকের গড়গড়া এবং তার সরঞ্জাম ছিল প্রচুর। গড়গড়া সবসময়ে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার থাকত। খদ্দর কোট খদ্দর ধুতি ব্যবহার করেছেন উৎকৃষ্ট কোয়া-

লিটির। লেখাপড়ার সাজসরঞ্জামও ছিল বিশেষ রুচিপূর্ণ আর দামী উৎকৃষ্ট কোয়ালিটির। দামী কাগজ ব্যবহার করা তাঁর একটি বিশেষ শৌখীনতা ছিল, সকলেই জানেন। চিঠির কাগজই নয়, পান্ডুলিপিও তিনি দামী কাগজে লিখতে ভালবাসতেন। ফাউন্টেনপেন কেউ উপহার দিলে ভারী খুশী হয়ে উঠতেন। প্রচুর ফাউণ্টেনপেন জমিয়েছিলেন। স্কুলের বালকের মতন সেগুলি একত্রে জড় করে সগর্বে দেখাতেন মাঝে মাঝে। কার কেমন গুণ, কার নিব কত বেশী সরু বা মোটা, কার নরম নিব, কার শক্ত নিব এই নিয়ে অভিজ্ঞ কলমওয়ালার মতন কথাবার্তা কইতেন। দুটি কলম ছিল প্ল্যাটিনামের নিবের। বলতেন—জান, এ-কলম দিয়ে কিন্তু পাথরের উপরে শিলালিপিও লিখে ফেলা যেতে পারে। কত রকমের উৎকৃষ্ট কোয়ালিটির কাগজের প্যাড, বিভিন্ন রঙের কালির সংগ্রহ। ভায়লেট রঙের কালি তাঁর বেশ পছন্দ ছিল। বেশী সময় ব্যবহার করতেন কিন্তু কাল আর গাঢ় নীল। সবুজ কালিরও কলম ছিল। লাল কালির কলমটি গাঢ় মেরুন রঙের ছিল।

চশমা, জুতো, লাঠি প্রতিটি জিনিস সম্বন্ধে রুচি নিজস্ব এবং পছন্দ সুতীক্ষ্ম ছিল। যা হোক হলেই হবেনা—ঠিক সেই জিনিসটিই চাই, নইলে নয়।

লেখার সরঞ্জাম ব্যাপারে যেমন উঁচু নজর আর পরিচ্ছন্ন রুচির সুস্পষ্টতা ছিল, তামাক গড়গড়া আর কলকে নল নিয়েও তেমনি সমান মেজাজ ছিল। ঠিক-ঠিক মতন সবটি হওয়া চাই। শরৎদার উঁচু নজর আর উঁচু ধরনের মর্জি মেজাজ দেখে এক এক সময়ে আমরা একটু অবাকও হয়েছি। ফুলগাছ আর বাগান সম্বন্ধে খুব শখ ছিল। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে সামতা বেড়েতে নিশ্চয়ই মনের মতন ফুলের বাগান নিজের বিশেষ রুচিমাফিক গড়ে তুলতেন নিঃসন্দেহে। কলকাতার বাড়িতেও।

আড়ম্বর ভালবাসতেননা একটুও, অথচ সুরুচি ও উৎকর্ষের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। যে-কোন কিছুই তিনি নিজের ইচ্ছায় তুলে নিতে চাইতেন বা তৈরি করতে চাইতেন, তার মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম নজরটি বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠত।

শেষের পরিচয়

১৭

ব্যক্তি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখতে বসে নিজের প্রকাশশক্তির দৈন্য অনুভব করছি। মানুষটিকে ঠিক বুঝি স্পষ্ট করে তুলতে পারছিনা কলমে।

তাঁর গুণ ছিল অনেক, কিন্তু দোষও তো বড় কম ছিলনা। এমন চড়া গুণের আর বেপরোয়া দোষের মানুষ ক'টা দেখেছি এই জীবনে? বলতে হলে সবটাই বলে যাওয়া উচিত। কিন্তু ঠিক তা পারব কি?

আমার মুশকিলের কারণ খুলেই বলি। প্রথম কারণ, ঠিক এই ধরনের মানুষ আমি বেশী দেখিনি। ভাল করে চিন্তা করে দেখেছি—প্রখর বুদ্ধিতে, সূক্ষ্ম চিন্তায়, আর প্রগাঢ় অনুভবে শরৎদা এতই উঁচুতলার একটি মানুষ —অথচ প্রত্যক্ষ আচরণে ব্যবহারে অনেক সময়ে তাঁকে এতই রুক্ষ অমার্জিত মনে হয়েছে, যাতে বার বার মন ধাক্কা খেয়ে বেশ গুটিয়ে এসেছে। বলতে সংকোচ করবনা, বার বার রুচিতে তীব্র আঘাত লেগেছে। মন খারাপ হয়ে বিস্বাদ ঠেকেছে। কে কী মনে করবে, কিংবা এটা এখানে ভাল শোনাবেনা বা ভাল দেখাবেনা—এটি যেন তাঁর হিসেবের খাতায় কখনও লেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সামনে ওঁকে বার তিনেক দেখেছি অবশ্য। সে যেন একেবারেই অন্য মানুষ। এ শরৎচন্দ্রই নন। একটি গূঢ়বিষণ্ণতায় ম্লান, অকৃত্রিম বিনয়ে নম্র, একটি মুগ্ধ ভক্তের মৌন মূর্তি। তাঁর সামনে শরৎদা খুব সামান্যই কথা বলতেন, গুরুদেবের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত বিনীত উত্তর। গুরুদেবই কথা বলেছেন প্রায় সবটাই, এই সাক্ষাৎকারে।

পরে যখন শরৎদাকে এই নিয়ে আমরা পরিহাস করে বলেছি গুরুদেবের সামনে তো আপনার অন্য মূর্তি, মোটে চেনাই যায়না।

তিনি লজ্জিত হাসি হাসতেন। কিছুটা উদাস হয়ে যেতেন যেন। একবার আমাকে পরিহাস থেকে থামাবার জন্য বলেছিলেন—আমি তো মেয়েমানুষ নই, ঐ মানুষটির সামনে গিয়েও কথাও ফুলঝুরি ছড়াব! তোমরা তো শুনেছি ওখানে গিয়ে মুখে খৈ ফোটাও দল বেঁধে।...মেয়েমানুষ বলেই পার, জ্ঞানগম্যি

থাকলে কখনই পারতে না।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তাঁকে যে গভীরভাবে স্পর্শ করত, এ আমি ভাল করেই জানি। স্বচক্ষে দেখেছি।

সদাসর্বদার আটপৌরে শরৎচন্দ্রের নিয়মনীতির অদৃশ্য খাতাটিতে কিন্তু 'কে কী মনে করবে' এই কথাটির কোনও অস্তিত্বই ছিল না। যা তাঁর ইচ্ছে হবে, তাই বলে বসবেন বা করে বসবেন। আমার ধারণা, তাঁর মত অসামান্য এবং তাঁর মত সামান্য মানুষ কদাচিৎ মেলে। বিদগ্ধ নাগরিকেরা অনেক সময়েই বিভ্রান্ত হয়েছেন তাঁর অমার্জিততায়।

আমি যতটুকু বুঝেছি, আসলে তিনি সমাজের ফ্রেমে-আঁটা মানুষ ছিলেন না। যে-সকল আচরণ, নিয়ম, আমাদের অভ্যস্ত আর প্রত্যাশিত, তিনি তার মধ্যে নিজেকে খুশিমত কখনও বেঁধে রেখেছেন, কখনও বেঁধে রাখেননি। তিনি যথার্থ স্বাধীন আর মুক্ত ছিলেন। 'স্বাধীন' 'মুক্ত' কথাগুলি আমাদের খুবই প্রিয় আর আকাঙ্ক্ষিত,—কিন্তু সত্যিকারের একজন স্বাধীন মানুষকে নিয়ে সামাজিক মানুষদের যে কত মুশকিল হয়—সেটি শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ-জনেরা বেশ ভাল করেই জানেন। সত্যিকারের স্বাধীন মানুষকে সামাজিক মানুষদের ভাল লাগতে পারেনা। আমাদের অভ্যস্ত দৃষ্টি অভ্যস্ত প্রত্যাশায় তাঁরা বেজায় আঘাত দিতে থাকেন।

মানবহৃদয় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বাছবিচার ছিলনা। ছিলনা শ্রেণীবিচার, বয়সবিচার, জ্ঞান-বিদ্যাবুদ্ধির বিচার।

তিনি নিরক্ষর অপরিশীলিত মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে পারতেন। ওরা তাঁকে বিশ্বাস করত। অর্থাৎ, ওদের নিজেদের গণ্ডির ভিতরকার মানুষেরই মতন আপনার জন জ্ঞানে প্রাণমন খুলে সুখদুঃখ প্রকাশ করত। 'ভদ্দরলোক'দের ওরা ওদের গণ্ডীর বাইরের লোক বলেই জানে। তাই ওদের মনের ভিতরে ভদ্দরলোকেরা বেশ দূরের মানুষ। ভদ্ররা যেটুকু ওদের কাছাকাছি আসেন, তা কোনও-না-কোনও নিজেদেরই প্রয়োজনে। কদাচিৎ কেউ হয়তবা একটু কাছে আসেন করুণায়, তাও ওরা ভালই জানে। শরৎচন্দ্র ওদের কাছে দাদাঠাকুর বা বাবাঠাকুর হয়ে নিজেদের লোকের মতই ওদের বিশ্বাসের কেন্দ্রে পেঁৗছে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করতে দ্বিধা বা সংকোচের বেড়া ওদের একটুও ছিলনা। এটি একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব ছিল তাঁর। একটি ঘটনা বলি।

তাঁর কলকাতার বাড়িতে তখন রাজমিস্ত্রীরা কিছু মেরামতির কাজ করছে। শরৎচন্দ্র দু-তিনজন রাজমিস্ত্রীকে নিয়ে বৈঠকখানার বিপরীত দিকের ছোট ঘরটিতে এমনিই জমাট গল্পে মেতেছেন—মজুরেরা বাইরে খৈনি টিপছে। একজন লম্বা হয়ে রকে শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করছে দেখা গেল।

মিস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর জরুরী কথাবার্তার বিষয়বস্তু ছিল—ঠিকেদারের সঙ্গে তাদের কেমন লেনদেন, নিয়মকানুন, রীতিনীতি। বিশেষ আগ্রহে তিনি ওদের কাছ থেকে সেই সব তথ্য জেনে নিচ্ছেন। তারাও প্রাণ খুলে তাদের সুবিধে-অসুবিধে, অভাব-অভিযোগ সমস্ত কিছু তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে বলছে। শরৎদা, ওদের অভিযোগ আর অসহায়তার ব্যাপার জেনে খুব কাতর মনে হল। তিনি উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধও বেশ। আমরা সেই ঘরে ঢুকে পড়তে মিস্ত্রীরা একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল।

আমার স্বামী শরৎদাকে লক্ষ করে বললেন—মিস্ত্রীদের হাত-কামাই করিয়ে কাজ বন্ধ রেখে আপনি নাকি দু' ঘণ্টা ধরে ওদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন? এ কী কাণ্ড বলুন তো! মজুররা বাইরে লম্বা হয়ে ঘুমুচ্ছে দেখলুম—

মিস্ত্রীরা লজ্জিত হয়ে ব্যস্তভাবে কাজে চলে গেল।

শরৎদার ছোট ভাই প্রকাশবাবু আমার স্বামীকে দেখে চুপি চুপি আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—দেখুন না দাদার কাণ্ড! মিস্ত্রীদের নিয়ে এমন গল্প জমিয়েছেন, ঘণ্টাখানেক হতে চলল কাজকর্ম ওদের বন্ধ। হোঁদলা বলতে গিয়েছিল, দাদা তার উপরে মারমুখী হয়ে ওঠায় আমরা কেউ আর এগুইনি।।

সামতাবেড়েতেও এইরকম একবার দেখেছিলুম। বাঁশের বাখারি চিরে বেড়া তৈরী করছে কামলারা। উনি সেখানে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর খালি গায়ে গাছের ছায়ায় বসে তাদের সঙ্গে খুব জমিয়ে গল্প করছেন আর কাস্তের মতন একটা সরু কাটারি নিয়ে মনোযোগ দিয়ে বাখারি চাঁচছেন।

কামলাদের সঙ্গে মাছ-ধরার কৌশল নিয়ে গল্প চলছে। খাড়ুই, টেঁটা, খ্যাপলা, কেঁচা, বুঁঝ্‌কিবেলা, চাওড়, ঝাঁকার, জাওয়াল, গড়ুই, ঘাটাল, চাকুন্দা —এইরকম সব নানা অশ্রুত শব্দ কথাবার্তার মধ্যে শোনা যাচ্ছে। অনেক শব্দই আমাদের কাছে অজানা বিদেশী শব্দের মতই দুর্ভেদ্য। আমি পরে শরৎদার কাছে ঐসব গ্রাম্য শব্দেব একটা তালিকা একবার লিখে নিয়েছিলুম একটি ছোট খাতায়, মজা করবার জন্যে। সে-খাতাটির পাতায় শরৎদার বলে দেওয়া শব্দ আর তার মানে লেখা ছিল।

আমরা দুজনে শরৎদার পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি তখন। কামলা দুটি আর শরৎদা কারুরই হুঁশ নেই সেদিকে, তারা মগ্ন হয়ে গেছে শরৎচন্দ্রের মতন এমন একজন সমঝদার অভিজ্ঞ মানুষকে নিজেদের ভাষা-পরিধির মধ্যে বন্ধু-ব্যবহারে পেয়ে।

আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর বাংলা ভাষাজ্ঞানের বিস্তৃতি লক্ষ করে বিস্ময় অনুভব করছিলাম। গল্পে তন্ময় শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে আমার স্বামী খুব নিচু স্বরে তাঁর কানের কাছে বললেন—শরৎদা, ওরা কাজ করতে করতে বিড়ি খায়, আপনি ওদের ধোঁয়া বন্ধ করে পেট ফুলিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু।

ব্যস্ত হয়ে শরৎদা বলে উঠলেন—আহা, তাই তো! ও রহিম, তোমরা বিড়িটিড়ি স্বচ্ছন্দে খেতে পার। আমার কোন অসুবিধে হয়না ওতে। এই দেখ না আমার মোটা বিলিতি বিড়ি।

পাশে খুলে রাখা ফতুয়াটা কাঠের গুঁড়ির উপর থেকে টেনে নিয়ে তার পকেট থেকে চামড়ার চুরুটকেস বার করলেন।

স্বামী তখন হতাশ হয়ে বলে ফেললেন—আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব বলেই ঐ কথা বলেছিলুম। ওদের সঙ্গে বিড়িতে পাল্লা দিয়ে চুরুট বার করতে বলিনি। উঠে চলুন, আমরা পাঁচটার ট্রেনে ফিরে যাব। আপনাকে পড়ার ঘরে না বসালে আমাদের সঙ্গে আপনার মৌতাত জমবেনা।

এক মুখ হেসে উঠে দাঁড়ালেন।—যা বলেচ! মা সরস্বতী সব জায়গায় ছোঁয়াধরা দেননা। পড়ার ঘরে বসলে সাহিত্য ছাড়া মনে অন্য ভাবনা ঢোকেনা। চল যাই, ওখানেই বসি গিয়ে।

শরৎদার চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে এমন মানুষের দেখা আমি আজও পাইনি। গড়পড়তা মানুষের সঙ্গে মিল তো তাঁর ছিলইনা, মহৎ মানুষদের সঙ্গেও দৃশ্যত কোন সাদৃশ্য পাইনি।

মহৎ মানুষ একাধিক দেখার সৌভাগ্য জীবনে হয়েছে। যাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল মানবিকতার আলো মনকে শ্রদ্ধাভিভূত করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে কাছে থেকে দেখার, তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহ ও করুণা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। দেখেছি একাধিকবার কাছে গিয়ে গান্ধীজীকে, পণ্ডিচেরীতে তফাতে দাঁড়িয়ে দর্শন করেছি শ্রীঅরবিন্দকে। এছাড়া, সেকালের অনেক সৎ ও মহৎ-হৃদয় মানুষ। অনেক শিক্ষক, অনেক সাধারণ ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়লে মনে হয়, রবীন্দ্র-জীবনকালে জন্মেছি আমরা,—আমরা কত সৌভাগ্যবান। রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে তাঁকে উত্তর-কালের মানুষেরা অনেক দিন অনেকখানিই পাবেন নিশ্চয়; কিন্তু মানব-ব্যক্তিত্বের এমন আশ্চর্য সুন্দর মহান প্রকাশ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্য কালের মানুষেরা তো পাবেননা। সে তো কেবল খণ্ডকালের সীমাতেই ফুরিয়ে গেল।

রামায়ণ-মহাভারতে এক-একজন মানুষের এমন বর্ণনা আছে, যার সঙ্গে আজকের পৃথিবীর মানুষের কোনওখানে কোনই মিল নেই; তাই ঐ বর্ণনা

আমাদের কাছে অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত, এমন কি অবাস্তব বলেও মনে হয়েছে। তেমনই জীবন্ত মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিরূপের নিখাদ বাস্তব বর্ণনা হয়ত ভবিষ্যৎকালের মানুষেরাও সত্য বলে বিশ্বাস করবেননা—মানুষের মধ্যে এমন মানুষও যে হতে পারে, যাঁর ব্যক্তিত্বে স্বাভাবিকভাবেই এমন দিব্য দ্যুতি থাকে, যা সব মানুষকেই শ্রদ্ধানত শুধু নয়, পরিশীলিতও করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমনই একটি সহজ অপার্থিবতা ছিল' যার জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গান্ধীজী উচ্চারণ করেন 'গুরুদেব' বা দেশবাসী উচ্চারণ করে 'কবিগুরু'। ভাবি, আমাদের উত্তরপুরুষেরা এমন সব মানুষের দেখা পাবেন কি—যাঁদের ব্যক্তিত্ব অন্যের মনকে পবিত্র করে তোলে বিশ্বাসে।

মহৎ মানুষে কতগুলি গুণ আর লক্ষণ সুস্পষ্ট থাকে দেখেছি। কিন্তু শরৎচন্দ্র? এই অতি সাধারণ, অতি সামান্যতার লক্ষণাক্রান্ত মানুষটি? যাঁর চেহারা, আচরণ, বিদ্যাবুদ্ধি সবই সামান্য। মানুষটিকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন সকলেই বলবেন, তিনি কত সাধারণ মানুষ ছিলেন। কোনওখানে কোনও উজ্জ্বলতা নেই—নেই কোনও মহিমা, বরং খানিকটা যেন অজ্ঞতার পোঁচ মাখান মানুষ,—তাঁকে ভুলেও কারুর গুরুদেব বলে ডাকতে ইচ্ছে হবেনা। গ্রাম্যতায় ম্লান, শীর্ণ লোকটির কথাবার্তা, চলাফেরা, ভাবভঙ্গী দেখে মনে হবে মা-সরস্বতীর সম্পর্কশূন্য অজস্র ভারতীয় জনতারই একজন মাত্র। অথচ—সরস্বতীই তাঁর অস্তিত্বের মূল কেন্দ্রে অধিষ্ঠিতা ছিলেন চিরদিন। একটু ঘনিষ্ঠ হলে তবে টের পাওয়া যেত সেই মৌলিক অস্তিত্ব। আশ্চর্য ছিল তাঁর বাইরের দৃশ্যমান আধারটির সামান্যতা। এ-আধার কিন্তু নকল ছিলনা, সত্য ছিল। ভিতরটা ছিল অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তা-উজ্জ্বল, প্রখর অনুভূতিময়। সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল তাঁর হৃদয়টি। অত্যন্ত স্পর্শসচেতন, অতিরিক্ত কোমল আর পরদুঃখকাতর।

মানবিকতার দিক থেকে শরৎচন্দ্রের মত মহৎ ব্যক্তি কদাচ দেখা যাবে। কিন্তু, তাঁর মত সামান্যতায় আচ্ছন্ন বিচিত্র চরিত্র ভদ্রশ্রেণীতে দুটি মিলবে কিনা জানিনা। অদ্ভুত বৈপরীত্যে পূর্ণ বিধাতার সৃষ্ট এই মানুষটি। আমি যে কোনও দিন তাঁকে নিয়ে প্রকাশ্যে আমার অভিজ্ঞতার কথা লিখব এটি আমার কল্পনায় ছিলনা। আমার অভিজ্ঞতা আমারই মধ্যে বরাবর চাবি বন্ধ থাকবে, এমনিই ইচ্ছে ছিল। শরৎদার কাছে বাক্‌দান ভাঙতে চাইনি।

অনেকে এখন বলছেন, কী দরকার ছিল আমার জানা বিষয়গুলি বাইরের দুনিয়াকে জানাবার? যেহেতু, তাঁদের ধারণা, আমি শরৎচন্দ্রকে কলঙ্কিত করে প্রকাশ করছি। আমার নিজের সে-ধারণা তা নয়। শরৎদার জীবনে মন্দ কাজ বা কলঙ্ক আমি কোথাও দেখতে পাইনি। তাঁর জীবন যথার্থ স্বাধীন ছিল। সমাজের নিয়মরীতি, বিশেষ করে নীতি তিনি মানতে পারেননি।

পারেননি, তিনি প্রকৃত শিল্পীমেজাজের মানুষ ছিলেন বলে। সমাজের পাতা রেললাইনে তাঁর জীবনের চাকা চল্‌মান হয়নি।

সেই নির্ভেজাল শিল্পীস্বভাবের মানুষটিকে অনেকেই আমরা আমাদের রীতিনীতিতে মাপসই করে লিখে রেখে যাচ্ছি দূরকালের জন্য। এটি ভাল কাজ হচ্ছেনা, আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, শরৎচন্দ্র অন্যসব মানুষের মতন মানুষ ছিলেননা। যদিও আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তিনি কিন্তু সমাজ-অনুগত পুরোপুরি সামাজিক ভদ্রব্যক্তি। তবু, তারই মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যেত অসামাজিক একটি অন্যরকম ব্যক্তিত্ব। তাঁকে আমি মোটামুটি যা বুঝেছি তাই বলব।

শরৎচন্দ্র বাল্যকাল থেকে সমাজের কাছে আদর পাননি। পেয়েছেন উপদেশ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা কিংবা করুণা। তিনি এটি সহ্য করতে পারেননি। সমাজের বিরুদ্ধে বরাবরই বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন বাল্য, কৈশোর আর যৌবনকাল ভরে। তখন বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ দেখা গেছে। শূদ্রের ঘরে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা শুধু নয়, শূদ্রের শববহন, মৃতদেহ দাহ করেছেন সমাজের সামনে। সমাজে যারা ঘৃণিত, সেইসব শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ মেলামেশা করেছেন। নিন্দিত ব্যক্তিদের বন্ধু হয়ে তাদের নিন্দার সিংহভাগ নিজে গ্রহণ করেছেন নির্ভীক মনে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে কখনও যাত্রার দলে, কখনও সাপুড়েদের দলে, কখনও সন্ন্যাসীদের দলে ভর্তি হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শরৎদার মুখে শুনেছি—তিনি বাগ্‌দিপল্লীতে বসন্ত-মহামারীতে দিনের পর দিন তাদের দেখাশুনো, মুখে জল দেওয়া, মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার কাজ করেছেন। তারা তাঁকে নাকি ব্যাকুল আগ্রহে তখন কাছে চাইত,—মনে করত, ভগবান তাঁকে তাদেরই জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁর নিজেরও তখন নাকি তাই-ই মনে হত। বাউরীদের ঘরে একবার ম্যালেরিয়া জ্বরে অচৈতন্য হয়ে ছয় সাত দিন কাটিয়ে বাসি আমানি পথ্য করে দুর্বলদেহে অতিকষ্টে বাড়ী ফিরেছেন। বাড়ীর লোকে তাঁর চেহারা দেখে চমকে গিয়েছিল প্রথমে চিনতে পারেনি।

কৈশোর যৌবনের দুরন্তপনার অনেক গল্প বলেছেন। বলতেননা সহজে—নিজের মনের সুখদুঃখ। কদাচিৎ অল্পস্বল্প এ-বিষয়ে বলেছেন। বাল্য কৈশোর যৌবন সমাজবিদ্রোহিতায় কাটালেও শেষজীবনে তিনি সম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ হয়ে কাটিয়ে গেছেন দেখেছি। সাহিত্যের সূত্রে সমাজ যখন সম্মান যশ ও অর্থে তাঁকে শ্বেতহস্তীর পিঠে চাপিয়ে সুদূর বিদেশ থেকে তুলে নিয়ে এসে দেশবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়ে দিল, তখন থেকে তিনি সম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। কোনওখানে কোনও ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু ভিতরকার বাঁধনহীন বে-নিয়মী লোকটিকে কাছের মানুষেরা

অনেকেই মাঝে মাঝে দেখেছেন বলতে পারি। আমি তাঁকে শেষজীবনে তাঁর কিছুটা রক্ষণশীল মূর্তিতেই দেখেছি মনে হয়। প্রায়ই নানা তর্কবিতর্ক হত। তিনি বেশি সময়ে রক্ষণশীল দিকেই দাঁড়িয়ে বিতর্ক করতেন। কিন্তু এটিকে আমরা পুরোপুরি আমল দিতুমনা কেউ। কারণ, শরৎদার প্রকৃতি ছিল দুই পক্ষেই সমান তীব্র যুক্তিতে তর্ক করা।

আমার জীবনে আমি এই মানুষটির কাছে অশেষ ঋণী। আমার সামান্যতাই সম্ভবত তাঁর দুর্লভ স্নেহমমতা আকর্ষণ করে থাকতে পারে। আমার সত্যই এমন কিছু গুণ তাঁর কাছে অন্তত ছিলনা, যার বিনিময়ে এতখানি অহেতুক স্নেহ পেতে পারি। এই 'অহেতুক' কথাটি নিয়ে একদিন তিনি কতগুলি কথা বলেছিলেন মনে আছে। বিকেলবেলায় আসরে গড়গড়া টানতে টানতে বলেছিলেন—বৈষ্ণবসাহিত্য পড়েছ? উত্তর দিয়েছিলুম—অল্প-স্বল্প একটু।

—'অহৈতুকী প্রেম' কথাটা পড়েছ নিশ্চয়। কিন্তু 'অহৈতুক বিদ্বেষ' কথাটা কোথাও লক্ষ করেছ কি?

আমি হেসে ফেলেছিলুম।—এমন অদ্ভুত কথা বৈষ্ণবসাহিত্যে কোথাও তো পড়িনি বড়দা।

—তাহলেই বোঝ। সাহিত্যে সত্যিকারের 'সত্যি কথা' মানুষ কতটুকু লেখে। 'অহৈতুক প্রেম' নিয়ে কতই মাতামাতি নাচানাচি দেখবে বৈষ্ণবসাহিত্যে, কিন্তু 'অহৈতুক বিদ্বেষ' কোনোখানে উল্লেখই করেনি। অথচ সংসারে 'অহেতুক প্রেম'-এর দর্শন ক'জন লোকে পায় জানিনে, 'অহেতুক বিদ্বেষ'-এর দেখা পায়নি এমন লোক অল্পই পাবে—খোঁজ করে দেখ। বিশেষ করে, জীবনে যদি কারুর সাফল্য আর উন্নতি দেখতে পাও, তাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস কোর, সে 'অহেতুক বিদ্বেষ' কাকে বলে জেনেছে কিনা।

আমি বলেছিলুম—দৃশ্যত 'অহেতুক' হলেও, হেতু নিশ্চয় অদৃশ্যে থাকেই। অন্তত, অবদমনে বা অদৃশ্য চেতনে।

তিনি বিরক্ত সুরে বলেছিলেন—এটা তো অনেক ঘোরালো ব্যাপারে চলে যাচ্ছ। সোজাসুজি আমরা যা দেখতে পাই, কানে শুনি ছুঁয়ে পাই -তাই দিয়ে হেতু নির্ণয় করি। স্বার্থে আঘাত লাগলে কিংবা স্বার্থ পুষ্টি হলেও হেতু খুঁজে পাই—কিন্তু এসব কোন নাড়ীতেই টিপটিপ না পাওয়া গেলে তখন বলে থাকি অহেতুক।

বৈষ্ণবসাহিত্যে 'অহৈতুকী প্রেম' নিয়ে হইচই থাকলে কী হবে, কোনও ভালবাসাই অহেতুক হয়না। ভালবাসতে পারাটাই তো তার প্রধান হেতু। মা সন্তানকে ভালবেসেই ভালবাসার দাম নিজের তৃপ্তির মধ্যে পেয়ে যান হাতে-হাতে। নইলে, দীর্ঘ দিন ধরে তাকে বড় করে তুলতে অত কষ্ট করতে

পারতেননা। আসল কথা, যথার্থ প্রেম স্ব-নির্ভর হয়, অন্য-নির্ভর হয়না। অপর পক্ষ কতটা প্রতিদান দিল কিংবা দিলইনা, সেটা ভালবাসাকে দুর্বল করেনা।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—কিন্তু বড়দা, হঠাৎ আপনার 'অহৈতুক বিদ্বেষ' কথাটা মনে পড়ল কেন?

হেসে জবাব দিয়েছিলেন—ভুগছি যে ভাই। গ্রামে বাস করছি তো, বনেদী সমাজপতিরা নতুন লোকের প্রতিপত্তি পছন্দ করেননা। আমি যদিও সাতে-পাঁচে থাকতে চাইনে, তবুও দেখ না আমাকে মামলায় জড়িয়ে ভোগাচ্ছে।

১৮

কিছুকাল আগেও যে-মানুষটি ছিলেন আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে অচেনা,—যে নিঃসম্পর্ক মানুষটির শিল্পকেই শুধু আবাল্য চিনি, সেই সূত্রে নামটি অতিশ্রদ্ধেয়, এহেন ব্যক্তির হৃদ্য মমতায় স্নাত হয়ে আমি একটু অভিভূত বোধ করতুম প্রথম দিকে। অনেক সময়ে তাঁর কথাবার্তার গ্রাম্যতাও আমার কানে ঠেকত। মনে ভাল লাগতনা। মানুষটিকে ভাল কিংবা খারাপ কোনটি যে মনে করব, তার যেন হদিশ পেতুমনা। ক্রমে ক্রমে দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যে, তাঁর ভিতরকার চেহারাটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁর মধ্যে একটি স্নেহপিপাসু বালক ছিল, সে দারুণ অভিমানী। সে সামান্যেই মহা খুশী হয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, সামান্যেই খুব বেশি মর্মাহত হয়। কিন্তু এইটিই তাঁর সব নয়। তাঁর মধ্যে একটি উদাসীন দার্শনিক বাস করেন। তিনি অনেকটা দূরে, নিজস্ব আড়ালের পিছনে সরে থাকেন আমাদের থেকে,—কিন্তু মাঝে মাঝে তিনিই যখন কাছে এসে সামনে দাঁড়ান, আমরা সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ি, মুখে কথা কইতে বাধে।

তাঁর মধ্যে অতিচঞ্চল, লক্ষশূন্য একটি যুবাকে অনেকেই দেখেছেন। যাঁর কৌতুকের আর বিদ্রূপের সীমা ছিলনা। সারা দুনিয়াটাই যেন তাঁর কাছে একটা মস্ত কৌতুকেরই ব্যাপার। এই যুবাটিই আবার যখন আকুল হয়ে নিজের দেশের কথা, জাতির কথা ভাবতেন—তখন তাঁর সেই অধীর মূর্তির অস্থিরতাও অনেকেই লক্ষ করেছেন। আমি তাই বলি,—শরৎচন্দ্রকে যে যেমন দেখেছেন, তার মধ্যে সত্য আছে নিশ্চয়ই। কারুর দেখাতেই ভুল নেই,—যদিও একজনের দেখার সংগে অন্যজনের দেখা মিলবেনা জানি।

শরৎচন্দ্রকে অনেকেই দায়িত্বহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন তাঁর জীবৎকালে। এর কারণ, তিনি কথা রাখতে পারতেননা। ধারাবাহিক লেখা শুরু করে সেটি যথাসময়ে শেষ করতে পারতেননা। সভায় যাব বলে কথা দিয়ে নিজের ইচ্ছেয় কথা দিয়ে নয়, অন্যের পীড়াপীড়িতে, অপরের ইচ্ছা

মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যেতে পারতেননা। এর কারণ, আমি যতদূর বুঝেছি—তিনি তাঁর শিল্পীসত্তাকে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনের অধীনে আনতে পারেননি। চেষ্টা করেছেন অনেক—কিন্তু কিছুতেই পারেননি। লিখতে অনিচ্ছা হলে তাঁর নিজের বুঝি সাধ্য ছিলনা কলম দিয়ে একটি লাইন বার করার। একবার এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাও হয়েছিল। 'শেষের পরিচয়' আরম্ভ করেছেন ১৩৩৯ সালের আষাঢ়ে, তিন বছর একমাসে বইয়ের আধ-খানাও শেষ হয়নি। এর আগে 'শেষ প্রশ্ন'র বেলাতেও ঐ ব্যাপার। ১৩৩৪ শ্রাবণ থেকে ১৩৩৮ বৈশাখ পর্যন্ত তিন বছর দশমাস, অর্থাৎ প্রায় চার বছর সময়ে মোট সতের কিস্তীতে বই শেষ করেছেন। আমি এটা একটু আন্দাজেই বললুম, খুব সম্ভব ঠিক বলছি। আমরা তাঁকে প্রায়ই শোনাতুম আপনার লেখা বেরয়—মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দিয়ে, আবার উধাও হয়ে যায়। আপনার কলম বুঝি মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশে চলে যায় বড়দা? তিনি হাসতেন। বলতেন—মন্দ বলিসনি। সত্যিই মাঝে মাঝে কলম কোথায় উধাও হয়ে যায়, ধরে আনতে পারিনে। আসল কথা কী জানিস? আমি আমার কলমের ওপরে জুলুম করিনে। সে খুশি হয়ে এলে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। জোর করে ধরেবেঁধে আনতে পারিনা। অথচ দ্যাখ না, ও-ই তো আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এখন।

অথচ তাঁর মাথায় লেখার কল্পনা অনেক কিছুই ঘুরত। মাঝে মাঝে তা বলতেনও। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মনে আছে কেবল নাটক লেখার কথা বলতেন। মৌলিক নাটক লেখার ঝোঁক হয়েছিল সেই সময়ে। তখন তাঁর শরীর খুবই খারাপ চলছে ভিতরে-ভিতরে। সর্বদাই শরীরে নানা অস্বস্তি আর কষ্টের কথা বলেন। মাঝে মাঝে দিনকতক বেশ সহজ থাকেন, আবার মুষড়ে পড়েন। মেজাজও তখন প্রায়ই খারাপ থাকত। কোনও কথাবার্তাই বেশীক্ষণ তাঁর ভাল লাগেনা। লক্ষ করেছি সেই সময়ে,—নাটকের কথা উঠলে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠতেন।

এর আগে কিন্তু শরৎদা মৌলিক নাটক লেখায় কিছুতেই রাজী হননি, অনেকের অনেক অনুরোধেও। তাঁর প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আব শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে অনেক চেষ্টা করতে দেখেছি তাঁকে দিয়ে মৌলিক নাটক লেখাবার জন্য। অটল অনিচ্ছায় তিনি মৌলিক নাটক লেখা থেকে বিরত থেকেছেন।

এদিকে উপন্যাসকে নাটকায়িত করে তাঁর মনের খুঁৎখুতুনি কাটতনা। কিছুতেই আর নাটক পছন্দ হত না। বলতেন—মৌলিক নাটক লেখায় হাত দিলে তখন তোমরাই আমার গল্প উপন্যাসগুলোকে বাতিল করে দিতে কোমর বাঁধবে। ওদের নীচে নামিয়ে দেবে।

আবার কখনও বলতেন—আমি যা নিজে মনে বুঝি, তা মনের ভেতরে স্পষ্ট করে দেখি;—আমার সেই স্পষ্ট দেখা ছবিটাই আমি লেখায় আঁকি। নাটক লিখলে, আমার লেখা দশজনে কাটাকুটি করে অদল-বদল করবে—বলবে, এটা স্টেজে চলবেনা, ঐটা না ঢোকালে স্টেজ-সাকসেস হবেনা। আসল বইখানা নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করে অন্য একটা জিনিস দাঁড় করাবে—এটা ভাবলে আমার নার্ভে বড় স্ট্রেইন হয়। বই লিখে—শরীরে মনে যন্ত্রণা পেতে চাইনে।

আমার স্বামী বলতেন—বেশ তো, সেই কণ্ডিশনে শিশিরের সঙ্গে কথা কয়ে নেওয়া যেতে পারে। সে যদি আপনার লেখা নাটক পুরোপুরি আপনার ইচ্ছে মতন স্টেজে তুলবে বলে কথা দেয়—অবশ্য, আপনি একবার তার অভিনয় স্টেজে দেখে—নিজেই যদি কিছু কিছু জায়গা অদল-বদল করে দিতে চান পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের পরামর্শ মতন,—সেটা সম্পূর্ণ আপনারই খুশীর উপর থাকবে। অন্য কারুর এতে কথা বলা চলবেনা। তাতে নাটক সাকসেস হয় হবে, না যদি হয় না হবে।

শরৎচন্দ্র এ-প্রস্তাবে আপত্তি করেননি।

আমার স্বামী শিশিরকুমারের সঙ্গে এ নিয়ে কথাও বলেছিলেন। শিশিরবাবু হেসে বলেছিলেন—তোমরা আগে লেখাও তো ওঁকে দিয়ে নাটক। তারপরে তাকে কাটা হবে কি আস্ত রাখা হবে, সে পরের কথা। তবে তুমি শরৎদাকে বোল, শিশির বলেছে—তিনি যা লিখে দেবেন অবিকল সেইটিই স্টেজে তুলবে বলেছে সে। বইতে কোনওখানে হাত দেবার পরামর্শও সে তাঁকে দেবেনা। স্টেজে চাক্ষুস করে তিনি নিজেই যদি কিছু বদলান, সে অবশ্য অন্য কথা। একটি কথা বলে দিও ভাই, 'অদৃষ্টপূর্ব নারী' বা 'অনন্যা' নারী যেন একটিও সাপ্লাই না করেন তাঁর নতুন নাটকে। ইউনিক কিরণময়ী বাংলাদেশে মিলবেনা। ঐ রকম আশ্চর্য চরিত্র বইতে টেঁকতে পারে—স্টেজে ওকে খাড়া করতে আমি খুঁজে পাবনা ঐ চরিত্র করবার মতন মেয়ে।

শরৎদা খুশী হয়েছিলেন শিশিরবাবুর অভয়বাক্যে। হরিদাসবাবু অন্তরালে বলেছিলেন—নাটক হয়ে গেল, তখন দেখ শরৎদাই ঠিক বলবেন—না না শিশির, যেখানটা বাদ দিলে বা বদলালে ভাল হবে তুমি বলে দাও, আমি করে দিচ্ছি। স্টেজে কী হলে ঠিক হয় সেটা তো তোমারই অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি। আসল কথা, অন্য কেউ এসে এখানটা ঠিক চলবে না, বদলাতে হবে এই কথা পাছে ওঁকে বলে, সেই ভয়ে উনি হাত গুটিয়ে শক্ত করে 'না' বলে বসে আছেন। লেখা হয়ে গেলে নিজেই তখন অন্যরকম বলবেন দেখ।

এইসব কথাবার্তা চলছিল। শরৎচন্দ্রের উৎসাহও কিছুটা উদ্দীপিত হয়েছিল। প্রায়ই নাটক নিয়ে কথা কইতেন। আমার দিকে তাকিয়ে আঙুল

উ'চ্ব করে হেসে বলতেন—নাটকে কিন্তু তোমাদের পাত্তা দেবনা জেনে রাখ, গল্প উপন্যাসে যেমন দিয়েছি, এখানে তা হবেনা। ছেলেদেরই জয়জয়কার হবে। আমি হেসে জবাব দিয়েছি—সে আর নতুন কথা কী? বিশ্ব-সংসার জ্বড়েই তো 'জোর যার ম্বল্লুক তার'দের জয়জয়কার চলেছে। বরাবরের পাত্তাহীনরা পাত্তা পাবেনা, এ তো নতুন কিছ্ব নয়। গভীর গাঢ়স্বরে শরৎদা বলেছেন—ভুল বলচ। এই পাত্তাহীনেরাই বিশ্বদ্বনিয়ার কান ধরে ওঠাচ্চে, বসাচ্চে। অদ্ভুত প্রাকৃতিক নিয়ম। খেটে মরচে, ছ্বটে বেড়াচ্চে, মারামারি করচে, প্রাণ দিচ্চে একদল মানুষ—আরেক দল শ্বধ্ব ছায়ার তলায় বসে বসে খালি হাসচে আর কাঁদচে—ঠোঁট কাঁপাচ্চে আর ভ্রূ নাচাচ্চে। হাসি কান্নার ত্বণ নিয়ে বড় বড় মহা মহাবীরকে পলকে ধরাশায়ী করে শেকলে-বাঁধা ক্রীতদাস করে রাখচে।...ভাল করে দেখলে, দেখতে পাবে—'মা'ই বিশ্ব দ্বনিয়ার মালিক, 'বাবা' নয়। সে ভারবাহী মাত্র। সে নকল মালিক সেজে দায়ভার কাঁধে নিয়ে খাড়া থাকে। মালিকের মালিক গা-ঢাকা দিয়ে আসল মালিকানা চালায়।

শরৎচন্দ্র বলতেন—নারীর ম্ল্যে লিখেছিল্বম অভিজ্ঞতা কাঁচা থাকতে। একপেশে নজর নিয়ে। ওর পালটা দিকটাও আছে। সেটা বাইরের ব্যাপার নয়, ভেতরের ব্যাপার। পালটা দিকটাও যে আছে, সেটা বলতে হবে। আমি 'প্বর্ষের ম্ল্যে'ও লিখে যাব। লিখে না গেলে, নিরপেক্ষতার ব্যালান্স থাকবেনা।

তিনি বলতেন—মেয়েরা নিপীড়িত হয় বাইরে থেকে। বাইরের ব্যবস্থায় তাদের মারের ধাক্কা সইতে হয়। প্বর্ষ নিপীড়িত হয় মেয়েদের কাছে ভেতর থেকে। সেটা অনেক বেশি নিষ্ঠ্বর। সেটা চোখে দেখা যায়না, অদৃশ্য। এখানে ওদের নির্মমতা প্বর্ষের চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতি ওদের হাতে এমন অনেক অস্ত্র দিয়েছে যা ব্যবহার করে ওরা প্বর্ষকে নিবীর্য নির্জীব করে দেয় অনায়াসে।...মেয়েরা যখন স্বার্থপর হয়, তখন অপরের প্রতি ওদের নির্মমতার সীমা থাকে না। প্বর্ষ সোজাস্বজি রোষ, হিংসে, বিদ্বেষ করে, প্রভুত্বের নেশায় মাতাল হয়ে থাকে, নিষ্ঠ্বর হয়ে অত্যাচার করে স্বাভাবিক প্রবলতায়। মেয়েদের ব্যাপার অন্য।

১৯

শরৎচন্দ্র বলতেন--আমার মনে মৌলিক নাটক এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু' ধরনের দুটো নাটক পুরোপুরি ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এখন লিখতে বসলেই হয়। নাটক প্রকাশ হলে, তখন তোমরা নতুন করে হৈ হল্লা শুরু করে দেবে। বইয়ের পাতার চরিত্রগুলো প্রথম থেকেই জ্যান্ত হয়ে স্টেজে চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে তার একটা অন্যরকম এফেক্ট আছে তো।

আমরা সকলেই তখন সমস্বরে বলেছি—আমরা তা খুবই বিশ্বাস করি। আপনার গল্পে উপন্যাসে নাটকীয়তা যথেষ্ট। ঝক্‌ঝকে ডায়ালগ ব্যঞ্জনাময়—গভীর অর্থবহ। নাটকীয় উপাদান আপনার লেখায় প্রচুর। লিখুন না নাটক আপনি। বাজার সরগরম হয়ে যাবে।

কেউ বা প্রশ্ন তুলেছেন—আপনি তো এতদিন বলেছেন -নাটক লেখা আপনার দ্বারা হবেনা। উত্তরে তিনি বলেছেন--এখন আমার ভেতরে নাট্যকার এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্চে। আমরা কৌতুক করে কেউ বা বলেছি–দরজার খিলটা চট করে খুলে দিন না, বন্ধ রেখেছেন কেন?

শরৎদা হাসতেন। উদাসীন অন্যমনস্ক হাসি। বলতেন - ঐ খিল কি কেউ হাত দিয়ে কখনও নিজে খুলতে পারে? ও যখন আপনা হতে খুলে যায়, তখনই খোলে। যারা টানাটানি করে খুলতে চেষ্টা করে, তাদের হাতে নাটক 'না-টক', 'না-মিষ্টি', 'না-ঝাল' কিছুই আসেনা। শুধু খিল টানাটানির দাগ গুলো থেকে যায়।

শরৎদা সেই সময়ে বলেছিলেন—মানবচরিত্রে কতগুলো অহেতুক প্রবণতা আছে। এই নিয়ে বিপরীতধর্মী দুখানি নাটক লেখার ইচ্ছে আমার। যা চোখে দেখা যায়না, হাতে ছোঁওয়া যায়না,—প্রমাণ করাও শক্ত—অথচ, যাদের অস্তিত্বে বিশ্বসংসার অমৃতে আর বিষে উপচে উঠছে।...খুব ভাল নাটক হবে এই দুখানা। তৃতীয় নাটক লিখব আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে।

রাজনীতি নিয়ে নাটক লেখার কথাবার্তার দিনে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন

চট্টোপাধ্যায় কথাবার্তায় যোগ দিচ্ছিলেন অনেকখানি। তিনি বলেছিলেন উৎসুক হয়ে—কংগ্রেসকে নাটকে ঠুকবেন বুঝি দাদা?

তখন শরৎচন্দ্র নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলি আর ক্ষমতার লড়াইয়ে তিনি বেশ বিব্রত, বিচলিত, চিন্তিত থাকতেন।

সাবিত্রীবাবুর প্রশ্নের জবাবে শরৎচন্দ্র হেসে বলেছেন—না। যেটা মর্মান্তিক করুণ, তা নিয়ে ঠোকা যায়না। কমজোরী-পায়ের দুর্বল শিশুদের দ্যাখোনি? সরু সরু বাঁকা বাঁকা অপুষ্ট পা তাদের। শরীরের তুলনায় মস্তবড় মাথা আর পেটজোড়া পিলেতে প্রকান্ড উদরের ভার বয়ে টলমল করে হাঁটে। অন্য সব সুস্থ ছেলেরা জোরে দৌড়োয়, ঝাঁপ খায়, লাফায় দেখে সে-ও ছুটতে চায়, লাফ-ঝাঁপ দিতে চায়, কিন্তু শক্তিতে কুলোয়না। করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয় খালি। ভারি মাথা আর মোটা পেট, সরু সরু পায়ের ব্যালান্স মেরে রাখে। আমাদের রাজনীতির ধুমধাড়াক্কা আর গরম গরম বুলি আর হই-চই—ঠিক ঐ ভারী মাথা আর মোটা পেটের মতন। ডিসিপ্লিন আর টেনাসিটির পা দুটো রিকেটি—সরু সরু বাঁকা বাঁকা।

দেশের জন্য বেদনা ছিল তাঁর গভীর শুধু নয়, অধীরও। পরাধীনতার বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। বলতেন—ওরা চলে গেলেও, যা ক্ষতি করে দিয়েচে তার পূরণ কত দিনে হবে, কিংবা কখনও হবেই কিনা, কে বলতে পারে? সমস্ত 'মানুষগুলো' মনুষ্যত্বহীন হয়ে গেছে। এই সব জীব স্বাধীন যদি হয় কখনও, তার পরে সেই স্বাধীনতা নিয়ে কোনখানে কোন কাজে লাগাবে কে বলতে পারে? অন্য আরেকটা প্রবল জাতকে ডেকে নিয়ে এসে বসাবে হয়ত। মীরজাফরদের উন্নতিলোভ আর জগৎশেঠদের অর্থলোভ সারা দেশের শস্য হয়ে গেছে মনের জমিতে।

নাটক-আলোচনার প্রসঙ্গে আসি। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'আমার মনে মনে দুটো নাটক পুরোপুরি ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সবই 'ছকে' ফেলেচি। লিখতে শুরু করলে শেষ হতে দেরি হবেনা। মালমশলা রেডি।

প্রথম নাটকটির বিপরীত হবে দ্বিতীয় নাটকটি। বিপরীত মতের বিপরীত আদর্শেরও বটে। দুটোই স্টেজে উঠে পড়লে বোঝা যাবে কোনটা বেশী তেজী হয়ে জমে ওঠে। দর্শকদের মনের খবর আর তাদের নাড়ীজ্ঞান ধরা যাবে।

এই কথাগুলো যখন তিনি বলেছেন—তাঁর মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মনের দীপ্তিতে—যেন তিনি অনেকটা দূরে কোনও একটা কিছু সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন এই রকম নিরীক্ষার দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে। শরীর যদিও তখন একেবারেই দ্রুত ভেঙে পড়ছে দিন দিন। ক্রমশই শীর্ণ

থেকে শীর্ণতর হয়ে পড়ছে শরীর।

তাঁর মনের ভিতরে তৈরী হয়ে যাওয়া নাটক পৃথিবীর আলোয় আর আসেনি, রোগের যন্ত্রণায়, মনের নিদারুণ অস্থিরতায়। বলেছিলেন—আমি নোট করে রেখেচি আমার দুটো নাটকেরই থীম।

আমরা অনেকদিন—অনেক সময়েই ভেবেছি—কোথায় গেল সেই নাটক দুটির তাঁর নিজ হাতে লেখা নোট আর থীম? কোথায় কোন কাগজে,—কোন খাতায় লিখে রেখেছিলেন তিনি? আগে আগে ভাবতাম, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আছেই কোথাও। তাঁর তিরোধানের পরই কিন্তু খোঁজ করা হয়েছিল মনে পড়ছে। হরিদাসবাবুই তাঁর বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে যখন 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি নেন, তখন প্রকাশবাবুর কাছে খোঁজ করেছিলেন—শুরু করা নাটক কোনও খাতায় কিংবা প্যাডে লেখা আছে কিনা।—কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মনে আপশোস হয়, নাটক দুখানা কিংবা একখানাও যদি ফেঁদে শুরু করেও যেতেন—তাহলেও হয়ত কিছুটা আন্দাজ করা যেত। 'আগামীকাল' উপন্যাসটি যেমন সামান্য কিছুটা শুরু করে গেলেও লেখকের মনের গতি আর লেখার প্রণালী-বদল, ভাষা-বদল লক্ষ করা যায়। তাঁর নতুন দিক দিয়ে চিন্তা আর অভিজ্ঞতার ফসল তিনি দিয়ে যেতে সময় পাননি।

মানুষের কত আশাই না অপূর্ণ থেকে যায়। একবার বাইরের পৃথিবীটা ভাল করে ঘুরে দেখে আসবেন, এও তাঁর স্বপ্ন ছিল। এ নিয়ে অনেক পরিকল্পনা করতেন আমাদের সঙ্গে। আমরা বলতুম, এ যুগে জন্মে, উন্নত সভ্য দুনিয়া চাক্ষুষ না দেখে মরতে চাইনা। শরৎদা প্রবল সমর্থন করতেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা। তাঁরও একান্ত বাসনা ছিল আধুনিক সভ্যজগতের সঙ্গে একবার প্রত্যক্ষ দেখাসাক্ষাৎ করে যাওয়ার।

সময়-সময় কৌতুক করে বলতেন—কিন্তু রাধু, আমি তো পেন্টুলুন পরতে প্যারবনা। কী হবে তাহলে? তোমাদের গুরুদেবের মতন আলখাল্লা পরলে আমাকে কিন্তু মানিক-পীর দেখাবে, সেও বাপু আমি পারবনা। এইটেই তো মহাসমিস্যের ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে দেখচি।

এই বিষয় নিয়ে কখনও কৌতুকের সঙ্গে কখনও বা অকৃত্রিম গুরুত্বের সঙ্গেও আলোচনা করতেন। বলতেন—এটা কিন্তু তোমরা এখন থেকেই চাউর করে ফেল না যেন,—তাহলে দেখ কখনোই সফল হবেনা। ভেস্তে যাবেই।

আমরা দুজনে যদি ও-দেশে যাই, তিনিও ঐসঙ্গে যাবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। আমার স্বামী ভয় পেতেন মনে। বলতেন,—যা খেয়ালী মানুষ আপনি, তার উপরে এখন আবার ভাঙা শরীর, খানিক দূর গিয়ে ভাল না লাগলে মাঝপথে কোনও একটা বন্দরে নেমে পড়ে বাড়ি ফিরতে অস্থির হয়ে উঠবেন।

তখন আমাদেরও ফিরে আসতে হবে গুটি গুটি করে।

হাসতেন। বলতেন—ঐ জন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে জুটে, দলে-ভর্তি হয়ে যেতে চাই। যাতে নিজের হাতে না থাকি। আমার সঙ্গে একটা ইয়ং ছেলে আর গুড়গুড়িটা নেব। গুড়গুড়ি টানব ঘরের ভেতরে বসে। গন্ধে আর আওয়াজে দরজায় মানুষের মৌমাছি জমে যাবে। তোমরা সামলাতে পারবেনা। তোমরা সঙ্গে থাকলে,—তোমাদের যাত্রা পণ্ড করা চলবে না বলে আমারও মেজাজ-বদল চলবেনা। ঠিক বাঁধা থাকব, দেখে নিও।

কত টাকা খরচ লাগতে পারে, কোন কোন দেশ নিশ্চয়ই দেখে আসা চাই-ই, এই সব নিয়ে জল্পনা করতেন বসে বসে তামাকের ধোঁয়ায়। বাড়ি ফেরার মুখে প্রতিবারই সতর্ক করে দিতেন—দেখ, যেন ফাঁস করে ফেল না প্ল্যান। তাহলে কিন্তু ভেস্তে যাবেই।

আমাদের যাওয়া হয়েছিল বেশ কিছুকাল পরে। শরৎদার যাওয়া হয়নি।

মৌখিক চলতি ভাষা আর লিখিত সাধুভাষায় বই লেখা নিয়ে শরৎচন্দ্র অনেক তর্কবিতর্ক করেছেন দিনের পরে দিন। শেষ পর্যন্ত আগেকার অমত বদল করে মৌখিক ভাষা সাহিত্যেরও ভাষা হওয়া উচিত মেনে নিয়েছিলেন। নিজে লেখাও শুরু করেছিলেন মৌখিক ভাষায়। ঐ শুরুটুকুও যদি না করে যেতেন, প্রমাণ করা যেতনা, দুরকম ভাষা-রীতির পার্থক্য সরিয়ে নিলে সাহিত্যের ভাষা আরও স্রোতোশালী জীবন্ত হয়ে ওঠে—এ-ব্যাপারে তিনি বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর রচনা সরল সাধু-ভাষার মাধ্যমেই ছিল।

আমার বরাবরই মনে হয়, তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে, সুস্থ থাকলে—অনেক নতুন জিনিস লিখে যেতে পারতেন। তাই ইচ্ছেও ছিল তাঁর। শক্তিও ছিল সন্দেহ নেই।

যে মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি আর দূরবিস্তার চিন্তা থাকলে, অতীত বর্তমানের সংগে ভবিষ্যৎও শিল্পীর তৃতীয় নেত্রে সুস্পষ্ট ভেসে ওঠে, সে দৃষ্টি তিনি পেয়েছিলেন। একেই বোধহয় আমরা প্রতিভা বলে থাকি। অবশ্য এই সহজশক্তিকে রক্ষা করার শক্তি চাই, যত্ন চাই, নিষ্ঠা চাই। বিদ্যাচর্চা জ্ঞানচর্চার রৌদ্র জল না পেলে প্রতিভাও নষ্ট হয়ে যায়, বিকৃত বা ব্যর্থ হয়ে যায় এমন দেখা গেছে যথেষ্ট। বিদ্যাচর্চা জ্ঞানচর্চা আর শ্রমনিষ্ঠা এই শক্তিটিকে সার্থকভাবে বাড়িয়ে তোলে।

শরৎচন্দ্রের প্রতিভা যেটুকু বিদ্যা আর জ্ঞানানুশীলনের সার জল রৌদ্র পেয়েছিল, আমার মনে হয় তা পর্যাপ্ত ছিল। প্রয়োজনের বেশি সারে, সেচে, রোদে ফসলের নিজস্ব বৃদ্ধির সহায়তার চেয়ে হয়ত হানিই ঘটায়। আধুনিক উপন্যাসে বহুধা বিষয় সমাবেশ দেখে অনেক সময়ে আমার মনে হয় বৈদগ্ধ্যের

অন্তঃশীলতা না থেকে—প্রবল প্রকাশে লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি সতেজ হয়ে বাড়তে বাধাগ্রস্ত হয়।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যকর্ম সারা করে যেতে পারেননি। সময় পেলেননা মহাকালের কাছে। তাঁর শেষের দিকের উপলব্ধিগুলি চিন্তাগুলি শিল্পে রূপ দিয়ে যেতে সময় হলনা। তাঁর মুখে যে সকল মত আমরা শুনেছি, অভিজ্ঞতা তাঁকে যে সব উপলব্ধি দিয়েছিল, তিনি তা শিল্পায়িত ক যেতে আয়ুর অবকাশ পাননি।

কিন্তু তিনি যা নিজমুখে বলে যেতে পারেননি, তা অন্যের মুখে প্রকাশ হওয়া কখনোই উচিত নয়। প্রমাণবিহীন তথ্য মুদ্রিত করা দায়িত্বহীনতার চরম। অজস্র মানুষই মৃতব্যক্তি সম্পর্কে নানা কাল্পনিক কাহিনী রটিয়ে থাকে জানি। দায়িত্বহীনদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি. বিশেষ দায়িত্ববান অভিজ্ঞ লোককেও কাল্পনিক তথ্য লিখতে দেখে হতভম্ব হয়েছি। আমি সেজন্য অত্যন্ত অস্থির অস্বস্তিতে ভুগি নিজের মনের মধ্যে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর নাটক লেখার ঝোঁকের চিহ্ন তাঁর কাগজপত্র খাতাটাতার মধ্যে নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাওয়া যায়নি। যায়নি বলেই ওটা নিয়ে নাড়াচাড়াও হলনা মোটে। শিশিরবাবু যদিও মাঝে মাঝে উল্লেখ করতেন সেকথা। কেউ যদি শিশির-বাবুর মুখে ১৯৩৭-এ শরৎচন্দ্রের নাটক লেখার কথাবার্তা সম্পর্কে আলোচনা শুনে থাকেন, জানালে বিশেষ উপকৃত হব। যেহেতু, এই ব্যাপারটির লিখিত প্রমাণ কাগজপত্র বা জীবিত সাক্ষী কাউকে এখন দেখতে পাচ্ছিনা। কারুর জানা থাকা সম্ভব হতে পারে,—তিনি জানালে আমার পক্ষে স্বস্তির হবে।

২০

আমরা শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে তিনটি যোগাযোগ লক্ষ করেছি। প্রধানত দেখেছি যে শরৎচন্দ্রের জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যাটি তাঁর সাহিত্যেও কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে কীভাবে প্রতিফলিত। দ্বিতীয়ত দেখেছি. তাঁর নায়কদের মধ্যে কীভাবে কিয়ৎ পরিমাণে শরৎচন্দ্র ও বালবিধবা নায়িকাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে নিরুপমা দেবীর মানসিক আদর্শগুলি প্রতিভাসিত। তৃতীয়ত দেখেছি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নায়ক নায়িকারাও বিভিন্ন উপন্যাসে কেমন করে পরিণততর হয়ে উঠছেন. তাঁদের চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটছে—এবং স্বীয় জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যাটি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের নিজেরও চিন্তা, বুদ্ধির কী ধরনের পরিণতি ঘটছে।

এখন আলোচ্য বিষয়. শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের শেষের পরিচয় কী।

নারীর সম্পর্কে যতটা স্পষ্টত শরৎচন্দ্র খোলাখুলি মত প্রকাশ করে গেছেন সাহিত্যের মাধ্যমে, চিঠিপত্র আর মৌখিক আলোচনায়, পুরুষ বিষয়ে ততটা স্পষ্টতা নেই। এটি খুবই স্বাভাবিক. মানুষ জীবনে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চয়ই করে সহজে বলতে পারেনা। শরৎচন্দ্র তো নয়ই। তবে—একটা দিক স্পষ্ট জানা গেলে অন্য দিকটা বুঝে নেওয়া কঠিন হয় না। যেহেতু. দুটিই হল পরস্পরনির্ভর, একে অন্যের পরিপূরক।

শরৎসাহিত্যে নারীর শেষের পরিচয়টি যদি আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তাহলে পুরুষের পরিচয়টিও রহস্যাবৃত থাকেনা।

প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায় কেন যে উপেন গঙ্গোপাধ্যায়. সৌরীন মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী. অনুরূপা দেবীদের মতন সে-যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে নামী উপন্যাস-লিখিয়েরা থাকতেও—বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের এককালের ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিকেরা থাকতেও—আমার মতন সামান্য ব্যক্তির উপরে এ-ভার চাপিযে ছিলেন, তার কারণ বলি।

সাল ঠিক মনে নেই। শরৎদার লোকান্তরের বছর খানেক আগে হবে। শরৎচন্দ্র প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি এসে রাত দশটা অবধি গল্প গুজব করতেন। তাঁকে ঘিরে প্রতিদিন একটি সুন্দর সাহিত্য আড্ডা জমে উঠত।

সেদিন ছিলেন প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কানাই গাঙ্গুলী, শিল্পী সতীশ সিংহ এবং আরও দুই একজন। হালকা হাসি কৌতুক আর গল্প চলছে—এমন সময়ে এলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিছুক্ষণ গল্প গুজবে যোগ দেওয়ার পরে সতীশবাবু উঠে দাঁড়ালেন বিদায় চেয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শরৎদার দিকে তাকিয়ে বললেন—দাদা, আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

শরৎচন্দ্র গড়গড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সতীশবাবুর সঙ্গে রাস্তায় নেমে গেলেন। মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যে ফিরে এসে আবার গড়গড়া নিয়ে বসলেন। সতীশবাবুর মোটর হর্ন দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হরিদাসবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন- রাধা, নরেন,—আমার একটা কাজ তোমাদের করে দিতে হবে। তোমরা তো শরৎদার অন্দরমহলে যাতায়াত কর। (শরৎচন্দ্রের অন্দরে সকলে যেতে পেতেননা।) ওঁর শোবার ঘরের আর পড়ার ঘরের জিনিসপত্রগুলো নীচে বাইরের উঠোনে ফেলে দিতে হবে দোতালা থেকে। পড়ার ঘরের সমস্ত বইগুলো আর বইয়ের র‍্যাক ক'টা টেনে নীচে একতলায় ফেলবে। ইজিচেয়ারখানাও দুজনে ধরাধরি করে তুলে উঠোনে ফেলে দিও। যে ক'খানা ধুতি কোট উড়ুনি আর মটকার চাদর আছে সমস্ত টেনে বার করে নীচে ফেলতে হবে। জলখাওয়ার একটা রুপোর গেলাস আছে, না? সেটাও কিন্তু ফেলতে ভুলোনা। আমি একটা গাড়ী নিয়ে হাজির থাকব, ওঁর যা কিছু সম্পত্তি তুলে নিয়ে যাব। সম্পত্তি ক্রোক করা ছাড়া তো আমার এখন আর অন্য কিছু উপায় নেই।

আমার স্বামী আর সতীশবাবু, কানাইবাবু এঁরা হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন—কিন্তু জামা কাপড় বই ইজিচেয়ার ক্রোক করে আপনার সমস্ত টাকা কি উঠবে মনে করেন?

হরিদাসবাবু মাথা নেড়ে বললেন—রামোঃ। সিকিও উঠবেনা। কিন্তু ওঁর তো ঐ ছাড়া আর কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। যা পাই, যথা লাভ। আমি ব্যবসা করি, টাকা মারা গেলে যা করা নিয়ম, তা-ই করতে হবে উপায় নেই। উনি ভারতবর্ষের লেখাটা কিছুতে শেষ করছেননা, ফেলে রেখে দিয়েছেন,—অথচ অন্য অন্য কাগজে নতুন নতুন বই ধরছেন। আর কত দিন আমি অপেক্ষা করব বল? এখন ওঁর ঘটি-বাটি বিক্রী করে টাকা তুলে নেওয়া ছাড়া তো আমার আর অন্য উপায় দেখছিনা।

সবাই হৈ-হৈ করে হেসে উঠলেন। শরৎচন্দ্র চেয়ারে আধশুয়ে গড়গড়া

টানতে টানতে খুবই উপভোগ করছেন কথাবার্তা, উজ্জ্বল চাপা হাসি ফুটে উঠেছে মুখে।

আমি শরৎদার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ বলে বসলুম—আসল কথা, হালে পানি পাচ্ছেননা এখন বড়দা। সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে তো বই শুরু করেচেন,--এখন টেনে তুলবেন কী করে ভেবে পাচ্চেননা।

যেই-না এই কথা বলা,—দপ করে জ্বলে উঠলেন শরৎচন্দ্র। হাত থেকে গড়গড়ার নল জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাড়া হয়ে উঠে বসলেন চেয়ারে। আমার দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললেন—মেয়েমানুষের শেষের পরিচয় কী —উত্তর দাও।

তাঁর সেই জ্বলন্ত মূর্তির সামনে আমরা প্রত্যেকেই তখন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছি। এইমাত্র যে মুখ চাপা কৌতুক হাসিতে উজ্জ্বল ছিল—সেখানে হঠাৎ একেবারে বজ্র বিদ্যুৎ!

শরৎদার রোষের সামনে আমি ভয়ে ও লজ্জায় কুঁকড়ে গেছি। আমার স্বামী স্থির ধীর মানুষ,—তিনি শান্ত নরম গলায় বললেন—আপনিই বলে দিন না শরৎদা! আমরাই যদি বলতে পারব, তাহলে আপনি আমাদের দাদা কী জন্যে? ওঁর তখন চেষ্টা, ক্ষিপ্ত শরৎচন্দ্রের প্রসন্ন মেজাজ ফিরিয়ে আনা।

শরৎচন্দ্র নিশ্চুপ। দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ। হরিদাসবাবু আর শিল্পী সতীশ সিংহ অনুনয়ের স্বরে বলতে লাগলেন—বলুন না দাদা, মেয়েদের শেষের পরিচয় কী, শুনি। আমরা তো ভেবে আন্দাজ করতে পারছিনা।

শরৎচন্দ্র ঠান্ডা পাথরের মতন গলায় বললেন—মা। মাতৃত্বের বাৎসল্য মেয়ে-জাতের শেষের পরিচয়। আমার দিকে তখনও তাঁর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিঁধে রয়েছে। এতগুলি বাইরের লোকের সামনে লজ্জায় অপ্রতিভ আমি তখন আধমরা।

আমার স্বামী আর হরিদাসবাবু নানা স্তুতিবাক্যে, হালকা হাসি তামাশায় তাঁর মেজাজ ঠান্ডার চেষ্টা করতে লাগলেন। কানাইবাবু সতীশবাবুও যোগ দিলেন।

সেদিন শরৎচন্দ্র প্রবল উত্তেজনার মুখে তাঁর 'শেষের পরিচয়' বইয়ের মর্মার্থ খুলে বলেছিলেন। এবং বলেছিলেন তাঁর প্রকাশকের সামনেই।

শরৎচন্দ্র সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন—ব্রজবিহারীবাবু—সবিতার স্বামী যিনি, তাঁকে কেমন মানুষ দেখচ তোমরা?

সকলেই চুপচাপ।

—কই, জবাব দাও, জবাব দিচ্চনা কেন?

এখনও আমারই দিকে তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি আটকে আছে। আমার স্বামী আর শিল্পী সতীশ সিংহ তাড়াতাড়ি এগিয়ে উত্তর দিলেন—চমৎকার! অপূর্ব

চরিত্র। সব রকম গুণের পবিত্র একটি আধার। এমন দেবচরিত্র স্বামীর কিন্তু ঐ রকম—

স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতেও বোধ হয় মনে লজ্জা পেলেন। শরৎদা মুখ ফিরিয়ে অনেক দূরের দিকে শূন্যে তাকিয়ে স্বগত উক্তির মত করে বলতে লাগলেন—সমস্ত দুর্গতি দুর্ঘটনার হেতু ঐ লোকটি। ও কি একটা মানুষ? আত্মসর্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক, দুর্বল, ভীরু জীব।

এবারে আড়ষ্টতা কেটে সবাইকারই বিস্ময়ের পালা।—সে ়ী! সকলেই আমরা হতভম্ব।

শরৎচন্দ্র স্থির গলায় আত্মগতভাবে বিশ্লেষণ করে বলতে লাগলেন—সবিতা আর ব্রজবিহারীবাবু দুটি চরিত্র নিয়ে বই। রমণীবাবু, রাজু, তারক, বিমলবাবু, সারদা, রেণু এঁরা বইয়ের মূল চরিত্র দুটি ফুটিয়ে তোলার জন্যে রয়েছেন আশে পাশে আপন আপন জায়গায় তাদের নিজস্ব বিশেষত্ব নিজস্ব চরিত্র নিয়ে। বইটির মূল লক্ষ, সবিতার জীবনের কঠিনতম সমস্যা।

শরৎদা সেদিন এই বিষয়টি বোঝাতে বোঝাতে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিযে দিয়েছিলেন। সকলের তখন শুনতে শুনতে সম্মোহিত অবস্থা।

আমার যত দূর মনে আছে, লিখছি। তাঁর সে-রাত্রের সেই কথাগুলি 'শেষের পরিচয়' সমাপ্ত করার জন্যে আমাকে অনেক বারই মনের ভেতরে নাড়া-চাড়া করতে হয়েছে; স্মরণ করতে হয়েছে অনেক বার—অনেক—অনেকক্ষণ ধরে। কারণ. সেই রাত্রির স্মৃতিকেই অবলম্বন করে তাঁর অসমাপ্ত শিল্পকর্ম সমাপ্ত করার কঠিন কাজে আমায় নামতে হয়েছিল।

তিনি যা বলে যাচ্ছিলেন আপন উচ্ছ্বাসে—তার সারমর্ম—মেয়েমানুষও যে মানুষ, একথা পুরুষ-শাসিত সমাজে কোনো দেশেই আর মনে থাকেনি। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে তার মনের আর চরিত্রের আদিম জৈব চেহারা বদলিয়েছে। বিধাতার নির্দিষ্ট জৈবিক নিয়মকে বশ মানিয়ে, মানুষের নির্দিষ্ট মানবিক নিয়মকে সফল করে সবল করে তুলতে পেরেছে বলেই মানুষ আজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু মানবিক নিয়মে যে দেহ মন গড়ে তুলে আমরা সভ্যতা সংস্কৃতির দুনিয়া গড়েচি. গড়চি—সেখানে জৈবিক নিয়ম মাঝে মাঝে তার অন্ধ শক্তি নিয়ে এক একবার ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে যায়না কি?

সবিতা একটি উৎকৃষ্ট মানুষ। মহৎমনা, সৎ প্রকৃতির নারী। তার দৈহিক সৌন্দর্যের সীমা হয়না। তার বুদ্ধি, হৃদয়, সাহস, কর্তব্যজ্ঞান, নির্ভীকতা—সকলের চেয়ে তার মাতৃ হৃদয়ের সংবেদনশীলতা প্রশ্নাতীত ঐশ্বর্যময়। তার সত্যের প্রতি আনুগত্য, আভিজাত্যপূর্ণ আচরণ, স্বামী ও গৃহদেবতার প্রতি ভক্তি ভালবাসা—একটিও মিথ্যে নয়, মেকী বা ফাঁকি নয়। যে অন্ধ শক্তিতে

হঠাৎ স্থিরধরিত্রীর মাটি কেঁপে উঠে মুহূর্তে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, সমুদ্রের শান্ত বুকে বিরাট জলস্তম্ভ ফুঁসে ওঠে, সুন্দর বিকেলের নিশ্চিন্ত পৃথিবীতে কালবৈশাখীর বিধ্বংসীশক্তি কয়েক দণ্ডের জন্য নেমে এসে ধ্বংসচিহ্ন এঁকে রেখে অন্তর্হিত হয়ে যায়—এও তেমনিই একটি ব্যাপার। কিন্তু অন্ধ শক্তির সেই সাময়িক কয়েক মুহূর্তের বিজয় মানুষ মেনে নেয়নি। তাকে অস্বীকার করেছে বলেই মানুষের প্রকৃতি-বিজয় সম্ভবপর হয়েছে। স্ত্রী-মানবের জীবনে এই অন্ধ শক্তির সাময়িক ছোঁয়াকে অস্বীকার করে মানবিক শক্তির সম্মান স্বীকার করা হয়না পুরুষশাসিত সমাজে। পুরুষ-মানব তার স্খলন পতন ত্রুটি-বিচ্যুতির স্বচ্ছন্দ মার্জনা পায় অনেক, কিন্তু মেয়েরা সামান্যতম বিচ্যুতির ক্ষমা পায়না। বহু গুণ মহত্ত্ব-কৃতিত্ব দিয়েও সে জীবনের কোনও একটি মাত্র আকস্মিকতাকে মুছে ফেলতে পারেনা। এর কারণ কী? কারণ—পুরুষেরাই। একদিকে ব্রজবাবুরা, আর অন্যদিকে রমণীবাবুরা সবিতাদের ঘিরে থাকেন। মূল অপরাধ এঁদের মত মানুষদেরই। সারা জীবন-ব্যাপী শাস্তির বোঝা বহন করতে হয় সবিতাদের—সব দেশেই।

আমি অবিকল তাঁর মুখের ভাষা দিতে পারলুমনা, তবে তিনি সেদিন এই মর্মার্থের কথাই অনর্গল আবেগে বলেছিলেন। তিনি তখন কেমন একরকম উত্তেজিত অথচ আচ্ছন্নভাবে বলে যাচ্ছিলেন সোসিওলজির তথ্য দিয়ে দিয়ে নিজের চিন্তা। তিনি বলেছিলেন—যে-পুরুষমানুষের পৌরুষ নেই, নারীর কাছে সে সবচেয়ে ব্যর্থ। যে-পুরুষের উপর নারী নির্ভর করতে পারেনা,—এ-নির্ভরতা বাইরের দিকেই শুধু নয়, তার মনের, তার বিশ্বাসের, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্ভরতা,—নারীর জীবনে সে-পুরুষ অভিশাপ।

ব্রজবাবু মেরুদণ্ডহীন আত্মকেন্দ্রিক দুর্বল মানুষ। যদিও তাঁর মধ্যে শুচিতা, কোমলতা, কারুণ্য আছে। সবিতার মত ঐশ্বর্যময়ী মানবীর পাশে তিনি উপযুক্ত পুরুষ মানুষ নন। রমণীবাবু তো মানুষই নয়, ক্লেদাক্ত মলিন জীবমাত্র।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, বিমলবাবুকে এনেছি, এই দুটি 'সুপবিত্র' আর 'অপবিত্র' পুরুষের মাঝখানে সত্যিকারের পুরুষ মানুষ। যার জীবনে ময়লা কাদা যখন লাগে, তখনই লাগে, পরে আর লেগে থাকেনা। সেটা বরাবরের জন্য দাগ ফেলেনা। যে-মানুষ এক অভিজ্ঞতা থেকে বিপরীত অভিজ্ঞতার তীরে আপনিই উত্তীর্ণ হতে পারে। যার ব্যক্তিত্ব, জীবনের কাছে কুণ্ঠিত নয়, সহজ। বুদ্ধি আর অনুভব যার নিজেকেই কেন্দ্র করে ঘানি ঘোরায়না অন্যের সম্পর্কেও নিরপেক্ষভাবে সক্রিয় হতে পারে। এই তিনটি পুরুষ বিভিন্নধর্মী। এদেরই মধ্যে সবিতার নারীজীবন। তাকে বারো বছর ধরে যে-শাস্তি পেতে হয়েচে—তা সঠিক অনুমান করতে পারলে অতি কঠিন

মানুষেরও বুক কেঁপে ওঠার কথা।

শরৎচন্দ্রের অনর্গল কথা আমরা কয়েকজন সেদিন স্তম্ভিত স্থির হয়ে শুনেছিলুম। পরে হরিদাসবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—রাত অনেক হয়ে গেল। আমাকে তো উত্তরমেরুতে পৌঁছুতে হবে,—শরৎদা উঠুন, আপনাকে আর কানাইবাবুকে নামিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু—শেষের পরিচয়টা কী হল তা তো বললেন না!

শরৎদা শুকনো হেসে বললেন--সবিতা বিমলবাবুর ৩া৩ তার মনের আশ্রয় আর অবলম্বন পাবে। শরীরকে ওরা নিজেরাই উপেক্ষা করবে। আনবে-না। কিন্তু, বিমলবাবুর সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে সমুদ্রের ওপারে যাত্রার মুহূর্তে সবিতা ফিরবে তার বৃদ্ধ বৈষ্ণব গোবিন্দসর্বস্ব স্বামী ব্রজবিহারীর কাছে। কারণ ব্রজবিহারীবাবুর কাছে তখন কেউই থাকবেনা, রেণুও না।...

রেণু তার জীবনে সবিতাকে গ্রাহ্য করতে পারেইনা, তাই করবেনা। সে সবিতারই স্মল এডিশন। তার জীবনকাল অল্প পরিধিতে খুব সংক্ষিপ্ত রাখব। সে তো বইয়ের লক্ষ নয়, উপলক্ষ মাত্র। যতটুকু তার থাকা দরকার ততটুকুই থাকবে, তার চেয়ে বেশী নয়। থাকবে ব্রজবিহারীর 'মা' হয়ে সবিতাই, বৃদ্ধের শেষ ভার নিয়ে। শোকার্ত 'রেণুর মা' যাবে রেণুর বাপের ভার নিতে মাতৃহৃদয় নিয়ে। এইটেই তার 'শেষের পরিচয়'। দুঃখের দিনে, সর্বনাশের দিনে যে-হৃদয় নিঃস্বের পাশে এসে তার সব ভার তুলে নেয়।

এই মর্মার্থ শরৎচন্দ্র এক উত্তেজনার মুহূর্তে বলেছিলেন নিজের মুখে। সেখানে যাঁরা ছিলেন বলেছি; তাঁর বইয়ের প্রকাশক হরিদাসবাবু নিজে উপস্থিত ছিলেন।

এই ঘটনাটিই আমাকে 'শেষের পরিচয়' শেষ করার ভার দেওয়ার একান্ত কারণ। শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের সপ্তাহ দুই পরে হরিদাসবাবু আমাদের এই বাড়ীতে এসে বলেছিলেন–রাধা, শরৎদার 'শেষের পরিচয়' শেষ করার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি চমকে উঠেছিলুম। বলে ফেলেছিলুম–অসম্ভব একেবারেই অসম্ভব।

আমি কিছুতেই মনে ভরসা পাইনি, রাজীও হইনি। হরিদাসবাবু অবিচলিত অনড় ছিলেন তাঁর ইচ্ছায়।

তিনি বলেছিলেন—অত নার্ভাস হোয়োনা। তুমি পারবে। শরৎদা সে-রাত্রে রেগে গিয়ে গল্পের চরিত্রগুলোর মানে খুলে খুলে বলেছিলেন। তুমি শুনতে পেয়েচে তাঁর মুখে। সেই কথাগুলো আগে মনে করে করে নোট লিখে ফেল—এইটেই সবচেয়ে জরুরী। আমার যে যে পয়েন্টগুলো মনে আছে বলে দিচ্ছি, নোট করে রাখ। নরেনও তোমায় পয়েন্ট মনে করে দেবেন। দ্যাখ, অন্য লেখকদের লিখতে দিলে তাঁরা নিজেদের খুশিমত সিদ্ধান্ত

চাপাবেন। সেটা ঠিক হবেনা।

আমি তবুও অনিচ্ছুক। আতঙ্কিত হয়ে কেবলই বলেছি—পারবনা, শরৎদার বই শেষকরা? অসম্ভব কথা।

হরিদাসবাবু সেদিন চলে গেলেন। আবার এলেন পরের দিন সন্ধ্যায়। তাঁর বাড়ী আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি। আবার তিনি বোঝাতে আর সাহস দিতে শুরু করলেন। আমার স্বামী প্রথমে চুপচাপ ছিলেন, এবারে তিনিও ওঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।—'চেষ্টা করেই দ্যাখ না, ভাল না হয়, ছেড়ে দিও তখন। ভাল না হলে তো ছাপা হবেনা! লিখলেই যে ছাপা হয়ে যাবে ভাবছ কেন? উপযুক্ত না হলে তখন অন্য কাউকে দেখতে হবে। হরিদাস-বাবু বলতে লাগলেন—তোমার গল্পের হাত দেখেছি আমি। আমি না বুঝে বলব কেন?

হরিদাসবাবু আমার আপত্তি কানেই তোলেননি। যাবার সময় বলে চলে গেলেন,—তাহলে ঐ কথা রইল কিন্তু। তুমি একমাসের মধ্যে আমাকে পুরো কপি দিয়ে দেবে। শুধু লক্ষ রেখ, শরৎদার যত ফর্মা লেখা আছে, তার চেয়ে তোমার ফর্মা যেন বেশী না হয়ে যায়। সমান সমান হলে চলবে। কম হলে আরও ভাল।

২১

আমি অকূলপাথরে পড়ে গেলুম। শরৎচন্দ্রের সেই সন্ধ্যার 'শেষের পরিচয়' সম্পর্কে কথাবার্তা ভাবতে লাগলুম। আমার স্বামীও আমাকে মনে করিয়ে দিতে লাগলেন কিছু কিছু। সেই সন্ধ্যায় কিন্তু কথা হয়েছিল অনেকক্ষণ। তর্কবিতর্কও প্রথম দিকটাতে হয়েছিল বেশ কিছুটা। আমি যতটুকু এখানে লিখলুম, সেইটুকুই সব নয়। এটা তাঁর সব শেষের কথা। প্রথম দিকে অন্য-রকমও বলেছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি যা যা বলেছিলেন—সমস্তটাই বোধ হয় আমার লিখে যাওয়া উচিত। শেষের দিকে যেটি বলে আসর ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন, শুধু মাত্র সেই সারকথাটুকুই বললে হয়ত বলার ত্রুটি থেকে যাবে।

সেদিন হরিদাসবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন—শরৎদা, এমন দেবতার মতন স্বামী আর ভরা-সংসার ছেড়ে—কোলের শিশু সন্তানকে পর্যন্ত ফেলে—আপনার বর্ণনায় যাঁর স্বভাবে আর আচরণে মর্যাদার সীমা নেই, মহিমময়ী নারীটি—চট করে একটি বাইরের লোকের হাত ধরে সকলের চোখের সামনে—স্বামীর সামনে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে চলে গেলেন—এটা তাঁর কোন মর্যাদা আর কোন মহিমা—আমরা তো মাথা খুঁড়েও বুঝতে পারিনি। পাঠকরাও যে শতকরায় একশজনই বুঝতে পারেনি, আমি তার খবর রাখি। আপনি নিজে ওটা বুঝিয়ে না দিলেই তো নয়। কিরণময়ীকে তবু কিছুটা যদিও বোঝার আমলে আনা যায়—যদিও আমরা কিরণময়ীকে আজও বুঝতে পারিনি—কিন্তু এই 'সবিতা'টি তো কিরণময়ীকেও হার মানিয়ে উদিত হয়েছেন। কিরণময়ীর স্বামী হারাণের যথেষ্ট ত্রুটি ছিল, আর ছিল দারিদ্র্য। কিন্তু সবিতার স্বামী তো দেবতুল্য মানুষ, ধনসম্পদেরও কমতি নেই।

শরৎচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে জবাব দিয়েছিলেন—দেবতার মত স্বামী?—কে? ঐ পৌরুষহীন দুর্বল ভীরু বুড়ো বোষ্টমটি? ব্রজবাবুকে কেউই তোমরা দেখতে পাওনি। ওর ভিতরের মানুষটা পুরুষই নয়। ও নারীও নয়, পুরুষও

নয়। অক্ষম ক্লীব।

সবিতাব মত সবদিকে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যশালিনী নারীর পাশে ঐ পুরুষটিকে তোমাদের কি একটুও বেখাপ ঠেকছেনা? ওর গোবিন্দভক্তি আর রূপবতী যুবতী স্ত্রীর একান্ত আনুগত্য—এইতেই তোমরা উপযুক্ত স্বামীর পাসমার্ক দিয়ে দিলে? ওর মধ্যে কোনোটাই উপযুক্ত স্বামী হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে পড়েনা।

তোমরা জান না, সেকালে মানুষ যুবতী মেয়েদের পুরুষের কাছাকাছি দেখলে—কাছাকাছি কেন, চোখে চোখে তাকাতে দেখলেও—একটাই মাত্র অর্থ করত। যুবতী মাত্রেই যেন পুরুষের খাদ্যসামগ্রী। পুরুষেরা যেন পশুমাত্র। খাদ্য সামনে রেখেও সে না খেয়ে সরে থাকবে--এ যেন অসম্ভব। সেজনে৷ সেকালে যুবতীরা নিকট-সম্পর্কেরও যুবাদের থেকে অনেকটা দূরত্ব রেখে তফাৎ হয়ে চলত।

সবিতা একটি দূরসম্পর্কীয় পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, হাসি তামাশা করে—এটা পরিবারের সবাইকার চোখেই কটু ঠেকেছে। দূরসম্পর্কের পিসতুতো বোন এ ব্যাপারে মন্তব্য করায় তাকে শ্বশুরবাড়ী বিদায় হতে হয়েছে। সেই ননদের মা পিসশাশুড়ি এর জ্বালা ভোলেননি। তিনি তক্কে তক্কে ছিলেন। সেকালে কোনও নারী পুরুষ একটি ঘরে থাকলে সে ঘরে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে শোরগোল উঠিয়ে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করা হয়েছে, কলঙ্কিনী প্রমাণ করা হয়েছে, আমি জানি।

কে যেন একজন বললেন—কিন্তু গভীররাত্রে ঐ লোকটির ঘরে সবিতা--

শরৎদা হেসে বলেছিলেন—এমনও তো হতে পারে লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অসুস্থ মানুষের তদারকে যে-কোনও মানুষ যে-কোনও লোকের ঘরে ঢুকতে পারে—সবিতার মত নির্ভীক মেয়ে রমণীবাবুর কোনও তদারকের জন্যে বেশি রাত্রেও ঘরে ঢুকতে ভয় না পেতে পারে—

কানাইবাবু সতীশবাবু ও আমার স্বামী বিভিন্ন প্রশ্ন তুলতে লাগলেন:
—তাহলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চড়া গলায় সেইটে বললেই তো চুকে যেত। লোকটার হাত ধরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল কী?

শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন—সবিতার অভিমানী স্বভাব আর আত্মবিশ্বাস হয়ত দরজা খুলে বেরিয়ে নিজের নির্দোষিতার কৈফিয়ৎ ওদের কাছে দিতে রাজী হয়নি কতগুলো নির্বোধ আর হিংস্র জন্তুজানোয়ারের কাছে। হয়ত৹ বা তার নিজের স্বামীর প্রতি নির্ভরতা এতই ছিল, যাতে সে ভেবেছিল অতিথির প্রাণ মান বাঁচাতে গিয়ে তার প্রবল অভিমানী স্ত্রী নিজেকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছে—এটা স্বামী কখনোই ঘটতে দিতে পারেননা নিজে উপস্থিত থেকে। হয়তবা ভেবে থাকতে পারেন তিনি কখনোই স্ত্রীকে যেতে দিতে

পারেননা, হাত ধরে আটকে বলবেন—তুমি কোথায় যাবে?

অতিথি রমণীবাবুকে সে-রাত্রে ক্ষ্যাপা-কুকুরদের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে বাড়ীর বাইরে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল ব্রজবাবুর। সবিতার স্বামীর। তাঁর জ্ঞাতি-ভাই নবীন কেন তাঁর পরিবারের মর্যাদার, তাঁর স্ত্রীর আর অতিথির ভবিষ্যতের ভার নিল? তিনি নিশ্চেষ্ট নির্জীব হয়ে বসে রইলেন কেন? কেন নবীনকে সরিয়ে দিয়ে বললেননা—তুমি সরে যাও—আমি দেখচি।

হরিদাসবাবু প্রতিবাদ করে প্রতিপ্রশ্ন তুলেছিলেন অনেক। নিরীহ ব্রজবাবু কিছুমাত্র দোষী নন, এইটেই বলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু খুব ভয়ে ভয়ে সাবধানে আর কুণ্ঠিত গলায় এক আধটা করে প্রশ্ন তুলছিলেন।

তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তর্ক করার মত সাহস বা প্রেরণা কারুর মধ্যেই ছিলনা। তখন যেন উনি অন্য একজন মানুষ। আমাদের সদা সর্বদার চেনা বড়দা মোটেই নন। চোখের চাউনি তীব্র, কণ্ঠস্বর পর্যন্ত অন্য এক রকম। রাগ নয়, উত্তেজনাও নয়, স্থির অবিচল ঠাণ্ডা গলার স্বর। মুখের ভাব-ব্যঞ্জনায় কেমন যেন ক্ষোভ—না—বিদ্রুপ? এরকম গলার স্বর, মুখের ভাবব্যঞ্জনা, চোখের অদ্ভুত চাউনি—এমনকি, গলার স্বর পর্যন্ত অন্যরকম হতে সত্যিই আগে কখনও দেখিনি।

হরিদাসবাবুর কথার জবাবে তিনি বলেছিলেন—ঐ রকম সিচুয়েশনে মানুষ হঠাৎ কী যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে—সে নিজেই তা কি জানে? স্বামীর উপরে নির্ভর করেই যে সে বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে ভরসা করেছিল—এমন তো আশ্চর্য নয়। ব্রজবাবু কেঁদে উঠে বললেন—'নতুন বৌ- তোমার রেণু রইলো যে,—কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাব?' এই কি পুরুষ-মানুষ? এই কি স্বামী? এই কি পরিবারের কর্তা?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তিনি বলেছিলেন ঐ ব্যাপারটা আমি যে ঐ অর্থেই লিখেছি তা নয়। ইচ্ছে করলে কেউ এদিক দিয়েও ভাবতে পারে। ভাববার আছে।

এমনও হতে পারে—অশেষ গুণবতী, বুদ্ধিমতী ভরাযুবতী নারীটির কাছে হয়ত ভগবদ্‌ভক্ত নিরীহ বৃদ্ধটি উপযুক্ত পুরুষ ছিলনা। জৈবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা এমন ব্যাপার একে বুদ্ধি আর নীতিজ্ঞান সব সময়ে রোধ করতে পারেনা। মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠও এর কাছে পরাজয় মেনেছেন। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্যন্ত। ঋষি মুনিরা তো জ্ঞানের খনি শুধু নয়, সংযম নিয়ম নিষ্ঠার প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিলেন তাঁরা—তাঁদেরও জীবনে প্রকৃতির মারের খবর ভূরি ভূরি শাস্ত্রে পুরাণে লেখা আছে। কিন্তু, তার জন্যে কি তাঁরা 'বাতিল' মানুষ হয়ে গেছেন? মোটেই না। কোন পুরুষই প্রকৃতির ঝড় ঝাপটায় বাতিল হয়ে যায়না। হয় শুধু মেয়েরাই।

হরিদাসবাবু আমাকে বলেছিলেন—বইতে শরৎদার অভিমত আর পরি-কল্পনা—যতটা পার, রাখবার চেষ্টা কোর। ওঁর অনেক জিনিস হয়ত আমাদের মনে ঠিক খাপ খায় না, আমাদের ভাল না লাগুক,—তাঁর বইতে আমাদের অভিমত বা ধারণা না ঢোকানই ভাল। হরিদাসবাবু হাসতে হাসতে কৌতুক করে বলেছিলেন—তোমাকে তিনি স্নেহ করতেন রাধা, তুমি মনে মনে তাঁকে স্মরণ করে লিখতে শুরু করে দাও,—দেখো, প্ল্যানচেটে নামার মতন তোমার কলমের নিবে শরৎদা নেমে এসে ঠিক নিজের লেখা নিজে শেষ করে যাবেন। তুমি ভয় পেওনা।

হরিদাসবাবু খুব কৌতুকপ্রিয় মজলিশী মেজাজের মানুষ ছিলেন। আমার মনে সাহস দিতে এই কথাগুলি তিনি সম্পূর্ণ কৌতুক করেই বলে গেলেন আমি বুঝলুম। কিন্তু—আমার মাথায় সেটা গভীরভাবে ঢুকে গিয়ে চক্রাকাবে ঘুরতে লাগল।

কলম ধরলুম। শরৎদার মুখে-শোনা পয়েণ্টগুলি চরিত্রের ব্যাখ্যাগুলি মনে করে করে লিখে ফেললুম খাতায়। সে-খাতা এখনও আছে। আমার স্বামীও সেই মনে করে কথা তোলার কাজে সহায়তা করেছিলেন। হরিদাস-বাবুও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

তার পরের সাধনা হল আমার—কী করে রাধারাণী নামটা অদৃশ্য রেখে তার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র না রেখে শরৎদার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। কোনোখানেই যেন অন্যের হাতের ছাপ না থাকে।

যত্ন করে সাধনা করলে মানুষ নাকি ভগবানকেও লাভ করতে পারে,—এ তো একটি শিল্পনৈপুণ্য মাত্র। আমি শেষের পরিচয় বইখানির সমাপ্তি-করণে নিজেকে নিশ্চিহ্ন রাখার সাধনায় যে কিছুটা সিদ্ধিলাভ করেছিলুম তার খবর হরিদাসবাবুর মুখেই পরে পেয়েছি। হরিদাসবাবু খুশী হয়ে বলেছেন,—রাধা, আমি সবাইকেই বলচি, 'শেষের পরিচয়' কোন পর্যন্ত শরৎ-চন্দ্রের লেখা আর কোথা থেকে রাধারাণীর লেখা এর ভেদ দেখিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কেউই পারে না। অনেকেই আমার কাছে খবর নিতে আসছে, শরৎচন্দ্র কত চ্যাপটার পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' শেষ লিখে গেছেন। ঐখানে তোমার লেখা সার্থক হয়েছে। কোথায় তালি পড়ল কেউ ধরতে পারেনা।

স্বামী পরিহাস করে বলতেন—মেয়েমানুষ কিনা, তাই রীপুকর্মটা বেশ ভালই করেছ।

আজ অনেক বছর বাদে বইখানা বার করে খুলে দেখতে হল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্যে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—এই লেখা কি আমারই? এইরকম লেখা এখন কি আমি লিখতে পারব? না। কখনই পারবনা।

এইরকম ভাষা ভঙ্গী তো নয়ই, এর ভিতরকার বস্তুও যা আছে, এখানেও তো আমার নিজের কোনও অস্তিত্ব নেই। এর মতামত আমার নিজের মতামত নয়, উচ্চারণও আমার নয়। কী করে এমন হল? আমি কোনও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস রাখিনা, একমাত্র বিশ্বের মূল কারণ যিনি,—সেই ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া। প্ল্যানচেট আমার কাছে ছেলেভুলোন খেলনা মনে হয়। তাহলে এটা সম্ভব হল কেমন করে?

মনে ভেবে দেখলুম, সে-সময়ে শরৎদার মৃত্যুর আকস্মিকতা আমাকে খুবই অভিভূত করেছিল। আমি একটুও প্রস্তুত ছিলুম না তিনি সত্যিই এত শীঘ্র পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন। সে-সময়ে আমি আমার কন্যার জন্মের সূত্রে সূতিকাগারে বন্দী ছিলুম। শরৎদাকে শেষ দেখা দেখতে পাইনি। তাঁর নার্সিং-হোমে যাওয়া পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আমার স্বামী সর্বদা নার্সিংহোমে ছুটো-ছুটি করতেন। শরৎদার অন্তিমমূর্তিও আমি চোখে দেখতে পাইনি। ধাক্কাটা তাই মনে দারুণ লেগেছিল। সেই অভিভূত মন নিয়ে একান্তভাবে তাঁরই মনের চিন্তাগুলি ভাবতে ভাবতে লেখার কাজে হাত দিয়েছিলুম। অত্যন্ত সাবধানতা ছিল নিজের কথা, নিজস্ব কণ্ঠস্বর কোনোখানে যেন ঢুকে না পড়ে। তদ্‌গত চিত্তে, তন্নিষ্ঠ মনে 'শেষের পরিচয়ে' হাত দিয়েছিলুম বলেই হয়ত এমন ব্যাপার সম্ভব হয়ে থাকবে। যা আজকে লিখতে হাজার চেষ্টা করলেও কখনও সম্ভবপর হবেনা। তাই আমি বলতে চাই, 'শেষের পরিচয়' বইখানির ভিতরে বাইরে কোথাও রাধারাণী দেবীর অস্তিত্ব নেই। বই প্রকাশের সময় আমি বলে ছিলুম আমার নাম না দিয়ে এটি ছাপলে ভাল হয়। হরিদাসবাবু বলেছিলেন —তা হয়না। তিনি যে লেখা শেষ করে যেতে পারেননি সবাই জানে। তবে, বইয়ের মলাটে তোমার নাম দেবনা, ভয় নেই। ভিতরে আমাদের তরফ থেকে লিখে দেব একটু ভূমিকা মতন।

সেই ভূমিকায় তিনি সংক্ষেপে লিখেছিলেন—"রাধারাণী দেবীকে 'শেষের পরিচয়' শেষ করিয়া দিবার জন্য আমরা অনুরোধ করি। কারণ, শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার এই অসমাপ্ত রচনা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবার সুযোগ ইনি লাভ করিয়াছিলেন।"

বইটি লেখার অন্তরালপটের বৃত্তান্ত এখানে শেষ হল।

২২

'শেষের পরিচয়' নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। শুধুমাত্র ঐ উপন্যাসটিকে বোঝবার জন্যে নয়, সমগ্র শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রের মূল্যায়ন করতে হলে এই চাবি-কাঠিটি হাতে নিয়ে এগুন দরকার। নারীর শেষের পরিচয় একটিই,—সে-পরিচয় তার অন্তর্গূঢ় মাতৃত্বের।

শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনা—যা সবিতাচরিত্রের পিছনে রয়েছে, সেই দিকে একবার তাকাতে হবে। দেখতে হবে, এদের সঙ্গে সবিতাচরিত্রের যোগ কোথায় ?

এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমে যাব শরৎচন্দ্রের এপিক উপন্যাসে। 'শ্রীকান্ত' অসংশয়ে শরৎচন্দ্রের সমগ্র শিল্পকর্মের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। তাঁর শক্তির বৈশিষ্ট্য 'শ্রীকান্ত'র বিভিন্ন পর্বে বিধৃত আছে। তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত আমি দেখতে পাই, টুকরো টুকরো চকিত দৃশ্যে তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার নানান ছবি। তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন লেখক তাঁর হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। জীবনে থেকেও, জীবন থেকে অসম্পৃক্ত হয়েই কিন্তু তাঁর এই বাস্তব-জীবনানুভূতির লীলা। তাই একে মোটা আঁচড় দিয়ে জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্থূলতায় মিলিয়ে যাঁরা দেখতে চাইবেন তাঁরা ঠকবেন, ভুল করবেন।

আমার ধারণা, 'শ্রীকান্ত' প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত তাঁর ঘটনাগত জীবনের প্রতিবিম্ব,—চতুর্থ পর্বটি ঘটনাগত জীবন থেকে দূরে—কেবলমাত্র তাঁর মানসজগতের—তাঁর আদর্শের বা ইচ্ছা-জগতের প্রতিবিম্ব। 'শ্রীকান্ত' শেষ পর্বটি আমাদের সামনে লেখা। তখন তাঁর মনের অবস্থাটি নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে ভরা। সংসারে কোনও কিছুরই স্থায়িত্ব নেই, মানুষ একমাত্র নিজেরই মনের মধ্যে আশ্রয় পেতে পারে, বাইরে কোথাও নয়, এই কথাই বেশি সময় বলতেন। বলতেন—আমার বিশ্বাসের মোড় ঘুরে গেছে। এবারে যা যা বলে যাব, তা আগের সঙ্গে মিলবেনা। অভিজ্ঞতাই তাঁকে মোড় ফিরিয়েছিল। তৃতীয় পর্ব 'শ্রীকান্ত'য় রাজলক্ষ্মীর একটা মোড় ফেরা দেখতে পাই। মোড়টা ফিরে

যাওয়ার পরে এসেছে 'শেষের পরিচয়ে'র সবিতা চরিত্র। কিন্তু নারীর শেষের পরিচয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন 'শ্রীকান্ত'রই মধ্যে শরৎচন্দ্র।

'সমস্ত রমণীর অন্তরে নারী বাস করে কিনা, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্ব এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।' (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব, ১৪ অধ্যায়)

এই মাতৃত্বের চেহারাই শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের মৌল সুর। কি প্রেমে, কি স্নেহে, পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ একটিই। পুরুষ খোঁজে আশ্রয়, নারীর আছে কোল। শেষদিকে শরৎসাহিত্যের নারী পরিণতমনা, পূর্ণ— আত্মনির্ভর, স্বাধীনচিত্ত। অবশ্য, প্রথমদিকেও শরৎসাহিত্যের নারী পুরুষ-শাসিত নয়। তারা বহিরঙ্গে বৃহৎ সমাজের কাছে বাহ্য অর্থে বন্দী বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কোনও পুরুষেরই ইচ্ছার কাছে তাদের নিজেদের ইচ্ছা পদানত নয়। পুরুষের কাছে শরৎচন্দ্রের নারী বাইরের অবলম্বন প্রার্থনা করে, নেয় বহিরঙ্গের আশ্রয়, কিন্তু তারপরে সে পুরুষকেই নিজের হৃদয়ের অন্তরঙ্গ গভীর আশ্রয়ে তুলে নেয়।

নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে শরৎসাহিত্যে নারীরাই নায়ক, অর্থাৎ মূল চরিত্র। তারা সহচরিত্র নয়, নায়িকামাত্র নয়। শরৎসাহিত্যের নারী ভিতরে ভিতরে স্বাধীন। শক্তিতে ও তেজে, দোষে-গুণে, পাপে-পুণ্যে মানবিকতার দিক দিয়ে বেশি সম্পূর্ণতা পেয়েছে নারীচরিত্রগুলিই।

এককালে সিনেমায় 'দেবদাস' বইয়ের তুমুল জনপ্রিয়তার ফলেই কিনা জানিনা,—বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটি চলতি-ধারণা আছে - শরৎচন্দ্রের নায়ক এবং নায়িকারা সকলেই সেণ্টিমেণ্টাল মেয়েলীপনায় আর কান্নায় ভরা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শরৎসাহিত্যে খুব বেশী এমন মেয়েলী মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়না। সেণ্টিমেণ্টালিটির দুর্বলতাটা যেন পুরুষেরই চরিত্রে বরং কিছুটা ফুটেছে।

মেয়েরা পাখা হাতে পুরুষকে খেতে বসায়, মাথার দিব্যি দিয়ে আরও দুটো লুচি বেশি খাওয়ায় এটা ঠিকই; কিন্তু তারা অন্যের কথা শোনেনা। অন্যের নির্দেশ বহন করেনা। মেয়েরা শুধু যে নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছা-শক্তিতে চলে তা নয়, তারা পুরুষদেরও তাদের মনের নেপথ্য থেকে অবলীলায় পরিচালনা করে। নারীসুলভ কোমল মাধুর্যের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের নায়িকারা কঠিন, জেদী আর অঘোষিত বিদ্রোহী। মোটামুটি বেশ কতগুলি চরিত্রের নাম করা যায় সহজেই। মাধবী ও অপর্ণা থেকেই শুরু করা যেতে পারে। বিন্দু, বিরাজ, কুসুম, হেমাঙ্গিনী, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সুনন্দা, অচলা, অলকা, কিরণময়ী, সাবিত্রী এরা একজনও অন্যের ইচ্ছায় চালিত হওয়ার মত

ধাতুতে তৈরী নয়। এদের ধাতুই স্বাধীন; স্বতঃসুদৃঢ়। যদিও নারীসুলভ মাধুর্য ও মমতা এদের একটুও কমতি নেই, বরং অনেকক্ষেত্রে বাড়তিও দেখা যায়।

শ্রীকান্ত বলছে—'এই ধরনের কথা বলায় রাজলক্ষ্মীর জোড়া কোথাও দেখি নাই। নিজের ইচ্ছাকেই জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার কটুতাটুকু সে স্নেহের মাধুর্যে এমনিই ভরিয়া নিতে পারিত যে, সে-জিদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন সংকল্পই মাথা তুলিতে পারিত না।...বহুবার দেখিয়াছি, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি শুধু আমিই পাই নাই তাহা নয়,—কাহাকেও কোনদিনই খুঁজিয়া পাইতে দেখি নাই।' (৩য় পর্ব, ১৪ অধ্যায়)

সবিতার বিষয়েও ব্রজবাবুকে বলতে শুনি এই একই কথা। 'রেণু, তোমার নতুন মার মেয়ে। সংসারে একমাত্র আমি আর ভগবান ছাড়া কেউ জানে না ওর মায়ের জেদ কেমন ছিল। তাকে নিজের সমস্ত জীবনটাই তছনছ করে বলি দিতে হয়েচে শুধু জেদেরই পায়ে। জেদ যদি তার চড়ত, তা' ভাঙার শক্তি অন্য লোকের ত ছিলই না, তার নিজেরও ছিল না।' অথচ, ব্রজবাবুরই মুখে শুনি,—'নতুন বৌয়ের মত তেজস্বিনী সৎপ্রকৃতির ও সচ্চরিত্রের মেয়ে সংসারে অতি অল্পই হয়।'

সুনন্দার সম্পর্কেও শ্রীকান্তর মুখে শুনি—'একটির অধিক সুনন্দা এদেশে আমার চোখে পড়ে নাই', আমরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখি—সেই মেয়েটি—'শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে, সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে, একখণ্ড জীর্ণ-বস্ত্র ত্যাগ করিবার মত। মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ কোথাও কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার চিহ্ন নাই।' (৩য় পর্ব, ৮ম অধ্যায়)—আমাদের সন্দেহ হয়, 'শেষের পরিচয়ে' সবিতার গৃহত্যাগের ক্ষেত্রেও এই ধরনের কথাগুলি বলা চলত।

এই সুনন্দা সম্পূর্ণ স্বাধীন নারী। সে উচ্চশিক্ষিতা অথচ নম্র। সে সত্যবাদী এবং বিনয়ী। কিন্তু, সে-ই তার শ্বশুরকুল কুশারী-পরিবারের সকল সুখ আনন্দ ধ্বংস করে দিয়েছে জেদের বশে। এই বিদ্রোহী সুনন্দার অনম্য ইচ্ছার কাছে মাথা নত করতে হয়েছে তার শ্বশুরকুলের সকলকে। শ্রীকান্তর মুখে শুনি—'স্বামী পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, তবু এর কড়াক্রান্তি ছোঁবে না।' যেহেতু, তা পাপের সম্পদ।

সুনন্দার পরিচিতি দিতে গিয়ে আমরা ঠিক ফিরে আসছি শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের কেন্দ্রমূলে—"সুনন্দা তাহাকে দেখাইয়া বলিল, 'ছেলেমানুষ কিরকম! ওই অত বড় ছেলে যার,—তার বয়স বুঝি কম!'...উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ এই মেয়েটি নির্জন গৃহের মধ্যে একটা সতেরো আঠারো

বছরের ছেলের এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গিয়াছে যে শাসন ও সংশয়ের দড়িদড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কল্পনাই জাগে না।" (৩য় পর্ব, ৮ম অধ্যায়)

এই সহজে অবলীলায় মা হয়ে যাওয়ার সংগে ওই দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নারীর 'শেষের পরিচয়' এইখানেই।

সর্ব অবস্থাতেই সে মা হয়ে উঠতে পারে। যেখানেই ·. . যত নীচেই নামুক, তার মাতৃহৃদয় ঠিক উপরে ভেসে উঠবে। শরৎচন্দ্রের প্রিয় নায়িকাদের মধ্যে প্রধান গুণ— আত্মিক মুক্তি, স্বাধীন চেতনা, নিজের মধ্যে শুভাশুভ জ্ঞানের স্থিরতা,—যা সমাজ সংসারের নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করে এবং করেওনা। ইচ্ছার দৃঢ়তা,—নারীসুলভ কোমলতায় ঢাকা থাকে। রবীন্দ্রনাথের রাজার পতাকাতে যে-চিহ্নটি ছিল—'পদ্মের মাঝখানে বজ্র', শরৎচন্দ্রের প্রিয় নায়িকারা আমার চোখে ঠিক তাই। এই সকল শক্তিগুলির মাঝখানে গ্রন্থি-স্বরূপ আছে তার মাতৃহৃদয়। নারীর যাবতীয় শুভ শক্তির উৎসই হল নারীর মাতৃত্বপ্রবণতা.—তার সব জোর সেইখানে। সেইখানে সে জীবধাত্রী, জীব-পালিকা। যে নারী জগদ্ধাত্রী, তাকে শক্ত না হলে চলবে কেন।

সহজ পথে, শুদ্ধাচারে, সমাজের আশ্রয়ের মধ্যে থেকে নিয়মমাফিক মা হওয়া এক। আর কঠিন বাধাবিঘ্ন, নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে গিয়েও যে-নারী তার অন্তরীণ মাতৃমূর্তিটি খুইয়ে ফেলেনা, সেই শরৎচন্দ্রের নায়িকা হবার যোগ্য। পিয়ারী বাইজীর সেই যোগ্যতা ছিল; সে রাজলক্ষ্মীই শুধু নয়, সে সবার প্রথমে ও সবার শেষে 'বঙ্কুর মা'। এই মাতৃত্ব অর্জন করতে হয়েছে তাকে—এটা সে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হতে পায়নি। তাই এর মূল্যের মান আলাদা।

শ্রীকান্তের কাছে রাজলক্ষ্মী সবচেয়ে বড় হয়ে উঠছে যে-মুহূর্তে, সেই মুহূর্তটিতে সে শ্রীকান্তের প্রাণদায়িনী, বালসঙ্গিনী 'লক্ষ্মী' নয়, সেই মুহূর্তে সে 'বঙ্কুর মা'।

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে পাটনায় থাকতে দিচ্ছেনা—কেননা, তার সতীনপুত্র বঙ্কু কিছু ভাবতে পারে। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তর মুখে বলছেন—

'মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায়, যেন একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম।...সংসারে সব দিক দিয়া সর্বপ্রকারেই স্বাধীন ..তবুও সে যে-মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শতপাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।... সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সামনে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না।...মনে মনে কহিলাম রাজলক্ষ্মীকে আর তো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না।...উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য

অনুক্ষণ দুর্নিবার বেগে ধাবিত হইতেছিল তাহাতে তো সংশয় নাই। কিন্তু, আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ 'বঙ্কুর-মা' অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ-রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।' (২য় পর্ব ১২ অধ্যায়)

'শেষের পরিচয়ে' একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে ঠিক একইভাবেই সবিতাকে কথা বলতে শুনি। যেখানে সবিতা 'নতুন বৌ' সম্বোধন করতে মানা করে দিচ্ছেন বিমলবাবুকে।

"—বিপুল সংকোচ সবিতা প্রাণপণে ঠেলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—'আমাকে 'রেণুর মা' বলে ডেকো। বিমলবাবু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'সত্যি, ভারী সুন্দর। আমি অবাক হয়ে যাচ্চি এই ভেবে, তোমার এত বড় পরিচয়টা এতদিন আমার মনে হয়নি কেন বল তো?' এই বড় পরিচয়টিই হল কুলত্যাগী মা সবিতার শেষের পরিচয়।

ব্রজবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের নতুন বৌ, রমণীবাবুর উপপত্নী, বিমলবাবুর মানসপ্রতিমা, রাখাল-তারক-সারদার নতুন মা,—সবার শেষে রয়েই গেলেন রেণুর মা। শেষের পরিচয় গ্রন্থের সমাপ্তি রেণুর মৃত্যুতে। বিমলবাবু এবং সবিতার মিলনের মধ্যেও সেই একই 'অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথরুদ্ধ করিয়া' রেণুর মা এসে দাঁড়িয়েছে। রেণুর মৃত্যুতে বৃদ্ধ অসহায় ব্রজবাবু নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। রেণুর জায়গায় রেণুর বদলে সেই অশক্ত রুগ্ন বৃদ্ধকেই বুকে তুলে নিলেন, কোলে আশ্রয় দিলেন রেণুর মা,—সবিতা। বিমলবাবুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই।

আমরা দেখছি, শরৎচন্দ্রের নারীর এই মাতৃরূপ বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা, সুদৃঢ় মূল্যবোধ ছিল। নারীত্বকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় মণ্ডিত করার জন্য তিনি নারী-ব্যক্তিত্বের এই দিকটি উন্মোচন করেছেন বার বার। মমতা ছিল পুরুষ ব্যক্তিত্বের অসহায়তা, শিশুসুলভ আশ্রয়মুখীনতা সম্পর্কে। কিন্তু যেখানে পুরুষের মধ্যে আশ্রয়লোভী শিশুর চেয়ে আসঙ্গলোভী জীবটি বেশী বড় হয়ে উঠছে—সেইখানেই যেন আসছে বাধা। মায়ের অস্তিত্বই মস্ত বড় হয়ে উঠে প্রিয়ার কণ্ঠরোধ করছে। কণ্ঠরোধ করছে নারী-পুরুষের সহজ কামনার, মিলনের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—অন্তর্নিহিত 'মা'।

শরৎসাহিত্যে প্রথম থেকেই এই মাতৃহীন নায়ক আর স্নেহপ্রবণা মাতৃস্বরূপা নায়িকাকে দেখতে পাই। রাজলক্ষ্মী চালচুলোহীন শ্রীকান্তকে নিজের ইচ্ছেয় চালনা করে বটে, কিন্তু তাকে যত্ন করে মায়ের মত করেই। সেবা করে, ভার গ্রহণ করে দু' দুবার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে তার। নবজন্মদাত্রী—মায়ের মতই সে হয়েছে শ্রীকান্তের প্রাণদায়িনী।

অভয়াও নিজের ইচ্ছায় দৃঢ় অটল। জাহাজে প্রথম থেকেই সে শ্রীকান্তের

উপর নিজের ইচ্ছে সোজাসুজি চাপায়। অভয়ারই ইচ্ছেয় শ্রীকান্তকে কোয়ারেন্টিনে ঢুকতে হয়। সেই অভয়াই দেশজোড়া প্লেগের সময় রুগ্ন শ্রীকান্তকে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ঘরে তুলে নিয়ে সেবা করে বাঁচায়। এও এক নবজন্মদান। এই যে দৃঢ়তা আর মমতার সম্মিলন, এই কঠোরতা ও কোমলতার ভারসাম্যই শরৎচন্দ্রের নারীর শেষ পরিচয়। চূড়ান্ত পরিচয়। এই বিশ্ব-মানবসমাজ যদি মাতৃতন্ত্রে চলত, শরৎচন্দ্র হয়ত ... হতেন। মেয়েরা প্রকৃতির কাছাকাছি, তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই শুভবুদ্ধি, সততা এবং হৃদয়বুদ্ধির ভারসাম্যটা বেশী থাকে,—এমনটি হয়ত তিনি বিশ্বাস করতেন। জন্ম যারা দেয়, রক্ষাও তারাই করে। শরৎচন্দ্রে পুরুষরা প্রায়ই দায়িত্বহীন, উড়নচণ্ডে, অসামাজিক এবং অপরিণত। অথচ তারা 'বিদ্রোহী' নয়। তারা জেনেশুনে মন ঠিক করে সমাজের বিরোধিতা করেনা। সেটা করে মেয়েরা। সে-সাহস রাখে মেয়েরাই। শরৎচন্দ্রের নারীরাই পরিণত মনুষ্যত্বের উদাহরণ।

শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বহুদিন গঙ্গামাটিতে বাস করার পরে বলে, তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজী আছে, কেবল সম্ভ্রম ছাড়া। রাজলক্ষ্মীকে সামাজিকভাবে পত্নীর পরিচয় দিতে, সন্তানের মাতৃত্ব দিতে শ্রীকান্তের বুকে বল নেই। রাজলক্ষ্মীকে হারাতে হবে বুঝেও সে-সাহস তার হচ্ছেনা। অথচ, রাজলক্ষ্মীর খরচেই বহুকাল জীবনধারণ করে আছে সে,—তাতে তার সম্ভ্রমের অসুবিধে হয়নি।

'তোমাকে কিছুই ত্যাগ করতে হবে না—রাজলক্ষ্মী কেবল বলে—তোমাকে এত দিন যা ভাবতুম, এখন দেখচি তুমি তা নও।'

নিয়তির কৌতুকে শ্রীকান্তের বোধোদয় ঘটে;—রোগে পড়ে অবস্থার চাপে পড়ে। রাজলক্ষ্মীই এসে লোকবলে, অর্থবলে তাকে পুনরায় জীবন দেয়। জীবনের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরে শ্রীকান্ত মনে মনে বলে—'আমার সত্যে কাজ নাই। আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব।'—এখানে শ্রীকান্তর মনের মধ্যে 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' শব্দ দুটি কেবলমাত্র সামাজিক ব্যাকরণের অধীন। মনুষ্যত্বের ব্যাকরণে শ্রীকান্তর চেয়ে কিন্তু রাজলক্ষ্মীর দক্ষতা ঢের বেশী। তার 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' একেবারে অন্য নিয়ম মেনে চলে। সেটা হৃদয় এবং ভিতরের বিবেকের নিয়ম। বাইরের সমাজের মুখস্থ-করান নিয়ম নয়।

এর পরে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে নিজের স্ত্রী পরিচয় দেয়। এ-পরিচয় যদিও শ্রীকান্তর কাছে মিথ্যা,—কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কাছে তা নয়। রাজলক্ষ্মীর কাছে তার চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

তাই, যখন শ্রীকান্ত বেঁচে থাকতেও রাজলক্ষ্মী কেশ-বেশ ফেলে দিয়ে

বিধবার রিক্ত সাজে সর্বত্যাগিনী চিহ্নিত হয়ে কাশীবাসিনী হল,—তখন রাজলক্ষ্মীরই পক্ষে এটা যে কত বড় অভিমানের ভাষা,—এ যে তার নিজেরই অন্তরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নিজের সত্যকে অস্বীকার করা,—এটা কিন্তু পুরুষ শ্রীকান্ত বুঝতে পারেনি। রাজলক্ষ্মীকে বাইরে থেকেই সে বরাবর বিচার করেছে, তার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি কোনও দিন। আবারও বাইরে থেকেই ধাক্কা খেয়ে তাই ফিরে গেল অভয়ার উদ্দেশে।

জীবনের বাইরের স্তর আর ভিতরকার স্তর, এই দুটো স্তরের জীবন নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে খেলা করে গেছেন। পুরুষেরা প্রায়ই নারীর অন্তরের গভীরতম গোপন স্তরটির পরিচয় পায় না। তারা বাইরের আচরণ, মুখের বাক্য নিয়েই ভুল বিচার করে বসে। নারীর অন্তর্নিহিত অভিমান পুরুষেরা প্রায়ই ছুঁতে পারে না, ফলে বোঝার ভুল হয় তাদের। 'শেষের পরিচয়' বইতে সবিতার চরিত্রেও একটি নিঃশব্দ অথচ প্রবল অভিমান অদৃশ্যভাবে সক্রিয় রয়েছে।

২৩

শক্তিমান ঔপন্যাসিক জগদীশ গুপ্ত 'শেষের পরিচয়' বইয়ের ঘটনাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন একান্ত ঘটনাগত ভাবে। সমালোচনাটির দৃষ্টি সম্পূর্ণ বহির্নিবন্ধ।

তাঁর বিচারে—

'বইখানা পড়িতে পড়িতে যে একটা ক্লেদাক্ত, অর্থাৎ অসাধু অনুভূতি, প্রায় শেষ পর্যন্তই নিরবচ্ছিন্ন এবং নিবিড়ভাবে চলিতে থাকে, 'শেষের পরিচয়'-এর প্রথম পরিচয় সেইটাই।' সমালোচক পাকা কাঁঠালের খোসার উপর দাঁত বসিয়ে আহত হয়ে—তাঁর দুঃখকর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জনসমাজকে সাবধান করেছেন, তাঁরা যেন ভুল করে পাকা কাঁঠাল আস্বাদ করতে গিয়ে ঠকে না যান। অনেক শিল্প আছে, নারকেল, কাঁঠাল, বেদানা, আনারস, বাদামের মত। এদের বাইরের বর্ম ভেদ করতে না জানলে, ভিতরের স্বাদের খবর পাওয়া সম্ভব নয়। শিল্পেও এই একই ব্যাপার লক্ষ করা যায়। সব শিল্পই আঙুর, আপেল, কলার মত সহজে আস্বাদন করা যায়না। কতক শিল্পের স্বাদ গ্রহণ করতে হলে একটু খাটতে হয়; খোলা ভাঙতে, খোসা ছাড়াতে হবে। ভুল জায়গায় দাঁত বসালে আহত হওয়া স্বাভাবিক।

জগদীশ গুপ্ত মশায়ের সমালোচনাটি শিল্পের মলাটের সমালোচনা মাত্র, ভিতরের পাতা তিনি খুলে দেখেননি। তাঁর নিজের লেখা উপন্যাসে বোঝা যায়, মানবচরিত্রের অলিগলি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল। শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে তিনি এমন বিভ্রান্ত সমালোচনা করে যেতেননা। অশ্রদ্ধাশীল উদভ্রান্ত পাঠক হয়ত খুব বেশী নেই, তবুও আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্রের নতুন সমালোচনা হওয়া উচিত। তাঁর লেখার নতুন মূল্যায়ন হওয়া বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একান্ত জরুরী।

'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের দশম অধ্যায়ে অভয়ার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়;—'দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা এইসব মামুলি ও

প্রাচীন বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবলমাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।'

শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনেও বাইরের ঘটনাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখলে মূল মানুষটিকে যে খুব সহজে মাপতে পারা যায়, তা নয়। তাঁর হৃদয় তিনি উহ্য রাখতেন। সাধারণত কথাবার্তায় বা আচরণে তাঁর ছোঁয়া পাওয়া যেতনা। 'শেষের পরিচয়ে' সবিতার চরিত্রও তাই। তাঁরও জীবনের বাইরের ঘটনাগুলির মামুলি হিসেব দিয়ে মেপে দেখলে বিভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসার সম্ভাবনা খুব বেশী।

শরৎচন্দ্রের অন্য সব বইয়ের তুলনায় অসমাপ্ত রচনা বলে 'শেষেব পরিচয়' নিয়ে আলোচনা বিশেষ কিছুই হয়নি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের ধারা'তে একটি বিস্তৃত আলোচনা আছে। আলোচনাটি গভীর এবং মূল্যবান। ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের 'শরৎচন্দ্র' বইতেও এই উপন্যাসটির আলোচনা আছে—কেবলমাত্র যে-অংশটুকু 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছিল সেই প্রথমাংশটুকুর। আমার মনে হয় তাঁর এই আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও খাটে। তাঁর বিশ্লেষণটিতে শরৎচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ধরা পড়েছিল বলেই আমি মনে করি। একটা ব্যাপার কিন্তু জগদীশ গুপ্ত মশায় ঠিকই ধরেছিলেন, যৌন সমস্যা লুকিয়ে আছে উপন্যাসটির কেন্দ্রে, কিন্তু 'ক্লেদাক্ত' এবং 'অসাধু' লাগার মত মামুলি করে শরৎচন্দ্র যৌনতাকে উপস্থিত করেননি। যে-কারণে সবিতা বারবার চেষ্টা করেও গৃহত্যাগ করার কারণ কিছুতে মুখে আনতে পারেনা। ব্রজবাবুকে সে বলে—'মুখেও বলব না. চিঠিও লিখব না, তুমি আপনিই বুঝতে পারবে।' যৌনতা মানুষের জীবনে এমনই একটি অস্পষ্ট, রহস্যময় আবৃত দিক—যা মানুষের নিজের কাছেও হয়ত সব সময়ে স্পষ্ট নয়। যার জন্যে আপাদমস্তক মর্যাদায় মোড়া এই অভিজাত, সৎ, শুদ্ধ অন্তঃকরণের মহিলাটি স্বেচ্ছায় অসতী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। জীবনের প্রার্থিত ও প্রিয়তম সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তের বৎসর এক ঘৃণিত ব্যক্তির শয্যাসঙ্গিনী হয়ে কাটান —সবিতার মত মানুষের পক্ষে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে? সবিতারই মুখে শোনা যায়—'আমারই বা এত বড় দুর্গতি ঘটল কেন? এব উত্তর অনেকদিন অনেকরকম ভেবে দেখেচি, কিন্তু আমার গত জীবনের কর্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের আজও জবাব খুঁজে পাইনি...আর এক জন্মের অজানা কর্মফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ জন্মের ভাঙা-বেড়ার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্চি, এমন অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলকধাঁধার বাইরের পথই বা কে বার করেছে বলো তো? যে লোকটাকে কাল আমি বিদায় করে

দিলুম, আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড় মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালবাসিনি, তবু তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি করে?'

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেম ও কামনা ছিল পরস্পর-নির্ভর, সংযুক্ত। কিন্তু 'শেষের পরিচয়ে' শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেলেন অনেকটা। রমণীবাবু ও সবিতার মধ্যে সম্পর্ক কেবলমাত্রই শরীরের। সেখানে হৃদয় নেই, প্রেম নেই।

সবিতাচরিত্রের মধ্যে মানুষের সেই রহস্যময় জীবনকে [illegible]ত রাখতে চেষ্টা করেছেন লেখক, যেখানে প্রেম, কাম আর স্নেহ ভিন্ন ভি[illegible] খ[illegible]তে বইছে।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব ব্রজবাবুর প্রতি সবিতার মমতা আছে, যথোচিত ভক্তিও আছে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। যে-রমণীবাবুর সবই সবিতার কাছে হেয়, অরুচিকর, তবুও একটি অদৃশ্য অস্ফুট মিলনডোরে তাঁরই সঙ্গে বাঁধা রইলেন বার তের বছর। এই মিলন-সূত্র স্পষ্টতই প্রেম নয়। সন্দেহ হয়, কেবলই তা একদার যৌনতার শান্তির জন্যই নয়, ভুল সংশোধনের উপায়-হীনতার জন্যও।

বিমলবাবুর মাধ্যমে সবিতার জীবনে এল প্রেম। মনুষ্যত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন পরিণত ব্যক্তিত্ব। বিমলবাবু সবিতার সমরুচির, সমমানের ব্যক্তি। তাঁরই মধ্যে সবিতার প্রকৃত অন্তরসংগী মিললো।

সবিতার জীবনে তিনটি পুরুষের মধ্যে শরৎচন্দ্র নারীর তিনটি দিক ভাগ করে দিয়েছেন, ব্রজবাবুর মধ্যে তার দায়িত্বশীলতা, রেণু ও ব্রজবাবুতে মিলে একটাই মোট দিক—স্নেহপরায়ণতা, মাতৃত্বের দিক, হৃদয়ের বড় দায়িত্ব বহনের দিক। রমণীবাবুতে সেই অস্থির দিকটা- যা দুনিয়ার সমস্ত কিছুই মুহূর্তের জন্য অন্ধকার, তরল করে দেয়। আর বিমলবাবুর মধ্যে এল নারী-মনের পূর্ণতার, নির্ভরতার, প্রেমের দিকটি। বিমল, রমণী, ও ব্রজ—নাম তিনটি বেছে নেওয়ার মধ্যেও দিকগুলির হদিস দেওয়া আছে।

সবিতার শেষের পরিচয়ে কোন দিকটির জিৎ হল? দেহের তো নয়ই, এমনকি মনের বা প্রেমেরও নয়। জিতল হৃদয়, স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয়।

বিমলবাবুর সংগে সবিতার জীবন বিপুল সার্থকতার পথে এগিয়ে যেত, পূর্ণতা লাভ করত। এতদিনের তৃষিত হৃদয় মন দেহ পেত শান্তি, কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠাও তাঁর মিলত সিংগাপুরে চলে গিয়ে। কিন্তু সবিতা অবলীলায় সেই পরম প্রাপ্তির দিকটা মুহূর্তের মধ্যেই ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ব্রজবাবুর কাছে এখন তাঁর পাওয়ার নেই কিছুই। এখানে তাঁর ভূমিকা শুধু দেওয়ার। বৃদ্ধ, অশক্ত, দুর্বল ব্রজবাবুর যে এখন কেউ নেই। বিমলবাবুর প্রেমে আশ্রয় পেয়েও নিলেননা সবিতা। নিজেই আশ্রয়দাতার কঠিনতর ভূমিকাটি বেছে নিলেন তিনি। নিঃসহায় ব্রজবাবুকে আপন অঞ্চলছায়ায় আশ্রয়

না দিলে সবিতার মনুষ্যত্ব পরাজিত হয়। এই মনুষ্যত্বই হল মায়ের শেষ পরিচয়। এ-মাতৃত্ব জৈবিক দাবীতে নয়। রেণুর প্রতি সবিতার মমতার আকর্ষণ জৈবিক, ব্রজবাবুর প্রতি উদ্বেল হয় যে মমতা, তা জৈবিক নয়, এটি মানবিক। এই আত্মস্বার্থ ত্যাগ সম্পূর্ণই পরার্থে। নিজের রক্তের টানে নয়। জৈবিকতা উত্তীর্ণ মনুষ্যত্ব এখানে সুস্পষ্ট।

শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট মাতৃচরিত্রগুলির মধ্যে সর্বদাই এই তফাৎটি বরাবর দেখিয়েছেন। সকল জননীই 'মা' নয়। গর্ভধারিণীর জৈবিক মাতৃত্বের রূপটি তাঁর বহু স্কেচে ফুটেছে। 'বিপ্রদাসে' মহিমাময়ী মাতৃমূর্তির আড়াল থেকে জৈবিক জননীর স্বার্থপর কুশ্রী মূর্তির প্রকাশ দেখা যায় দয়াময়ী চরিত্রে। জৈবিকতার কাছে মনুষ্যত্বের পরাজয়ের নির্লজ্জ ছবি এখানে স্পষ্টতায় আঁকা। 'বিন্দুর ছেলে'-তে এলোকেশী, 'নিষ্কৃতি'-তে নয়নতারা, 'মেজদিদি'-তে কাদম্বিনী—এরা সকলেই আত্মসর্বস্ব, নীচুমানের, জান্তব মাতৃমূর্তি। শরৎ-চন্দ্রের সাহিত্যে যথার্থ মহৎ মাতৃত্ব ফুটেছে পরের সন্তানকে ঘিরে। মাতৃত্বের বৃত্তিকে তিনি জৈবিক স্তর থেকে উপরে টেনে তুলে মানবিকতায় আলোকিত করে দিয়েছেন। নারীর মধ্যে যে 'মা' আছে, তার বিকাশের জন্য জরায়ুতে সন্তান ধারণের প্রয়োজন হয়না।

রাজলক্ষ্মী সতীনপুত্রের মা হয়ে যতটা সত্য, তরুণ সন্ন্যাসী বজ্রানন্দের প্রতি তার আকুল মাতৃস্নেহও ততটাই সত্য, বরং নিঃস্বার্থ বলেই দ্বিপাক্ষিক বন্ধন যেন সেখানে আরও গভীর। দুটি সম্পর্কই সম্পূর্ণ মানবিক মাতৃত্বের—এ-স্নেহের মধ্যে রক্তের জাদু নেই। আছে নারীহৃদয়ের জাদু।

আমার মনে হয়, 'বিন্দু' যদিও ঠিক জৈবিক অর্থে মা নয়, তবু তাঁর ব্যাকুল মাতৃত্বের ধরনটা জৈবিকতা-ধর্মী। আত্মতৃপ্তি-কেন্দ্রিক। সন্তান-স্বার্থপর বন্ধ্যা বিন্দুর অন্ধ, উদ্দাম স্নেহের রকমটায় কিন্তু জৈবিক স্নেহেরই উচ্ছ্বাস। তার অমূল্য-বাতিক, যুক্তি বুদ্ধির ধার ধারেনা মোটেও। বরং অমূল্যের গর্ভধারিণী মা অন্নপূর্ণার মধ্যেই দেখতে পাই, অনেক বেশী মহৎ মানবিক স্নেহ। সেই স্নেহ ধাবিত হয়েছে অভিমানী অবুঝ বিন্দুর প্রতি। এই স্নেহেই একদা পালিত হয়ে বড় হয়ে উঠেছে বিন্দুর স্বামী মাধব। মাধব সে-বন্ধন থেকে আজও মুক্ত নয়। জেদী পাগলী বিন্দুর প্রতি অন্নপূর্ণার স্নেহের আকর্ষণ মানবিক—কাজেই মহৎ। যে-স্নেহে সে নিজের পেটের ছেলেকে, তার একমাত্র সন্তানকে সহজেই তুলে দিতে পেরেছে ছোট জায়েব কোলে চিরদিনের মত। এই ত্যাগের মহত্বেই তার স্বাভাবিক অন্তর্গূঢ় নিরপেক্ষ-মাতৃত্বের বিকাশ। 'মেজদিদি' বইয়ের হেমাঙ্গিনী, 'রামের সুমতি'র নারায়ণী, 'পণ্ডিত মশাই'য়ের কুসুম, 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মীর মধ্যে এই জগদ্ধাত্রী

মাতৃত্বের দিব্যরূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই।

শরৎচন্দ্র নর-নারী নির্বিশেষে মানুষের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রথম। জীব জগতে 'মানব' নামে জীবটির বিশেষত্ব কোথায় অন্য জীব থেকে—সেদিকে স্থির পর্যবেক্ষণ প্রসারিত করেছেন। সাধারণ জীবত্ব থেকে 'মনুষ্যত্ব' কী কী লক্ষণে ও গুণে বিধৃত, সেটি তাঁর নজরে এসেছে। তার পরে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন—পুরুষত্ব এবং নারীত্বের। মানুষের মধ্যে যে-সকল মানুষে নারীত্ব আছে, তিনি তাদের বেছে নিতে পেরেছেন। দৈহিক দেহযন্ত্রে নারী ও পুরুষ চিহ্নিত মনুষ্য মাত্রেই যথার্থ নারী বা যথার্থ পুরুষ নয়। অনেক নারীদেহধারী মানুষ আছে—যারা কেবলমাত্র শারীরযন্ত্রেই নারী। এই নারীত্ব-বিরহিত স্ত্রী-চরিত্র শরৎসাহিত্যে অনেক আছে। আমাদের বাস্তবজীবনের আশেপাশেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সকলেরই জানা আছে, সব স্ত্রীলোকের মধ্যে নারীত্ব গুণটি থাকেনা। যেমন সব মানুষেই মনুষ্যত্ব নেই। নারীত্বের মূল ডুবে থাকে মমতায়, মাতৃত্বের রসে। এ-নারীত্ব, এ-মাতৃত্ব জৈবিক এবং মানবিক দুই ধরনেরই হতে পারে।

জৈবিক নারীত্বে উপযোগিতা আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে, মহত্ত্ব নেই। বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেনি তাতে, বরং মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করে এই সর্বগ্রাসী জান্তব প্রকৃতি। যেমন দেখা যায় 'বিপ্রদাসে' 'দয়াময়ী'র ক্ষেত্রে।

নারীর মহৎ পরিচয় জৈবিক মাতৃত্বে তত নয়, যত তার মানবিকমাতৃত্বে। এই মাতৃত্বেই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ ঘটে। আর্ত, অসহায় মানুষের প্রতি মমতার প্রাবল্যে আত্মসুখের, আত্মস্বার্থের কঠিন শিকলগুলি আলগা হয়ে খুলে পড়ে। নারী এইখানেই যথার্থ মানুষ। পুরুষের মধ্যেও যখন মানবিক মমতায় আত্মত্যাগের বিকাশ ঘটে তাকেই 'মনুষ্যত্ব' আখ্যা দেওয়া হয়।

জৈব ও মানবিক মাতৃভাবের মধ্যে বিরোধও কোথাও কোথাও এঁকেছেন শরৎচন্দ্র। বিভিন্ন বই থেকে উদাহরণ তুলে এনে এগুলি স্পষ্ট করা বেশ সহজ। এখানে আমি তা থেকে বিরত রইলুম। এই দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে বিশেষ লক্ষণীয়।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে নায়করা প্রায়ই হয়েছে সমাজে অপ্রতিষ্ঠিত, আর নায়িকারা জনশ্রুতক সমাজে পতিতা। যদিও তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী-উদ্ভূত, কিন্তু তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেননা। তাঁরা 'স্টিরিওটাইপ' তো নয়ই আদর্শায়িত চরিত্রও নন। তাঁরা সৃষ্টিছাড়া, খাপছাড়া, অথচ খাঁটি রক্ত মাংসের নির্ভেজাল জ্যান্ত মানুষ।

সমাজসিদ্ধ চালচুলো, শিকড় বাকড় না থাকলেও, শরৎদার নায়ক নায়িকাদের ভেতরটায় অসামান্য মানবিক জ্যোতি প্রভাসিত হয়। তাঁদের হৃদয়

উষ্ণ, মগজ নিরলস, চিন্তা বুদ্ধি প্রখর-শাণিত। অথচ, এঁদের মধ্যে একটা গভীর স্ববিরোধ দেখা যায়।

এঁদের আচরণ কর্ম যদিও মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের দ্বারা আর আবদ্ধ নয়, কিন্তু তা থেকে মুক্তিও পায়নি এঁদের মন। ফলে,—মনের সঙ্গে কর্মের একটা দ্বন্দ্ব প্রায়ই লেগে থাকতে দেখা যায়।

'পিয়ারী' ও 'সবিতা' এঁরা দুজনেই ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত বিক্ষত আধুনিক দ্বৈতবোধের খণ্ডিত চেতনার শিকার। অন্নদাদিদি আর অভয়ার মধ্যেও আশ্চর্যভাবে একাধারে আমরা তথাকথিত মধ্যবিত্ত মূল্য বোধের প্রতি আক্রোশ, অবহেলা দেখি—অথচ, ক্ষেত্রান্তরে এঁরা দুজনেই চরম মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রমাণ দেখিয়েছেন। অন্নদাদিদির স্বামীভক্তি হিন্দুয়ানির চরম; খুনী স্বামীর জন্য কুলত্যাগিনীর কলঙ্ক কিনতে তাঁর বাধেনি। মুসলমানী পোশাকে বাস করতেও না। তেমনি অভয়ার স্বামী-সন্ধান এই একই রকম হিন্দু সতীত্বের পরাকাষ্ঠা। অভয়া শেষ পর্যন্ত হিন্দু সতীর আদর্শে জীবন প্রতিষ্ঠার সবরকম চেষ্টা করে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে, তার পরে নিরাবলম্ব অবস্থায় বাধ্য হয়ে রোহিণীবাবুর আশ্রয় নিয়েছে। কিংবা, আশ্রয় দিতে পেরেছে রোহিণীবাবুকে। শেষতক অভয়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অচল দু-আনিটা, নেহাৎ বাধ্য হয়েই। অভয়ার মধ্যে ছিল যুক্তি বুদ্ধি, মুক্তচিন্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অথচ প্রথমেই তো রোহিণীবাবুকে নিয়ে ঘর পাতেনি। অভয়া খুঁজে বেড়িয়েছে হিন্দু পত্নীর নিয়মমাফিক ধর্মসংগত আইনসংগত অমানুষ স্বামীটিকে।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির মধ্যে এই স্ববিরোধ—এই অবোধ দ্বন্দ্বটা খুবই স্পষ্ট। অবশ্য এর জন্য সময়টার দিকেও একটু ভালো করে তাকাতে হবে। সময়টা কেমন ছিল? সমস্ত সমাজের মন তখন কোন বিশ্বাসের লোহার বর্মে মোড়া ছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে? লেখকও তো তার বাইরের মানুষ নন! কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তা ঠিকই ছিল স্থান কালের ঊর্ধ্বে নিজের জায়গাটিতে, এর প্রমাণ তো সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। এই দ্বন্দ্বই সুস্থ, এই দ্বন্দ্বই তো স্বাভাবিক। সামাজিক মূল্যবোধ ও শিল্পীর ব্যক্তিগত মূল্যবোধের বিরোধ শুধু সাহিত্যকর্মে নয়, শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের জরুরী সিদ্ধান্তগুলির মধ্যেও নিহিত ছিল আমি বেশ ভাল করেই জানি।

শ্রীকান্ত বাইজীর বাড়িতে বাস করতে ভয় পায়না, অথচ বিধবাবিবাহে তার আপত্তি। অভয়ার অবৈধ সংসারে আশ্রয় নিতে তার বাধেনা, কিন্তু তার অবৈধ সন্তানের কথা ভাবতে বুকের ভেতর সংস্কারের গহনে 'তীরবিদ্ধ' হয়।

সংস্কার ও যুক্তির মধ্যে এই দ্বৈত বোধ, এই দ্বন্দ্ব তাঁর বইয়ের চরিত্র

গুলিকে সরলতায় দুর্বলতায় জ্যান্ত মানুষই করেছে। এই জন্যেই তারা বাস্তব, তারা কেউ কোনও দিকের ফাঁকা আদর্শের পুতুল নয়। একমাত্র 'বিপ্রদাস' চরিত্রটি তিনি যেন ইচ্ছে করেই এই স্ববিরোধমুক্ত চরিত্র করে দেখিয়ে দিয়েছেন—কেবলমাত্র আদর্শে কলম ডুবিয়ে চরিত্র আঁকলে সে-চরিত্র কেমন হতে পারে। যত বড় ক্যানভাস-জোড়া বিরাট আর উজ্জ্বল রঙের হোক না সে-ছবি—তা পটের ছবিই হবে, দুর্বলতা না থাকলে জ্যান্ত মানুষ হয়ে উঠবেনা কখনও;—হেসে, কেঁদে, হেঁটে চলে বেড়াবেনা পাঠকের মনের উঠোনে।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাদের মনের ভিতরে ভাবে একরকম, কিন্তু কাজ করে ফেলে আর একরকম। সে যা চায়, আর যা সে যেচে তুলে নেয়—তাতে প্রায়ই মিল থাকেনা।

শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনেও ছিল পরস্পরবিরোধী বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনেক পুঁজি। তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিচরিত্রেও ছিল স্ববিরোধী লক্ষণ। সাহিত্য রচনাতে তিনি মনুষ্যচরিত্রের স্ববিরোধকে বরাবরই স্বীকার করেছেন এবং করেছেন বলেই আমার মনে হয়, শরৎসাহিত্য জীবনধর্মী।

২৪

শরৎচন্দ্রের জীবনের আর একটি তথ্য সম্পর্কে তাঁর জীবিতকাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু কৌতূহলী প্রশ্ন শোনা যায়—শরৎচন্দ্র বিবাহিত কিনা?

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন —সত্যই শরৎচন্দ্রের বিবাহটা একটা বড় ধোঁয়াটে ব্যাপার। কেউ কেউ বলেন তিনি বিয়ে করেছিলেন; আবার অনেকে বলেন, তিনি বিয়ে করেননি, কেবল জীবনসঙ্গিনী জুটিয়েছিলেন।" (পৃষ্ঠা--গ।)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব তাঁদের গ্রন্থে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী না বলে 'জীবন-সঙ্গিনী' ও 'সঙ্গিনী' বলেছেন। এঁদের মতে আমরা যাকে সামাজিক বিয়ে বলি, শরৎচন্দ্র নাকি হিরণ্ময়ী দেবীকে সেরূপ ভাবে বিয়ে করেননি। অবশ্য এঁরা এ-কথা যে কিভাবে জেনেছেন তারও কোনও প্রমাণ দেননি।"—(১০৪ পৃষ্ঠা)

এ বিষয়ে গোপালবাবু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; যে-আলোচনার মূল বক্তব্য, শরৎচন্দ্র আনুষ্ঠানিক বিবাহিতই ছিলেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত, সৎ, হিন্দু ভদ্রসমাজের পক্ষে এই সিদ্ধান্তটিই সম্মানজনক, একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করি। কিন্তু, সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত নয়। কেন নয়, আমি এখানে সেটি সবিনয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে আমি গোপালবাবুর 'গ' পৃষ্ঠায় 'জীবন-সঙ্গিনী জুটিয়েছিলেন' বাক্যটির প্রতিবাদ করি। 'জুটিয়েছিলেন' নয়, 'গ্রহণ করেছিলেন' লিখলে যথোচিত হত। 'জোটানো' বাক্যটি ব্যবহারের মধ্যে যে তাচ্ছিল্যমিশ্রিত অসম্মান নিহিত আছে—যাঁরা শরৎচন্দ্রকে অবিবাহিত বলেন, এবং হিরণ্ময়ীকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী লেখেন, তাঁদের মনে এবং আচরণে শরৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ী দেবী সম্পর্কটির প্রতি এ-ধরনের অসম্ভ্রমবোধ ছিলনা। সত্যের খাতিরে তাঁরা জেনে-শুনে হিরণ্ময়ীদেবীকে বিবাহিত-পত্নী বলে লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা পত্নীর

প্রাপ্য সম্মানই বরাবর দিয়েছেন।

১০৪ পৃষ্ঠায় গোপালবাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও নরেন্দ্র দেবের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলেই উল্লেখ করা স্থির করেছেন।

যতদূর বোঝা যায়, গোপালবাবুর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ—"ব্রজেনবাবু ও নরেনবাবু এ... যে কিভাবে জেনেছেন, তারও কোনও প্রমাণ দেননি।"

দ্বিতীয় কারণ,—"হিরণ্ময়ী দেবী নিজে কথাপ্রসঙ্গে 'আমাদের বিয়ে' ইত্যাদি উল্লেখ করতেন, এবং শরৎচন্দ্রের উইলে হিরণ্ময়ী দেবীকে 'স্ত্রী' বলে উল্লেখ আছে।" (পৃঃ ১০৪)

আমি জানি, এই বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কঠিন এবং গুরুতর। সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানসিকতায় বিভিন্ন জাতের জটিল প্রতিক্রিয়া তুলবে। আমার বক্তব্যের জনপ্রিয়তা থাকবে না জেনেও আমি সত্যভাষণ প্রয়োজন মনে করি।

এবার আমি একে একে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি মোচনের চেষ্টা করব। প্রথমত নরেন্দ্রদেব এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তখন প্রমাণ দাখিল করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল তৎকালীন বাঙালী হিন্দুসমাজ। দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল আইনগত। হিরণ্ময়ী দেবী তখনও জীবিত। এই অসামাজিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে প্রমাণ জাহির করে লিখে ফেলাটা শরৎচন্দ্রের শেষ-উইলের পক্ষে এবং হিরণ্ময়ী দেবীর সামাজিক অবস্থিতির পক্ষে যথেষ্ট হানিকর হতে পারত। তাই তাঁদের প্রমাণসহ লেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরিবারের প্রায় সকলেই জানতেন—ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদেরও অজ্ঞাত ছিল না শরৎচন্দ্র বিধিমতে হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হননি। যে-অনিলা দেবীর কথা গোপালবাবু এপ্রসঙ্গে প্রমাণ হিসেবে এনেছেন সেই অনিলা দেবী যে কোনো-দিন হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্নগ্রহণ করতেন না সে কথা গোপালবাবু নিশ্চয়ই জানেননা; কিন্তু তার সাক্ষী এখনও অনেকেই জীবিত আছেন। অবশ্য তাঁরা এখন সত্য অস্বীকার করলে আমার কোনও উপায় নেই।

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুবিধার ভয়েই ব্রজেনবাবু ও নরেন্দ্র দেব তখন প্রমাণসহ স্পষ্ট ভাষায় শরৎচন্দ্রের অপরিণীতা পত্নী বলে তাঁদের বইতে হিরণ্ময়ী দেবীকে উল্লেখ করে যেতে পারেননি। সম্পত্তির বৈধ অধিকার ইত্যাদি নিয়ে পাছে প্রশ্ন ওঠে,—এইসব অসুবিধা এড়াতে তাঁরা অস্বচ্ছ ভাষা ব্যবহার করে গিয়েছেন। সাময়িককালের বাধা অগ্রাহ্য করে হিরণ্ময়ী দেবীর অকল্যাণ সৃষ্টি করতে চাননি। কিন্তু ভবিষ্যৎকালের কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যা দলিল তাঁরা লিখে রেখে যাননি। জানতেন, যথাসময়ে এ তথ্য প্রকাশিত হবেই

যখন কোনও ব্যক্তির বা পরিবারের কোন অসুবিধার কারণ ঘটবে না।

যে তথ্যগুলি আমার জানা আছে, আমি সেই তথ্য এখানে আজ রাখছি। এতে কারো অনিষ্টের আশংকা নেই।

হিরণ্ময়ী দেবীর নিজের কথাপ্রসঙ্গে 'বিয়ে' শব্দটিকে আনুষ্ঠানিকতার প্রমাণ হিসেবে নেওয়া ঠিক হবে না; তিনি সাধারণ অর্থেই ওটি ব্যবহার করেছেন,—শরৎচন্দ্রের অর্ধাঙ্গিনী হওয়াই তাঁর 'বিয়ে' হওয়া। শরৎচন্দ্র তাঁকে স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদায় সংসারে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আইনগত এই সম্পর্কটিকে সামাজিক আইনে বেঁধে করে নেননি। তাঁর উইলে 'ওয়াইফ' শব্দটি আছে। শরৎচন্দ্র আইনের ঘোরপ্যাঁচ কাটানোর সুবিধার জন্য এটর্নীর পরামর্শ মাফিক ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে নিজের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়তা করে গিয়েছেন তখন সকলেই তা জানতাম। কিন্তু তাঁর কোনও ব্যক্তিগত লেখায় বা চিঠিপত্রে কুত্রাপি কি হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়? 'বড়োবৌ' বলে তিনি স্ত্রীরই সম্মানে তাঁকে ডাকতেন এবং সবার কাছে ঐ নামেই উল্লেখ করতেন। নিজের মৃত্যুর পরে পাছে তাঁকে কেউ অযত্ন বা অসম্মান করে, সেইজন্য তাঁকেই সমস্ত সম্পত্তির জীবন-শর্তে উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীমান গোপালচন্দ্র রায়ের অনলস প্রচেষ্টার ফলে শরৎচন্দ্র বিষয়ে বাঙালী পাঠকের অনেক তথ্য জানা হয়েছে। এ জন্য তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে অন্যমত হতে বাধ্য হয়েছি। শরৎচন্দ্রকে বিবাহিত বলা সহজ, তাতে কোনো গোলমালের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অবিবাহিত বললে অনেক গোলমালের সম্ভাবনা: অনেক শুভার্থীর রাগ হয়ে যাবে। কারণ, আমাদের মনে মনে শরৎচন্দ্রের একটি মানসমূর্তি নিজেদের কালানুযায়ী আমরা গড়ে নিতে চাই। 'সামাজিক' শরৎচন্দ্রের মূর্তিতে যাতে আঘাত লাগে এমন তথ্য সত্য হলেও আমরা শুনতে চাই না। শুনতে পেলে বিরক্ত হই, মনে মনেও মানতে চাই না।

শেষজীবন তিনি অপরিণীতা একজনের সাহচর্যে কাটিয়ে গেলেন, এটা মনে করতেই অনেকের ঘৃণাবোধ হবে; তাই হয়তো কল্যাণীয় গোপালচন্দ্র ওদিকটায় যেতে চাননি। তাঁর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য শরৎচন্দ্রকে সমাজে শ্রদ্ধেয় করে রাখা।

আমারও উদ্দেশ্য তাই। কিন্তু সত্যের মাধ্যমে না এলে এ শ্রদ্ধা স্থায়ী হবে না। আমার মনে হয়, সত্য-তথ্য নিজেদের অমনোমত হলেও, অপরিবর্তিত রেখেই বলে যাওয়া ভাল। এ-তথ্যের স্বাদ আজ আমাদের যতই তিক্ত লাগুক, এর মধ্যে ব্যক্তিমানুষটির অস্তিত্বের যে সত্যপরিচয় আছে, তার পরিবর্তন না ঘটানো সঙ্গত। শরৎচন্দ্র যদি কেবলমাত্র একটি সামাজিক ব্যক্তি

হতেন, তা হলে আমি কখনই এই তথ্য প্রকাশ করতুম না, বরং এ তথ্য প্রকাশের বিরোধীই হতুম। যা চাপা পড়ে গেছে, তাকে খুঁড়ে তোলা কুরুচি বলেই গণ্য করতুম। শরৎচন্দ্র প্রধানত একজন প্রতিভাবান লেখক। তিনি 'শিল্পী', সেইজন্যই তাঁর জন্মোৎসব শতবার্ষিকী সারা দেশের পর্বানুষ্ঠান। তিনি সামাজিকব্যক্তি পরের কথা। এই শিল্পীর জীবনের সত্যকে মিথ্যা দিয়ে মাটি চাপা দিলে তাঁর ক্ষতিই করা হয়। এ সম্পর্কে আমার যা জানি, সব কথা খুলে বলা আমার পক্ষেও সম্ভবপর নয়। কারণ আমিও তো অনেক সেকালেই জন্মেছি, সেকালের মধ্যেই মন ও রুচি পুষ্ট হয়ে উঠেছে। কালের সঙ্গে এগিয়ে চলার মানসিক শিক্ষা আজীবন রবীন্দ্র আওতায় লাভ করলেও, একালের মত আবরুহীন হয়ে ওঠার শক্তি অর্জন করতে পারিনি। যতটুকু লিখছি তা অবিকৃত সত্য-তথ্য, তার বাইরের খবরটুকু আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতের গবেষকরা নিজেরা খুঁজে নেবেন, যা অনুক্ত রইল।

শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি কখনও শুনেছেন--তিনি আনুষ্ঠানিক বিবাহ করেছেন? শরৎচন্দ্র কখনও কারো কাছে এ কথা উচ্চারণ করেননি আমি জানি। এ বিষয়ে তিনি একান্ত কঠোর ও সতর্ক ছিলেন। বার্মায় তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল বলে যা প্রচারিত এবং স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' বইতে যে-বিষয় তিনি লিখে গিয়েছেন, সে তথ্যটি শরৎচন্দ্রের নিজের মুখ থেকেই আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে একত্রেই শুনেছি। গোপালবাবু তাঁর বইতে কেন যে লিখেছেন– "নরেনবাবু বলেছিলেন —শরৎচন্দ্রের বিবাহকাহিনী ও তাঁর পুত্রের কাহিনীটিও আমি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছেই শুনেছিলাম।" (শরৎচন্দ্র, ১ম খণ্ড, ৯৭ পৃঃ)

এখানে আমার বিস্ময় ঠেকেছে। এই তথ্যটি তো শরৎদারই নিজের মুখে নরেন্দ্র দেব ও আমার একত্রেই শোনা। তথ্যটি শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পরে লিখতে বসেও উনি কুণ্ঠিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন আমি জানি। জলধরবাবুর সঙ্গে হরিদাসবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছেন। তারপরে এই তথ্যটি বইতে দেবেন কিনা এই নিয়ে শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই প্রকাশবাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন। প্রকাশবাবুও এ তথ্যটি জানতেন। সন্তান ও শান্তি দেবী প্লেগে মারা যান এ তথ্য প্রকাশবাবু, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, এঁরা সকলেই জানতেন। প্রকাশবাবু বলেছিলেন, "এগুলি পরে হারিয়ে যাবে, আপনি লিখুন। আমি এ তথ্য জানি; আপনার বইতে লিখে দেবো।" তিনি নরেন্দ্র দেবের শরৎচন্দ্র বইতে লিখে দিয়েওছিলেন–"নরেনবাবু আমাদের পরিবারের বহুদিনের বন্ধু। দাদার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী তিনি লিখেচেন আমরা তা দেখেছি। এর মধ্যে অসত্য বা অতিরঞ্জন নেই।'" (স্বাক্ষর : প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

হিরণ্ময়ী দেবী ও শান্তি দেবী কাউকেই বিবাহিতা পত্নী বলে বইতে লেখা নরেন্দ্র দেব ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কেন যে সম্ভব হয়নি, গোপালবাবুকে আমার স্বামী বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। কেন যে তবুও একটি ভ্রান্ত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তা অনুমান করতে পারি। বর্তমানকালের সংস্কারের সীমায়িত পরিসরের মধ্যে থেকে তিনি এর দ্বারা সমকালীন পাঠকসমাজের মনের তৃপ্তি ও স্বস্তি বিধানের চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়।

শান্তি দেবী সম্পর্কে নরেন্দ্র দেবের বইতে এইরকম উল্লেখ আছে :— "শেষে চক্রবর্তী ধরে বসলো, এতই যদি তোমার প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত-কুল রক্ষা করো না।

অগত্যা শরৎচন্দ্রকেই সেই মেয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাকে নিয়ে সুখীই হয়েছিলেন এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখন তাঁর পাছে পাছে ফিরছিল। রেঙ্গুনে আবার দারুন প্লেগের মহামারি দেখা দিলে—শরৎচন্দ্রের স্ত্রী পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল।" (শরৎচন্দ্র—লেখক নরেন্দ্র দেব, ১ম সংস্করণ, ৭২-৭৩ পৃঃ)

এই লেখাটি লেখার সময়ে সুরেনবাবু এবং প্রকাশবাবু বলেছিলেন— "উনি যে কখনও কাউকে বিবাহ করেননি, উনি ব্যাচেলার এ তো আপনারা ভালোই জানেন। লিখিতভাবে ওঁকে বিবাহিত বলে প্রচার করা মিথ্যাচার, অথচ উনি বিবাহিত নন একথা কোনও মতেই আমরা বলতে পারবো না। বলা চলবে না। কেন যে পারবো না, বুঝতে পারছেন। এ সম্পর্কে বিবাহিত প্রচার হওয়াটাই আমাদের পক্ষে ভাল। কারণ, আমাকে তো ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তবে—বার্মায় যে তাঁর বিয়ে হয়নি, সেটা প্রকাশ হলে ক্ষতি হবে না।" এই কথাবার্তা প্রকাশবাবুর সঙ্গে আমার স্বামীর হয়েছিল শরৎ-চন্দ্রের তিরোধানের কয়েক মাস পরে তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে দোতলার পড়ার ঘরে বসে আমার সামনে। আমি স্বকর্ণে এই কথাবার্তাগুলি শুনেছি! এ-সকল কথা বাজারে ঢাক পিটে বলার মত নয়। যথেষ্ট সংযম ও ধীর বিবেচনার সঙ্গে ব্যাপারটি তখন সাবধানে নাড়াচাড়া করা হত।—এটিও আমরা সকলেই জানি। তাঁর পরিবারের লোকেরা নিশ্চয় এ কথাগুলির সত্যতা মানবেন আমার বিশ্বাস আছে। কারণ, আজ সমাজ-মন পরিবর্তিত এবং পারিবারিক সংকোচের বা ক্ষতির প্রশ্ন নেই। গোপালবাবুর বোধহয় ভুল হয়ে থাকবে—আমার স্বামী যে-তথ্য শরৎচন্দ্রেরই মুখে শুনেছিলেন তা গিরীন সরকারের কাছে তিনি পেয়েছেন বলবেন কেন?

শরৎচন্দ্র বার্মায় যে শ্রমিক পল্লীতে বাস করতেন, তখন সেখানে একটি

অলিখিত আইনবিধি প্রচলিত ছিল। স্বামী-স্ত্রীরূপে নরনারী প্রকাশ্য বসবাস কিছুদিন করলে তারা তাদের পরিচিত সকলকার কাছেই স্বামী-স্ত্রীরূপে গণ্য হত এবং সেইরকম যথোচিত সহজ ব্যবহারও পেতো। যে বাঙালী মেয়েটিকে শরৎচন্দ্র অত্যাচারী দুশ্চরিত্র বাপের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই মেয়েটি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র যেতে রাজী হয়নি। সে মৃত্যু পর্যন্ত শরৎচন্দ্রেরই আশ্রয়ে সুখেই ছিল। এ কথা শরৎচন্দ্রেরই মুখে শোনা। তিনি অন্যত্রও এ গল্প করেছেন। তার গর্ভে শরৎচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান হয়ে কয়েক মাস মাত্র বেঁচেছিল। প্লেগে মাতাপুত্র দুজনেরই মৃত্যু হয়।

নিজের পুত্রসন্তান সম্পর্কে তাঁর মুখে একজায়গায় একবার উল্লেখ শোনা গিয়েছিল। জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে এ সম্পর্কে পণ্ডিচেরীপ্রবাসী নলিনীকান্ত সরকার মশায় হয়তো তাঁর জানা থাকলে সাক্ষ্য দিতে পারবেন: অন্যেরা তো ইহলোকে নেই।

ভারতী-গোষ্ঠীর অন্যতম কবি গিরিজাকুমার বসুর একমাত্র সন্তান অমিয় আঠারো বছরে (বুধু) টাইফয়েড রোগে মারা গেলে সমগ্র ভারতীগ্রুপের সাহিত্যিকরা সেই পুত্রশোকে সমষ্টিগতভাবে বন্ধুর এই বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। গিরিজাবাবু ও তাঁর স্ত্রী তমাললতা বসুর সঙ্গে শরৎচন্দ্র দেখা করতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—"তোমরা তো ভাগ্যবান পিতামাতা, আঠারো বছর ধরে পুত্রসুখ উপভোগ করে—তার পরে তাকে হারাবার যন্ত্রণা অনুভব কোরছো—আমি তো পুত্রসুখ উপলব্ধি করতে না করতেই পুত্রশোক কাকে বলে টের পেয়ে গেলুম। ছেলেকে পেতে না পেতেই ছ' মাসের মধ্যেই আচমকা মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে গাছ-সমেত ফুলটা উপড়ে নিয়ে উড়ে গেল। তখন আমি কল্পনায় ওর কচিমুখে 'বাবা' ডাক প্রথম যেদিন শুনবো—সেদিন কেমন লাগবে ভেবে আনন্দে অধীর হচ্ছিলুম' তোমরা তো জীবনের কাছে অনেকখানিই পেয়েছো। ছেলেকে শৈশব থেকে বাল্যে—বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে তারুণ্যে হাতে করে নেড়েচেড়ে এসেছো। এই অভিজ্ঞতার উপলব্ধির দাম তো বড়ো করেই ধরে নেবে প্রকৃতি বা মহাকাল। দুঃখ আজ যা পেলে—এত দিন ধরে পেয়েছোও তো তেমনি দামী আনন্দের উপলব্ধি।"

সেদিন গিরিজাবাবুর বাড়ীতে আমার স্বামী এবং ভারতী গ্রুপের আরও বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ঐ অদ্ভুত-রকম সান্ত্বনার ভাষা আর যুক্তির নতুনত্বে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা ঐদিনের ঐ কথাগুলি নিয়ে অনেক সময়েই আলোচনা করতেন। প্রেমাঙ্কুরবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রসিয়ে গল্প করতেন। আমার স্বামী বলতেন-- "শরৎদার সেদিনের জলভরা চোখে সেই কথাগুলো কিন্তু তখন আমাদের

একটুও অযৌক্তিক ঠেকেনি, এমন গাঢ় গলায় তিনি কথাগুলো বলেছিলেন।"

'দেশ' পত্রিকায় গোপালবাবু এবং আরও কেউ কেউ প্রামাণিক তথ্যের দাবীতে সোচ্চার হওয়ায়, আমি আমার জানা আরও কিছু বিষয় লিখতে বাধ্য হলুম।

হিরণ্ময়ী দেবীর পিতা কৃষ্ণদাস অধিকারী মাধুকরী বৃত্তিজীবি বোষ্টম ছিলেন। ঝুলি ও খঞ্জনী নিয়ে তিনি মাধুকরীতে বেরুতেন। তাঁর কোনও আত্মীয়স্বজন ছিল না। হিরণ্ময়ী চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়সে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে কলকাতায় তাঁর বাবা পেঁাছে দিয়েছিলেন কিনা, অথবা অন্য কারুর সঙ্গে এসেছিলেন, জানা যায়নি। তাঁর মার খবব ছিল না, তিনি মারা গিয়েছিলেন কিংবা অন্যত্র কোথাও চলে গিয়েছিলেন কিনা শুনিনি। কৃষ্ণদাসের বোষ্টমী ছিল না। এ সকল তথ্য স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ইভনিং ক্লাবে এবং গুরুদাস এণ্ড সন্সের দোকানে হরিদাসবাবু, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতির সামনে একাধিকবার গল্প করেছেন। আমার তাঁদের মুখে শোনা।

২৫

হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আনুষ্ঠানিক কিংবা আইনগত বিবাহ যে কোনওদিন হয়নি এটি আমি জেনেছি আরও এই সূত্রে,—দিনের পর দিন শরৎচন্দ্রকে তাঁর প্রকাশক হরিদাসবাবু ও ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধর সেনকে বোঝাতে দেখেছি—একটি ম্যারেজ-রেজিস্ট্রেশনে সহি করে কাগজটি হরিদাস-বাবুর কাছে গচ্ছিত রাখার জন্য। এই প্রয়োজনে অনুনয় বিনয় করতে দেখেছি এ'দেরকে, নিরুত্তর নির্বিকার শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছোটভাই সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বলতেন, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানায় তাঁরা একদিন রাত্রে নিরালায় একটি সই করিয়ে সেই কাগজখানি তাঁদের কাস্টডিতে তুলে রেখে দিতে চান। তাহলে ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের পরে কেউ কোনও আপত্তি তুলে হিরণ্ময়ী দেবীকে অসুবিধায় ফেলতে পারবেন না। প্রকাশকরা শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা সফল রাখতে পারবেন আইনের পথে। তাঁর লোকান্তরের পরে হিরণ্ময়ী দেবী যতদিন জীবিত থাকবেন, শরৎচন্দ্রের বইয়ের আয়ে তিনি উত্তরাধিকারিণী থাকলে তাঁকে কেউ অস্বীকার বা অযত্ন করতে পারবে না এই শরৎচন্দ্রের অনুমান ছিল।

এ সম্পর্কে আমার স্বামী নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে জলধর সেন মশায় মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন, একাধিকবার শুনেছি। বিষয়টি কখনও কারুর সামনে আলোচিত হত না এবং বেশি নাড়াচাড়াও হত না। শরৎচন্দ্রের জেদের অনমনীয়তা উল্লেখ করতে হলে ঐ বিষয়টি ইঙ্গিত ইশারায় উল্লেখ করে এ'রা বলতেন—অদ্ভুত একরোখা মানুষ। একটা কাগজে সই করিয়ে রাখতে কিছুতেই পারা গেল না। এ সম্পর্কে জীবিত সাক্ষীদের মধ্যে আমি প্রকাশক জি ডি চ্যাটার্জি এণ্ড সন্স-এর বর্তমান মালিকদের অন্যতম স্বর্গীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে পারি।

শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হিতার্থী বন্ধুরা এটি জানতেন। তৎকালীন জীবিত আত্মীয়দেরও অজানা থাকার কথা নয়। তবে সকলেই অজানিতের ভান করে থেকেছেন, যেহেতু—এ ছাড়া তখন অন্য উপায় ছিল না। আমরাও না-জানার ভানে থাকিনি তা নয়। কারণ হিরণ্ময়ী দেবীকে কেউ অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখুক বা শরৎচন্দ্রের সাবলীল পারিবারিক-জীবনে কোনও ইঁট পাটকেল এসে পড়ুক, এটি আমাদের কারুরই প্রার্থিত ছিল না। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হিরণ্ময়ী দেবীকে বৌদি বলে সম্মান করেছি, ভালও বেসেছি। তিনিও আমাদের দুজনকে অকৃত্রিম স্নেহ করতেন। প্রকাশবাবু, সুরেনমামা, অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী এটি ভালই জানতেন আমি জানি।

হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্র পরিণত বয়সে তাঁর আহারাদি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, রান্নাকরা, সংসারের পরিচর্যার জন্য ১৯১২ খৃঃ-তে কলকাতা থেকে বর্মায় নিয়ে যান। যখন তাঁকে নিয়ে যান, তিনি একান্ত নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন সত্য। মেদিনীপুরে তাঁর বাপের বাড়ি ছিল এও সত্য। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে থাকতেন, তখন হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাকে মেদিনীপুরে মাসিক পাঁচ টাকা করে মনিঅর্ডার করা হত গুরুদাস চ্যাটার্জি পুস্তক সংস্থার বইয়ের হিসাব থেকে। এই মনিঅর্ডার যেত মেদিনীপুরে পাঁচ টাকা, আর কাশীতে দু টাকা, শরৎচন্দ্রের সইমা ('বুড়ীমা' নামে যাঁকে গোপালচন্দ্র রায়ের বইতে পাওয়া যায়,) তাঁর নামে।

নিরীহ প্রকৃতি হিরণ্ময়ী দেবীর ব্যবহার ও আচরণ দেখে কারুর সন্দেহ হওয়ার উপায় ছিল না, তিনি বিবাহিতা নন। কলকাতায় শরৎচন্দ্র তাঁকে কারো বাড়িতে কখনো পাঠাতেন না। নিমন্ত্রণ এলে এড়িয়ে যেতেন– বলতেন, গাঁয়ের মানুষ, বড় ভীতুপ্রকৃতি—শহরে কারো বাড়ী যেতে চায় না। আমিও সেটা জোর করিনে। ওকে নিয়ে যেতে জোর করে তোমরা আর ওকে মুশকিলে ফেলো না।

শরৎচন্দ্রকে নার্সিংহোমে ভর্তি করার আগের দিন সন্ধ্যায় হরিদাসবাবু ও এটর্নী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র আমাদের বাড়ীতে এসে একটি গোপন জরুরী পরামর্শে বসেছিলেন। সেখানে আমার স্বামীও উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের অপারেশনের আগে তাঁকে দিয়ে একটি উইল করিয়ে রাখা জরুরী, এই নিয়ে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এটর্নী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ কুমুদশংকর রায় প্রভৃতি দায়িত্বশীল-হিতার্থীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। সে উইল শেষ পর্যন্ত নার্সিং-হোমেই প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নার্সিংহোমে যাত্রার আগের দিন বিকেলে শরৎদার বাড়িতে অনেক লোক সমাগমের জন্যে পরামর্শে বসার

অসুবিধা বোধ করায় হরিদাসবাবু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র হিন্দুস্থান পার্কে আমাদের বাড়ি নিরিবিলি হবে বলে চলে এসেছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলামনা, অন্দরে অসুস্থ শরীরে শয্যাশায়ী ছিলাম। দোতালার ঘরে পরামর্শ হয়েছিল। বোধ হয় সেখানে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের অগ্রজ কিরণশঙ্কর রায়ও ছিলেন। আমি তখন খুবই অসুস্থ, তাই উপস্থিত ছিলাম না, স্বামী ছিলেন। তাঁর মুখে সেইদিনই এই কথা শুনেছি—শরৎদা তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও বইয়ের ইনকাম মোটামুটি সবটাই বৌদির নামে জীবনকাল-শর্তে দিয়ে যেতে চান—যাতে তাঁর অবর্তমানে বৌদিকে কেউ তাচ্ছিল্য না করে। অন্যান্য আত্মীয় অনাত্মীয় গরীব দুঃখী অল্পবিস্তর অনেকের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থার কথাও বলেছেন। কিন্তু কিছুতেই ম্যারেজ-রেজেস্ট্রীর কাগজে সই করাতে রাজী করানো যায়নি। শক্ত গলায় বলেছেন—বড় বউকে কেউ যদি কোন ঘা দিতে আসে—সেটা ব্যুমেরাং হয়ে তাকেই উল্টো আঘাতে ফেলবে। তোমাদের কোনো ভয় নেই। রেজিস্ট্রি ফেজেস্ট্রি করতে চাই না। সারা জীবনে যা করলুম না—মরবার আগে সেটার ভণ্ডামি করতে পারবো না।

এই তথ্যটি প্রকাশের উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎকালের মানুষদের জন্য। যাঁরা ব্যক্তি শরৎচন্দ্র বাস্তবে যথাযথ কেমন ছিলেন, জীবনে কি করেছিলেন, কি পেয়েছিলেন, আর পাননি জানতে আগ্রহী হবেন, তাঁদের জন্য। সত্য-তথ্য সঠিকভাবে থাকলে মানুষটিকে চেনা সেদিন সহজ হবে। তিনি প্রধানত শিল্পী-মেজাজের মানুষ ছিলেন।

শরৎচন্দ্র ভালবাসা, বিবাহ, নরনারীর মিলন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কতগুলি নিজস্ব অভিমত পোষণ করতেন। তিনি ব্যবহারিক জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনের সঙ্গে প্রেম এবং বিবাহকে একাকার করে গ্রহণ করেননি। সাহিত্যেও নয়, জীবনেও নয়।

তাঁর নিঃসঙ্গ একক জীবনে একজন সঙ্গিনী বা শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজন ছিল সেবাযত্ন দেখাশোনা তদারকের জন্য। হিরণ্ময়ী দেবী তাঁকে শুশ্রূষায় আরাম দিয়েছিলেন; ঘরগৃহস্থালির দায়িত্ব বহন থেকে অব্যাহতি দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের চিন্তাজগতের সঙ্গিনী বা মনন-জগতের শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন না কোনোদিন। গৃহস্থালির ভার নিয়ে যত্নে সেবায় আর শ্রদ্ধাভক্তিতে তাঁকে সন্তোষে রেখেছিলেন বরাবর। প্রতিদিন সকালে তাঁর পাদোদক বা চরণামৃত মুখে ঠেকিয়ে তারপরে হিরণ্ময়ী দেবী উপবাস ভঙ্গ করতেন। আমরা সে দৃশ্য অনেক দিন অনেকবারই দেখেছি এবং শরৎদার তাই নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাস শুনেছি। একদিনের বর্ণনা রাখি।

রবিবারের সকাল। তখন বেলা বারোটা প্রায় বাজে। বালিগঞ্জে দোতালায় পড়ার ঘরে শরৎদা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে আছেন অনেকক্ষণ। দরজার সামনে বউদি এসে দাঁড়ালেন। চওড়া লালপাড় তসরের শাড়ি, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, সাদা শাঁখা আর একগোছা ঝকঝকে সোনার চুড়ি। হাতের পাতায় ছোট্ট একটি পাথরের বাটি কিংবা কাঁসার বাটি, জলভরা। একটু লজ্জা-লজ্জা অপ্রস্তুত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। শরৎদা ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—ও-ও-ও-ও—এইবারে 'পা-দোক' নেবে বুঝি তুমি? এরা রয়েছে বলে লজ্জা হচ্চে?...লজ্জার কী আছে? তুমি কতো ভক্তিমতী আদর্শ হিন্দুনারী—একটু দেখেশুনে শিখে নিক না রাধু। ওরা তো সব একেলে বিবি-মেয়ে! তোমার ভক্তির ফিচেলি বুদ্ধিটা ওকে একটু চুপি-চুপি শিখিয়ে দিও বরং। দরকার পড়লে কাজে লাগতেও পারে। নাও, নিয়ে এসো তোমার জল। তা বেলা বারোটা বাজতে চললো—এত বেলায় তোমার পুজো আহ্নিক সারা হলো? তুমি রোগে ভুগবে না তো কে আর ভুগবে? কই? আনো না তোমার বাটি!—অপ্রতিভ মুখে হিরণ্ময়ী দেবী এগিয়ে এসে নিচু হয়ে জলের ছোট্ট বাটিটা শরৎচন্দ্রের পায়ের কাছে ধরলেন—শরৎদা চটির ভেতর থেকে একটি পা বার করে বাটির জলে বুড়ো আঙুলটি ছুঁইয়ে পা-টি আবার চটিতে ভরে রাখলেন। বউদি শরৎদাকে প্রণাম করে বাটি হাতে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শরৎদা হাসতে হাসতে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ-তির্যক কণ্ঠে বললেন—ওটি পতিভক্তি মোটেই নয়,—গরু বেঁধে রাখার খুঁটি। পাদোদক পান করে তারপরে উনি দৈনন্দিন জলগ্রহণ করেন। এই ওঁর দীর্ঘ-কালের ব্রত। যতক্ষণ না সতী পতির চরণামৃত পান করেন, ততক্ষণ তিনি শক্তি পান না সারাদিন সংসার ঠেঙাবার। ভূদেব মুখুজ্জের বই চোখেও দেখেনি তোমার বউদি, পড়া দূরে থাক—অথচ সেই বইয়ের পাতা ফুঁড়েই মানুষটা বেরিয়ে এসেচে—তোমরা মিলিয়ে দেখে নিতে পারো।

—বলো কেন যন্ত্রণাভোগের কথা,—বার্মায় যখন ছিলুম, ওর উৎপাতে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে হত।...দু-চার দিন যে বাড়ির একঘেয়েমি কাটাতে কোথাও ডুব মেরে থাকবো—তার উপায় ছিল না।...ওর পতিভক্তি নিয়ে সেখানে সব্বাই হাসি-মস্করা করতো। ওর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দু-একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও নেশা করে পড়ে থাকার উপায় ছিল না। চটকা ভাঙলেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে—একটা মানুষ উপোস করে ঘরের মেঝেয় লম্বা হয়ে পড়ে আছে।...সদর দরজার কড়া নাড়লেই দরজা খুলে যাবে—সামনে থাকবে বোকা-বোকা ভীতু চোখে একটা উপোসী শুকনো

মুখ।...রাগারাগি বকাঝকা অনেক করেচি।...কোনো ফল হয়নি। কৈফিয়তও চায় না—রাগও করে না—শুধু ভাবনাভয়ে ভরা ভীতু চোখে তাকিয়ে থাকে।... এমনি করে ওই নির্বোধ মুখ্যু মানুষটি চালাক মানুষটাকে জব্দ করে ছেড়েচে। যতোটা বোকা দেখায় ওকে, আসলে তা কিন্তু নয়।

২৬

শরৎচন্দ্রে রবীন্দ্রনাথে সম্পর্ক কেমন ছিল এই প্রশ্নটি আমাকে অনেকে অনেকবার করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ধারণা বোধ হয় লিখে যাওয়া উচিত।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এবং তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কখনও কোনও দিন বিরুদ্ধতা আমি দেখিনি। ওঁর সাহিত্য সম্পর্কে বরং কবিকে উজ্জ্বল আশা আর আনন্দই প্রকাশ করতে দেখেছি। ব্যক্তি মানুষটি সম্পর্কে জানবার উৎসুক আগ্রহ তাঁর ছিল বেশ বোঝা যেত। যদিও কবি শরৎচন্দ্রের কাছে আঘাত পেয়েছিলেন যথেষ্ট। তাঁর মুখে কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা শুনিনি।

শরৎচন্দ্রের জীবন যে গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে দেশে বিদেশে বিচরণ করে ঐ সব জায়গার সাধারণ মানুষদের ঘনিষ্ঠসংস্রবে বেড়ে উঠেছে, এটি গুরুদেব শরৎচন্দ্রের সৌভাগ্য বলেই মনে করতেন। শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা বা অনুকম্পার ভাব কখনও দেখিনি।

পথের দাবী উপন্যাসটি প্রিচিং অব সিডিশন-এর কোপে ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করে দিলে শরৎচন্দ্রকে তাঁর কয়েকজন বন্ধু পরামর্শ দেন, রবীন্দ্রনাথকে বইখানি পড়তে দিয়ে শরৎচন্দ্র নিজে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে আসেন, কবি যেন বই বাজেয়াপ্ত করার একটি প্রতিবাদ সংবাদপত্রে লিখে পাঠান। শরৎচন্দ্র সেই মত কাজ করেন। পথের দাবী পড়ে কবি শরৎচন্দ্রকে তাঁর অনুরোধের জবাবে যে চিঠি লেখেন—সে চিঠি এখন ভারতবর্ষে বহু-বিদিত ঐতিহাসিক চিঠি। ১৩৩৩ সালের কথা, অর্ধশতাব্দী আগের ঘটনা।

শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্র-বিমুখতার প্রথম সূত্রপাত এইখানে। উনিশশো সাতাশ দশই অক্টোবর তারিখে শরৎদা আমাকে লিখেছিলেন—

"একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল, তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা

প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয়, পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে, গভর্নমেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু, সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্নমেণ্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্নমেণ্টকে যা তা নিন্দা-বাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।

ভাবতে পারো, বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে, কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে।"

চিঠি ছাপাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেননি। এটি সঠিক কথা নয়।

শরৎচন্দ্রের এই চিঠি তখন আমার মনকে খুবই বিস্ময়ে আর গভীর দুঃখে সংকুচিত করে ফেলেছিল; কারণ কবির মন ও চিন্তা সম্পর্কে আমাদের মনের ধারণা ছিল সীমাহীন নির্ভরশীল। স্বদেশের সম্বন্ধে তিনি যে দেশ-প্রেমী—ভারতীয়দের মধ্যে কারো চেয়ে পিছনের সারির মানুষ নন, বরং দূর-গামী চিন্তায়, স্থির শুভবুদ্ধিতে এবং নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারে তিনি দেশবাসী স্বদেশীওলাদের অনেকের চেয়ে অগ্রগামী মানুষ, এটি আমার বাবার স্থির ধারণা থেকে আমারও মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। আমার দৃঢ়মূল বিশ্বাসে শরৎদার চিঠি ধাক্কা দেওয়ায় আমি বিভ্রান্ত হয়ে চিঠিখানি নিয়ে আমার বাবাকে দেখিয়েছিলুম।

বাবা শরৎদার চিঠিখানি পড়ে বলেছিলেন কবি এখানে নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচারকের চেয়ারে বসে কথা বলেছেন। তিনি নিরপেক্ষ জজের মন নিয়ে মতামত লিখেছেন। এখানে তিনি ভারতীয় বা ইংরেজ কারুর সপক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কৌঁসুলির যুক্তিতে কথা কননি। শরৎবাবু কবিকে নিজের কৌঁসুলি করে পেতে চেয়েছিলেন, কবি এসেছেন জজ হয়ে।

বাবা শরৎদার চিঠিখানি বার বার পড়েছিলেন। পড়ে আমার মত বিচলিত হননি, তিনি নিজে বিচারক ছিলেন। চিঠির এই দু' তিন পংক্তি তিনি কণ্ঠে উচ্চারণ করে একাধিক বার পড়লেন—"তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্নমেণ্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু

না বলা তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্নমেণ্টকে যা তা নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।"

বাবা সেদিন বলেছিলেন—দেশ কালের সীমায় বন্ধ থেকে কবি তাঁর নিজের দেশ, নিজেদের স্বার্থের ভিত্তিতে উকীল হয়ে পক্ষ-সমর্থন করেননি। ও'র মনঃপ্রকৃতি তো দেশ কালে সীমায়িত নয়, এ চিঠিতে তাই তিনি এসে পড়েছেন এজলাসের উঁচুতে, জজের চেয়ারে। তাঁর দৃষ্টি দেশে কালে নেই সত্যে আর ন্যায়ে নিবদ্ধ। এর ফলে নিজেদেরই শত্রুপক্ষের জিৎ আর নিজেদের হার হয়ে যায়—তাঁর খেয়ালে আসেনি।

বাবা সেদিন যা বলেছিলেন, তার মূল তাৎপর্য যা মনে আছে, লিখলুম। তাঁর মুখের ভাষা সেদিন বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রিত ছিল। সেই সুগৌরবর্ণ সৌম্য শান্ত মুখশ্রী উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে, কপাল আয়নার মত চকচক করছে—কবির প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসের অভিব্যক্তি—আমার স্মৃতিতে একটি দামী ছবি হয়ে আছে।

বাবা দুঃখ করে এ-ও বলেছিলেন—কিন্তু ভুল সময়ে, পরাধীন দেশে এ ধরনের সত্য উচ্চারণ দেশের লোক সইবে না। স্বার্থে ঘা লাগলে এরা সত্যকে দেখতে রাজী হবে কেন? এরা কবিকে ক্ষমা করবে না। এই কথাগুলির অন্য অর্থ করে কবিকে ইংরেজ-ভীত, ইংরেজ-তোষক, স্বার্থপর অপবাদ দেবে। একেই উনি দেশবাসীর চৈতন্যে অস্পষ্ট—এখন আরও বেশি ও'কে ঝাপসা করে তুলবে অনেকে মিলে।

বাবার উজ্জ্বল মুখ চিন্তা-বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। বলেছিলেন—শরৎ-বাবুর চিঠিতেই তো বোঝা যাচ্ছে উনি কবির প্রতি খুবই বিরূপ হয়ে উঠেছেন। তুমি বিচলিত হোয়ো না। রবিবাবু যে-লেভেলের মানুষ, তুমি যেন তাঁকে দেশপ্রেমী নন মনে কোরো না। অপরাধ হবে।

আমি শরৎদার সঙ্গে পথের দাবী সম্পর্কে গুরুদেবের চিঠির বিষয় নিয়ে বহুদিন পরে অনেক দিন অনেক আলোচনা করেছি। আমার বাবার মতামতের কথা প্রথম যেদিন তাঁকে বলি, সেদিন তাঁর মন মেজাজ ভাল ছিল। তিনি যে গুরুদেবের বিরোধী নন সেই কথা সেদিন নিজেই বলেছিলেন গুরুদেবের একটি নতুন নিবন্ধ পড়ে। সেই সময়ে আমি বাবার মতামতের কথা তাঁকে বিশদভাবে বলি। তিনি স্তব্ধ হয়ে শুনলেন। একটিও কথা কইলেন না—অসহিষ্ণু প্রতিবাদ করে উঠলেন না। যা তাঁর বরাবরের অপছন্দ, সে সম্বন্ধে কথা উঠলে গোড়াতেই অসহিষ্ণু প্রতিবাদ করে সেটি থামিয়ে দিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেদিন তিনি শান্ত নীরব হয়ে সব কথা শুনলেন। একটিই মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার বাবা তো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাই না? আমি ভয়ে ভয়ে সম্মতি ইঙ্গিত করে তাঁর বিরূপ মন্তব্য আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের

অপেক্ষা করেছিলুম। শরৎদা সেদিন কোনও মন্তব্য করেননি, নির্বাক ছিলেন।

পথের দাবীর প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে লেখা চিঠি নিয়ে আজও রবীন্দ্রনাথকে ভীরুতা, স্বার্থপরতা ও ইংরেজতোষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে শুনি। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের বিভ্রান্তি ঘটেছিল একটি জায়গায়। তিনি ইংরেজ-রাজশক্তির সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন—শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজ রাজশক্তি হয়তো পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের চেয়ে সত্যই সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল —কিন্তু আমাদের দেশে যে-রাজশক্তি ঔপনিবেশিক ভিত্তিতে শাসনদন্ড গায়ের জোরে তুলে নিয়েছে—তাদের সহিষ্ণুতা বা ধৈর্যের প্রশ্নই ওঠে না। এখানে কবি খেয়াল করেননি গোড়াতেই ঔপনিবেশিক শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে—যেটিতে মূলতই তাঁর প্রবল আপত্তি। শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ এখানে অমূলক নয়। রবীন্দ্রনাথের নিরপেক্ষ সত্য উচ্চারণ স্থান কাল ও পাত্রে সেদিন অপ-প্রয়োগই হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর মত মহৎ মনীষার প্রতি এই নিয়ে অন্য ধরনের দোষারোপ আমাদের নিজেদেরই ব্রণসন্ধানী মক্ষিকাবৃত্তির প্রমাণ মাত্র। পূর্বে মুনিদেরও যেমন মতিভ্রম হয়েছে, আজও ঋষি-মানুষেরও কখনও অঙ্কে ভুল দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনবধানতা ঘটেছিল একটি মূল বিন্দুতে। তাঁর বিচারের সেটিই হয়ত ত্রুটি।

শরৎচন্দ্র দেশবাসীর কাছে যতখানি নিন্দায় লাঞ্ছিত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। চিরদিন তিনি সমকাল থেকে অনেক বেশি অগ্রবর্তীকালের উপযোগী নানাবিধ সৃষ্টিকর্ম করেছেন। তাঁর মতামত ছিল দূরবর্তী আগামী কালের আর চিরকালের। তাঁর দৃষ্টি, মন ও চিন্তা, সাধারণত কোনও একটি বিশেষ কালকে না ছুঁয়ে সর্বকালকে ছুঁয়ে থাকত। এজন্য দেশবাসীর কাছে তিনি বিপরীত তাৎপর্যে গৃহীত হয়ে সর্বদা সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিদ্ধ হয়েছেন। সমকালের কাছে তাঁকে অনেক অপযশ সইতে হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীতে পঞ্চদশ শতাব্দী ষোড়শ শতাব্দীর দূরদর্শী মনীষীদের ভাগ্যের মত ছিল এদেশে সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্য।

আমি শরৎবাবুর ঘনিষ্ঠ, এটি গুরুদেব জানতেন। আমাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন—কি গো আধুনিকা, তোমাদের শরৎদাদার খবর কি বলো, শুনি। কী লিখছেন তিনি আজকাল?

কখনো বা বলেছেন—তোমাদের শরৎবাবু লোকালয় ছেড়ে বনবাসে অজ্ঞাতবাস নিলেন কেন বলো দেখি! শুনেছি, সেখানে পৌঁছতে হলে কঠিন দুর্গমপথ অতিক্রম করে যেতে হয়। তোমরা যাও কী করে?

বলেছি—পাল্কি চড়ে কনে-বৌয়ের মতন যাই। দশাসই মহাবীররাও কেউ

কেউ কনে-বৌ হয়ে বেয়ারাদের—'হুঁ—ক্কী—ভারী'—'হুঁ—ক্কী—ভারী'—সুরেলা গালাগালি শুনতে শুনতে —পাল্কীর নিচু ছাদের তলায় হেঁটমুণ্ডে শরৎদার বাড়ি সামতাবেড়ে যান।

কবি হেসে উঠেছেন। সব্বাইকে মুণ্ডু-হেঁট করিয়ে তিনি তাঁর কাছে নিয়ে যান—এই কথা বলতে চাইছো তুমি?—বেশ তো মজা!

জবাব দিয়েছি—তা বলতে পারেন বই কি! বেশ কষ্ট করেই ভক্তরা যান তাঁর কাছে। অনেকে পাল্কি চড়েন না। মানুষ হয়ে মনুষ্যবাহিত হতে চান না। এঁদের বর্ষাকালে দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। জানেন তো, রাঁচি হাজারিবাগে এঁরা অনেকে পুশপুশে চড়েন না!

গুরুদেব কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছেন—তারা নিশ্চয়ই 'ব্রাহ্ম'।

আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিই—শরৎদা কিন্তু ব্রাহ্ম বলতে কোনও সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে 'ব্রাহ্ম' কথাটি লেখেননা। অনেকে কিন্তু বোঝেন না একথা।

গুরুদেব প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলেছেন—আমি কিন্তু তা বুঝি।

গুরুদেবের এই 'আমি কিন্তু তা বুঝি' কথাটি আমার মনের উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা জুড়িয়ে শান্ত করে দিয়েছে।

গুরুদেব শরৎদার অনেক আঘাত অপরিসীম ক্ষমায় সহ্য করে গিয়েছেন। এ ক্ষমা এসেছে তাঁর অতল অন্তর্দৃষ্টি থেকে। ঐ মানুষটি যে তাঁকে কোন্ চোখে দেখে, কতো বেশি শ্রদ্ধা আর ভক্তি করে, তাঁর অজানা ছিল না বলে কবির সহনধৈর্য কোনও দিন টলেনি।

সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঁপড়ের কামড়ে জর্জরিত হয়ে জ্বালাভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। সজনীকান্ত কুশ্রী আঘাতে তাঁর শুভ্রতা কলঙ্কিত করে চলেছেন যখন, তখন কিন্তু সজনীকান্ত রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েননি। লেখার সম্যক পরিচয় দূরে থাক, আংশিক পরিচয়ও না জেনে লেখকের প্রতি 'অস্ত্রাঘাতে' মেতেছেন। পরে যখন তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের অমরাবতীতে প্রবেশ করেছেন, তখন সেই অস্ত্রধারী হাত দুখানিই পুজোর পুষ্পাঞ্জলিতে ভরে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজের সাহিত্য-ঋণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগদান করে এসে অকপট উচ্ছ্বসিত আনন্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট সম্পাদক অমল হোমকে লিখেছিলেন—"সত্যি অমল, আমি যে কত খুশি হয়ে এসেছি...যে-ভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক করে তুললে—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে

আমি এখানে ওখানে মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই। আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানেনি গুরু বলে—আমার চাইতে কেউ বেশি মকসো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমার চাইতে বেশি বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরই জন্য।"

শরৎচন্দ্র এই চিঠিতে তাঁর সত্যকার হৃদয় উন্মুক্ত করে সঠিক বাক্য উচ্চারণ করেছেন। এমন করে খোলা গলায় ঋণ স্বীকারই বা আর কোন্ শিল্পীকে করতে দেখা গেছে বাংলা সাহিত্যে? অহংশূন্য শরৎচন্দ্র এখানেও দেখা যায় অনন্য।

শরৎচন্দ্রের শিল্প যে সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছেচে, এটি কবির কাছে অস্পষ্ট থাকেনি কোনওদিন। তিনি বার বারই শরৎ-সাহিত্যকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রকে সুপরামর্শ দিয়েছেন, বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক করতে চেয়েছেন।

শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানি কেউ কেউ পড়েছেন, অনেকেই হয়তো পড়েননি। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল, এই চিঠি থেকে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে লিখছেন –"...আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তা হলে চেষ্টা করতুম, কেননা, নাটক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংগ।

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়,—আমার বিশ্বাস, তোমার কলম ঠিক ভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেননা, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তা হলে তোমার শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পেকটিভ সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সংকীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ, সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়।

আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সংগতি হতে পারত সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়া-গাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এ কাহিনী নয়। সৃষ্টি-কর্তা রূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোক-রঞ্জকের আধুনিক কালের চলতি সেণ্টিমেণ্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি—৪ ফাল্গুন ১৩৩৪। তোমার —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরৎচন্দ্র এ চিঠির জবাবে সামতাবেড় থেকে ২৬শে ফাল্গুন ১৩৩৪ তারিখে যে জবাব লেখেন তাতে লিখেছেন—এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি, এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সংকীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেচি—এ ঠিক হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয়, তখন ঠিক কিভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি, উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে। এক দিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস। আপনি যাকে বলেছেন, এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভাল কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয়, এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেইজন্যই হল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ

করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হলো না। এ আমার বাইরে পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

এক সময়ে আমি ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ডু, ওর ধড়, তার পা এক করে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মত এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়াতাড়া দিয়ে উপস্থিত মতে লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁক থেকে যায় এবং উত্তরকালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে।...সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এত কাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।...আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু' একটা লেখার ইচ্ছা হয়, কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠক সমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক কে বোঝা কঠিন। থিয়েটার বালারা না বোকা-দর্শকরা— কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।. আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সে-ও যে শাস্তি দেয়।"

শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথে সম্পর্ক কেমন ছিল, দেশের সাধারণ মানুষদের জানার ঔৎসুক্য লক্ষ্য করে আমি এই পুরানো চিঠি একটু বিশদ করে উদ্ধৃত করলুম। পণ্ডিতেরা সকলেই অবশ্য এ চিঠির সঙ্গে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের এ চিঠির জবাবে যা লিখেছিলেন তা সর্বকালের সব সাহিত্যিকদেরই জন্য। সকল কালের নতুন সাহিত্যিকদের এ নির্দেশ গ্রহণীয়। এ নির্দেশ পুরোনো বলে পরিহার করার মত নয়। শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির মনের সংবেদন যেমন ছিল 'দেশে'র পাঠক সাধারণের গোচরে আনার জন্য কবির চিঠিখানির আরম্ভটুকুও তুলে দিচ্ছি।

কল্যাণীয়েষু—আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি—সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্তমানের ভোগ বর্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়—রাজ্য সাম্রাজ্যও তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে, বর্তমানের কোন প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে, এই আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি।

বর্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্তলোকে এসেছে, তাদের সংখ্যার সীমা নেই—তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে—মাসিকে, সাপ্তাহিকে, সভা-সমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর বাঁশে বাখারিতে তৈরি; তোমরা সেখানে যদি পা দেও তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ 'উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার'। সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত, যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্তমান কালের একটা বৃহৎ অংশ আছে যেটা ক্ষণজীবীদের—মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক ডিমক্রাসির যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস করে থাকে। এ ফরমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিষম সমস্যা। এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্য উন্মত্ত। তোমাদের মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়—তোমাদের খাঁচার পাখী না হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে, কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎকালে বৃহৎদেশে।

দাশুরায়ের আমলে উপস্থিতকাল দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল—কিন্তু সে যে-চেক সই করেছিল, আধুনিক কালের অঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মনসিংহের গাথা-কাব্য লোকসাহিত্য আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি—তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা, কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েছে, এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এরা কচুরিপানার মত সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেচে।

আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি, তাতে তুমি অনায়াসে চিরকালের

সত্যকে মূর্তি দিয়েচ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগা দেগে দিতে পারেনি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে ভয় হয়, পাছে চোখে পড়ে যে তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেচে। সে এত বড় লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।...একটা কথা মনে রেখো; আমি তোমার নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম, যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসংগত, তা হলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে। যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তা হলে বলবার কথা কিছু নেই—যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি—যদি কোন দিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে।"

এই চিঠিতে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের ঋষিদৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মান কোন্ অঙ্কের সেটি বুঝে নিতে গোলমাল হয়নি। তাঁর দাশুরায় আর ময়মনসিং গীতির তুলনাটিও অনবদ্য।

শরৎচন্দ্রের মুখে আমি কোনও দিন রবীন্দ্র-বিদূষণ শুনিনি, যদিও তখন তিনি কাগজে পত্রে লেখায় যথেষ্টই বিরুদ্ধতা করছিলেন। আমাকে রাগিয়ে তুলতে 'তোমার গুরুদেব' বলে অনেক সময় হাল্কা ঠাট্টা তামাশা প্রায়ই করতেন। যেমন রামানন্দবাবু ও রবীন্দ্রনাথের দাড়ি নিয়ে অনেক রকম হাসির গল্প বানিয়েছিলেন। তাঁর একদল স্তাবকও ছিল যারা ঐ ধরনের গল্পে সর্বদাই মালমশলা জোগাত। আমি কবি সম্পর্কে সামান্য পরিহাসও সইতে পারতুম না বলে শরৎদা পাঁচজনের সামনে কবিকে নিয়ে পরিহাস শুরু করে আমাকে বিচলিত করতে চাইতেন। এটি তাঁর স্কুলবালকসুলভ কৌতুককর খেলার মত ছিল। আমাদের কাছে যদিও এটি খেলা ঠেকত না, অপরাধ ঠেকত।

২৭

শরৎচন্দ্রেরই মুখে শুনেছি মানসিক প্রবল অস্থিরতা নিয়ে তিনি শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব লিখেছিলেন। লেখার সময়ে নাকি তাঁর মনে, তাঁর বিশ্বাসের গভীরে একটি প্রচণ্ড ধাক্কার চাপ চলছিল। কিসের সে ধাক্কা?—স্পষ্ট করে তো কিছু খুলে বলেননি কখনো। বলা হয়তো সম্ভবও ছিল না।

আমার নিজের ধারণা, শ্রীকান্ত ৩য় পর্বের আগে পর্যন্ত তিনি নিরুপমা দেবীর মতামত পত্রযোগে পেয়েছেন। 'শেষ প্রশ্ন' থেকে নিরুপমার মতামত আর তিনি পাননি।

নিরুপমা দেবীর রচনার প্রতি শরৎদার কিছুটা অন্ধতা ছিল, আমাদের তখন মনে হত। তখনকার দিনে বাংলায় অনেক খ্যাতনামা উপন্যাস লেখক লেখিকা ছিলেন। এঁদের সকলের মধ্যে শরৎচন্দ্র নিরুপমা দেবীর লেখা সর্বোৎকৃষ্ট বলতেন। আমার মনে আছে, ১৯৩২ কিংবা ১৯৩৩ হবে, শরৎদা লিলুয়ার বাগানে উপস্থিত হয়ে গল্প করেছিলেন, অনুরূপা দেবীর চেয়েও নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের সেল অনেক বেশী। এই সূত্রে তিনি নিরুপমার লেখার গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টির উচ্ছল প্রশংসা করে ছিলেন। শরৎদার সেই গৌরব উদ্ভাসিত উজ্জ্বল মুখ আমার স্পষ্ট মনে আছে। শৈলবালা ঘোষজায়ার বিদ্রোহী সুরের লেখা আর অনুরূপা দেবীর লেখা তখন সাহিত্যবাজারে সামনের সারিতে। এঁদের লেখা শরৎচন্দ্রের পছন্দ ছিল না তেমন। অনুরূপা দেবী সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিরাগ তাঁর রচনার প্রতি বিমুখতার কারণ হলেও হতে পারে হয়ত।

নিরুপমা দেবীর শরৎদার প্রতি কিরকম মনোভাব ছিল, অনেকদিন অনেক বার তখন ভেবেছি। তাঁর মনের খবর পাইনি। শ্রীকান্ত ৩য় পর্বে শ্রীকান্তর প্রতি আনন্দর একটি কথা মনে পড়ে,—"না দাদা, আপনাকে ভোলাও শক্ত, বোঝাও শক্ত, মায়া কাটানো আরও শক্ত।" এইটিই হয়ত বা নিরুপমার জীবনে সত্য হয়ে উঠে থাকতে পারে। জানি না।

'শেষপ্রশ্ন' লেখার সময়ে তাঁর মনে নাকি একটি বড় পরিবর্তন এসেছিল তিনি বলতেন। তিনি গ্রন্থ সমালোচনায় 'শেষপ্রশ্নে'র বিরুদ্ধ-সমালোচনা পড়ে বিচলিত হয়ে একদিন উত্তেজিত সুরে বলেছিলেন, আমার আগেকার লেখা বইগুলোর সংগে এই লেখার যে কোনই যোগ নেই, এটি তো স্পষ্টই খোলা। আমার আগেকার বইগুলোতে যে-কথা বলতে চেয়েছি, এখানে তার চিহ্ন থাকবে কেন? যুগে যুগে মানুষ বদলে যাচ্ছে,—চিন্তাধারারও দিক্ বদল হচ্চে। এটা পুরোই ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার কথা। কমলকে তাইজন্যেই ইংরেজ রক্তের মানুষ করে গড়তে হয়েচে। ঐ চিন্তাভাবনা, যুক্তি, ঐ আত্মনির্ভরতা, আত্মশ্রদ্ধা বাঙালীরক্তে সম্ভব নয়। কমলের মুখের কথা একটিও অবাস্তব নয়, অসত্য তো নয়ই। অস্বচ্ছও নয় বলতে পারো।...কিন্তু, তোমরা মেয়েমানুষরা এমনই এক আশ্চর্য জীব, পাছে নিজস্ব বিশ্বাসে ঘা লাগে, তাই বইখানা খুলে পড়তেই তোমরা নারাজ। অদ্ভুত বটে।

আমি তখন তাঁর এই ধরনের কথাবার্তার মানে একেবারেই বুঝতে পারতুম না। কাকে লক্ষ্য করে যে কী বলছেন—অর্থ বুঝতে না পেরে অস্বস্তিতে ছটফট করেছি। 'তোমরা' 'তোমাদের' বাক্যগুলো বা 'মেয়েমানুষ' বলতে পাঠিকাসমাজ বলেই তখন অনুমান করেছি। তাঁর ধারণা যে ঠিক নয় এটি বোঝাবার জন্য প্রতিবাদ করে কিছু বলতে চেষ্টা করেছি—তিনি তখন অসহায় হাসি হেসে আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন ভাল করে ভেবে দেখো—পরে আমার কথা ঠিক বুঝতে পারবে। এখন তর্ক কোর না। এ-সব জিনিস তর্কের বস্তু নয়, মানুষের নিজের অভিজ্ঞতাগত জীবনসত্য।

অনেকদিন পরে তাঁর 'তোমরা' 'তোমাদের' শব্দগুলোর অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে। মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি নিজের স্থূলবুদ্ধির অহংকারে তাঁর সংগে তর্ক করতে গেছি বলে। সব সময়েই যে তাঁর ইঙ্গিতময় ভাষার সব অর্থ বুঝতে পেরেছি, তা নয়, এখন মৃত্যুর আগে কুণ্ঠিত চিত্তে সেকথা নতমাথায় স্বীকার করে যাচ্ছি। তখন নিজের অজ্ঞতা ঢাকা দেবার প্রবল সতর্কতা সর্বদা খাড়া সেপাই হয়ে আমার মনকে পাহারা দিতো। শরৎদার কথা বুঝতে না পেরেও, বুঝতে পারার ভঙ্গি করেছি নিঃশব্দে। এখন সে সব কথা মনে পড়লে খুবই কষ্ট হয়, লজ্জা হয়। কতো দুর্বল এবং নির্বোধ ছিলুম তখন আমি। শরৎদা নিশ্চয়ই বোধ হয় বুঝতে পারতেন আমি না-বুঝেও বুঝতে পারার, বিজ্ঞতার ভাণ করছি।

আমি জানি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধাবাবাহিক প্রকাশমান শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব পর্যন্ত তিনি নিরুপমার নিজস্ব মতামত পেয়েছেন পত্রযোগে। শেষপ্রশ্ন থেকে তাঁর কোনও মতামত শরৎদা আর পাননি। চিঠিপত্রের যোগাযোগ বোধহয় সম্পূর্ণ

বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকবে। এইটি বন্ধ হবার পরে শরৎচন্দ্রের লেখার উৎসাহ আর বেশি ছিল না। শরীরও তখন তাঁর দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। নিরুপমার চিঠিপত্র বন্ধ (সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছিল কিনা সঠিক জানি না) হওয়ার পরে শরৎচন্দ্রের কলমের আর 'মুখচাওয়া'র কিছু ছিল না মনে হয়। তাঁর বিভিন্ন সত্যোপলব্ধি উচ্চারণে বাধাবন্ধনহীন মুক্তিও বোধ হয় এই সময়ে কিছুটা অনুভব করে থাকতে পারেন। সবটাই তাঁর নিজস্ব মনেরই ব্যাপার। নিজেরই স্বতঃপ্রবৃত্ত বন্ধন আর তা থেকে মুক্তি।

শরৎচন্দ্রের রচনায় মানুষের অন্তর্জীবনের রূপ আর নিরুদ্ধ হৃদয়ের ভাষা প্রকাশিত হয়েছে। এ ভাষা তো অক্ষরের শব্দে ঠিক ফোটে না,— সেজন্য তিনি ইঙ্গিতের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর নায়ক-নায়িকারা আচরণের মধ্যে তাদের অন্তরের ভাষাকে পাঠকের অনুভববেদ্য করে তোলে।

শরৎদা একদিন বলেছিলেন—একবার ওর উপন্যাসের একটা অংশ পড়ে এতই ভালো লেগেছিল—সে লেখাটিকে সোনার কলম দিতে ইচ্ছে হোলো। পাঠিয়েছিলুম ওর জন্যে একটা কলম; ঐ সঙ্গে ওর দাদাকেও দিয়েছিলুম অন্য আর-একটা কলম। কলম ওরা ফেরৎ পাঠিয়েছিল আমাকে। বুড়ি রাগ করে চিঠিও লিখেছিল।...মজা এই, আমি পাঠালুম একটি সুন্দর লেখাকে অন্য এক লেখকের স্বীকৃতি সম্মান, মনের খুশির প্রতীক। সেটা গৃহীত হল সম্পূর্ণ বিপরীত আর-এক-কোনো অর্থে।...কী আর হবে! সংসারে এমনিই হয়।

শরৎচন্দ্র বেশি কিছু বলতেন না। মনের বিশেষ মুডে থাকলে—নিঃসঙ্গ থাকলে, আপনা হতেই কখনো একটু আধটু বলতেন। ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস এসেছিল মনে, আমি এই বিষয়ে কারো কাছে মুখ খুলি না। খুলিওনি আমি তাঁর কাছে বাগ্‌দান ভঙ্গ করে। শরৎদারই প্রয়োজনে আর সাহিত্য ইতিহাসের প্রয়োজনে মুখ খুলতে হোলো আমার নিজের জীবনের অন্তিম পর্বে এসে। এসব কথা লিখতে কিন্তু আমার খুবই কষ্ট হয়। স্নায়ুর উপরে প্রবল চাপ অনুভব করি।

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে শরৎদা রাজলক্ষ্মীর দীক্ষাগ্রহণ, মস্তকমুণ্ডন ও কাশীবাসের মধ্যে তাঁর মনের গভীর ক্ষোভ ও বেদনা কিছুটা ব্যক্ত করেছিলেন। তারপর সুদীর্ঘকাল কাটলো। শরৎচন্দ্র এবার 'শেষপ্রশ্নে' চড়া পর্দায় নতুন সুর তুললেন। কিন্তু ওধারের নিঃশব্দতা ভঙ্গ হল না। চতুর্থ পর্বে তাঁর কল্পনার নায়িকা কমললতাকে গড়ে তুললেন। এবারে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বোঝা-পড়াটি তিনি পাকাপাকি করে ব্যবধানটি সম্পূর্ণভাবে তুলে নিলেন। কিন্তু

—শরৎচন্দ্রের কাছে নিরুপমার মতামত আর কোনওদিন আসেনি।

এইটিই তাঁর শেষজীবনের গভীর বেদনা ছিল। নিজের মুখে বলেছেন—মেয়েরা নিজের সুখদুঃখ নিজের স্বার্থের চেয়ে আর কিছু বড়ো অনুভব করে না। বুড়ি সাহিত্যচর্চা একেবারেই ছেড়ে দিলে। বেঁচে থেকেও সে আত্মহত্যা করলে। লেখা বন্ধ না করলে সে বাংলা সাহিত্যকে কিছু দেবার মতন জিনিস দিয়ে যেতে পারতো। কলম ফেলে দিয়ে গীতা ˘ .নিষৎ জপের মালা নিয়ে মোক্ষলাভ করতে ছুটলো। শেষতক্ কী পা... ...ার গুরুই তা ভাল করে জানে।

হিরণ্ময়ী দেবী এবং নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের জীবনে একেবারে বিপরীত কোণের দুটি নারী। একজন অন্যজনের সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে কেবলমাত্র সেবিকার ভূমিকায় ছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিন্তাজগতের বা শিল্পভাবনার সঙ্গী হওয়ার তাঁর কোনই উপায় ছিল না। শিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখক-অস্তিত্ব হিরণ্ময়ীর কাছে গভীর অন্ধকারের অদৃশ্য সামগ্রী ছিল। তিনি বই লেখেন, সেজন্য সকলেই তাঁকে সম্মান করে অনেক টাকা দেয়, এইটুকুই মাত্র তাঁর বোধে পেঁৗছুতে পেরেছিল, এর বেশি আর কিছু নয়।

হিরণ্ময়ীর আত্মসমর্পিত সেবাপরায়ণতা শরৎচন্দ্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। অবোলা প্রাণীর প্রতি তাঁর যে বহুপ্রসিদ্ধ মমতা ছিল, হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতি সেই করুণাঘন মমতারই রূপ যেন উৎসারিত দেখেছি। এই বিদ্যাবুদ্ধিহীন সরল সহজ মানুষটির বিশ্বস্ত আত্মনিবেদনের প্রতিদানে তাঁর প্রতি স্নেহের কর্তব্যে তাঁর ত্রুটি দেখিনি।

নিরুপমার কাছে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শিল্পীসত্তার স্বীকৃতি, সম্মাননা, অভিনন্দন। নিরুপমা তাঁকে আত্মবিশ্বাস আত্মশ্রদ্ধা এনে দিয়েছিলেন তাঁর শিল্পলোক যাত্রার প্রথম প্রভাতে। তাঁর শ্রদ্ধা, তাঁর বিশ্বাস শরৎচন্দ্রকে নিজের সম্পর্কে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। নিরুপমা শরৎচন্দ্রের মনোজগতেই আরাধ্যা হয়ে কাটিয়ে গেছেন, বাস্তবে থেকেছেন বহু দূরে। চিঠিপত্র ছাড়া তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। কাছাকাছি হওয়া যে কল্যাণপ্রসূ নয় এটি নিরুপমা শুধু নয়, শরৎচন্দ্র নিজেও ভাল করেই জানতেন। তিনি নিজেও তাঁর সান্নিধ্য থেকে তফাতে থাকাটাই মঙ্গলকর মেনে নিয়েছিলেন জীবনে। এর জন্য হয়তো মানসিক আকর্ষণ গাঢ়তরই হয়ে উঠেছে উভয় পক্ষেই। ফলে, একজন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে, সাত্ত্বিক নিয়মবিধি পালনে নিজেকে স্বনির্দিষ্ট আদর্শকারায় বন্দী রাখতে চেয়েছেন—অন্যজন নিজের প্রতি বীতরাগ হয়ে, দেশ ছেড়ে, সাহিত্য-সাধনা ছেড়ে সুদূর প্রবাসে ছন্নছাড়া হয়ে জীবনের নতুন পথ খুঁজে বেড়িয়েছেন।

কখনো বসে বসে মহাশ্বেতার ছবি এঁকেছেন, কখনো সঙ্গীত নিয়ে সুর-চর্চায় মেতে থাকতে চেয়েছেন, নিবিষ্ট মনে জগতের নানা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গভীর পড়াশুনোয় ডুবে থাকতে চেয়েছেন। মৌলিক সাহিত্য-আসক্তি তাঁর ভিতরে পুঞ্জিত হতে থাকলেও, কলম তিনি সে সময়ে আর স্পর্শ করেননি।

প্রথম জীবনে তাঁর প্রধান এবং মূল আনন্দ আর আকর্ষণ ছিল সাহিত্য সাধনায় মগ্ন থাকা,—সেটি তিনি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন দেশত্যাগের পরে। মনে হয় তখন তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সামগ্রী কলমটিকে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন স্বদেশে অন্য একজনের হাতে। নিজে তুলে নিয়েছিলেন রং, তুলি, গানবাজনা আর পড়া।

সাহিত্যলক্ষ্মী নিজেই এবার এগিয়ে এলেন সর্বত্যাগী ছন্নছাড়া ছেলেটির কাছে। বন্ধুদের কাছে ছড়িয়ে ফেলে রেখে আসা প্রথম যৌবনের সেই লেখা-গুলিরই সামান্য কিছু-কিছু তাঁর সাহিত্যসঙ্গীরা ছাপিয়ে দিলেন বিভিন্ন পত্রিকায়, লেখকের বিনা অনুমতিতে, লেখকের অজ্ঞাতসারে।

শরৎচন্দ্র নিজের লেখা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কাগজে পাঠাননি। অন্যে পাঠিয়েছেন নিজেদের আগ্রহে। 'বড়দিদি' ভারতীতে ছাপার পরেই লেখার তাগাদার বন্যা এলো। বন্ধুদের কাছ থেকে, সম্পাদকদের কাছ থেকে, প্রকাশকের কাছ থেকে। তিনি নিজে এগিয়ে এসে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হননি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারাজীবন একজন লেখক কোনওদিনই নিজের লেখা ছাপার জন্য কারো দ্বারস্থ কখনো হলেন না, এমন ব্যাপার আর কোথাও কখনও ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই সেই ব্যতিক্রমী লেখক, যাঁকে লেখা ছাপাবার বা বই ছাপাবার জন্য নিজেকে কখনো উদ্যোগী হতে হয়নি।

আমি এর আগেই উল্লেখ করেছি, শরৎচন্দ্রের নিজের প্রতি একটি অদ্ভুত বিরাগ ছিল। নিজেকে এমন তাচ্ছিল্য করতে, বিদ্রূপ করতে অন্য কোনও মানুষকে আমি দেখিনি আমার জীবনে। এই প্রবল আত্মবিমুখতা কেন? এই নিয়ে প্রমথ চৌধুরী মশায় একদিন আমাকে একটি কথা বলেছিলেন, সেটিই আমার মনে বিদ্ধ হয়ে আছে।

প্রমথ চৌধুরী মশায় তাঁর শেষজীবনে প্রায় প্রত্যেক দিনই তাঁর বৈকালিক বেড়ানোর শেষে আমাদের বাড়ি ঘণ্টা দুই সময় কাটিয়ে যেতেন। শেষে যখন দোতালায় উঠতে বেশ কষ্ট হত, আমি নীচে নেমে তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসতাম, গাড়ি লেকে গিয়ে ধীরে ধীরে চক্র দিয়ে ঘুরতো। অনেক সময়ে থেমে দাঁড়িয়েও থাকতো, তিনি বসে গল্প করতেন। গল্প করতে ভালবাসতেন তিনি। সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনও বিষয় কদাচিৎ আলোচনা করতেন। শরৎ

সাহিত্য এবং শরৎচন্দ্রকে নিয়েও তাঁর সংগে কথাবার্তা হত। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং পুলিনবিহারী সেন প্রমথ চৌধুরী বিষয়ে লেখার জন্য আমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছেন। আমি তাঁর সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা নিজের মধ্যে অনুভব করি না কোনওদিন। কখনও কলম ধরিনি তাঁর সম্পর্কে, ধরতে আজও ইচ্ছুক নই। সব মানুষকে সঠিকরূপে সঠিকভাবে ব্যক্ত করার মত শক্তিমান কলম আমার নয়, এই আমার বিশ্বাস।

শরৎদা সম্পর্কে তিনি একদিন যে-কথা আমাকে আমাদের বৈঠকখানায় বসে বলেছিলেন, সেইটি আজ বলব।

আমি চৌধুরীমশায়কে বলেছি একাধিক দিন, শরৎদা নিজের সম্পর্কে নিজে কতো মন্দ কথা বলতেন। নিজেকে যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন। এর কারণ কি?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—মনে হয়, যে-জীবন তাঁর রুচিবিগর্হিত ছিল, যে পথ তিনি ঘৃণা করতেন, সেই পথেই তিনি নিজের জীবন টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। অল্পবয়স থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত যে দিকে তিনি হাঁটলেন সে দিকটি যে ভুল-দিক, এটি যখন তাঁর চৈতন্যে এলো, তখন ক্ষতিবোধে এতই আহত হয়ে থাকলেন নিজের সর্বনাশের দিকে তাকিয়ে,—যার ফলে, সারাজীবনে নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি।

নিজের নামে মিথ্যা-কলংককাহিনী শুনেও অবিচলিত ঔদাস্যে থাকা, নিজের নেশাভাঙ, নিষিদ্ধ পল্লীর অভিজ্ঞতার কাহিনী শ্রোতার নিন্দাযোগ্য করে অদ্ভুত বর্ণনায় বলা,—এসবের কারণ, তাঁর আত্মধিক্কার।

শরৎদার কথাবার্তার মধ্যে নিজের প্রতি নিষ্করুণতা দেখে আমার বিস্ময়-বিমূঢ়তার কিনারা ছিল না। চৌধুরীমশায় বলেছিলেন—এটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া। দারিদ্র্যে তাঁর সহজপ্রকৃতি মিলত না, অথচ দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁকে বেড়ে উঠতে হয়েছিল। আত্মসম্ভ্রমবোধ তাঁর সহজাত ছিল, অথচ বাপ মাকে মামার বাড়িতে কুণ্ঠিত জীবনযাপন করতে দেখতে হয়েছিল। এর বিদ্রোহে নিজে বেপরোয়া হয়ে নিজেকে ছোটো থেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছিলেন। নিজে যা হয়ে উঠেছিলেন, তা তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির পছন্দসই ছিল না নিশ্চয়, তাই সর্বদা নিজেকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ব্যংগবিদ্রূপ করতেন।

আমি জানি না, চৌধুরীমশায়ের কথার মধ্যে কোনও বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক সত্য আছে কি না। তবে এইরকমই কোনও একটা কিছু বিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব যে শরৎদার মধ্যে ছিল, এটি অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

২৮

আমার স্বামী স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেব 'শরৎচন্দ্র' নামে শরৎদার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলেন একটি মনঃক্ষোভ নিয়ে।

তিনি বইখানির ভিতরে নিজেকে কোথাও রাখবেন না, কেবলমাত্র শরৎ-চন্দ্রেরই কথা লিখবেন এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ফলে, লিখবার সময়ে তাঁর যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল। নিজের জানা অনেক ঘটনা, অনেক গল্প কিছুই দিতে পারলেন না—নিজেকে নিশ্চিহ্ন রাখার ইচ্ছায়। তিনি যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েও নিজেকে অপরিচিতের মতই দূরে সরিয়ে রাখলেন। ফলে, বইখানিতে যতটা বাস্তবতার স্পর্শ আসত এবং প্রাণ সঞ্চারিত হত তা হল না। তিনি বর্মায় শরৎচন্দ্রের একটি ছেলে হয়েছিল প্রধানত এই তথ্যটি বাঁচাবার জন্য কলম ধরলেন তাঁর তিরোধানের বছরেই কয়েক মাসের মধ্যে। তমাললতা বসুর লেখা তথ্য, সম্পাদকের সম্পাদনায় পরিবর্তিত হওয়ায় বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। যেহেতু, একটি সত্য-তথ্য এর ফলে মিথ্যায় পরিণত হয়ে থাকবে। একদল আপাতকালে বদ্ধ দৃষ্টি মানুষ বলেছিলেন—ওটা চাপা থাকাই ভালো। প্রকাশ করার দরকার কী? অন্যদল এর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, শরৎচন্দ্রের জীবন, ছকে-বাঁধা অন্য সব-মানুষের জীবনের মত নয়। তাঁর জীবনে যতটুকু যা সত্যই ঘটেছে—তা প্রকাশ থাকলে ভবিষ্যৎকালে এই মানুষটির চরিত্র ঠিকমতন লোকে বুঝতে পারবে। শিল্পীর জীবন, সাধারণ মানুষের মতন প্রায়ই হয় না আমার স্বামী শেষোক্ত দলের সঙ্গে একমত ছিলেন।

স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেবের লেখা 'শরৎচন্দ্র' জীবনীতে মোটামুটি তাঁর সব তথ্যগুলি দেওয়া আছে, হিরন্ময়ী এবং নিরুপমা দেবীর তথ্য ছাড়া। স্বর্গীয় জলধর সেন বইখানির ভূমিকায় লিখেছিলেন—

"শ্রীমান নরেন্দ্র যে শরৎচন্দ্রের পরম স্নেহাস্পদ ও একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু,—একথা অনেকেই জানেন। আমারও আগে নরেন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়।

অর্থাৎ ভারতবর্ষ পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে। স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সহায়তায় ১৩১৯ সালে শরৎচন্দ্রের সহিত শ্রীমান নরেন্দ্র পরিচিত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের নিকট-আত্মীয়গণ এঁকে চেনেন। শিবপুরের বাটীতে প্রায় প্রতি রবিবারেই এঁকে যাতায়াত করতে দেখেছি। সামতাবেড়ের বাটীতেও ইনি একাধিকবার গেছেন জানি। শ্রীমান নরেন্দ্রের বালিগঞ্জের বাটীতে শরৎচন্দ্র প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় উপস্থিত থাকতেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনের নানা ঘটনা তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনবার এঁর অনেক সুযোগ ঘটেছে। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের অন্তঃপুর হতে এবং তাঁর অনুজ শ্রীমান প্রকাশচন্দ্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণের নিকট ইনি অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং এঁর রচিত শরৎচন্দ্রের জীবনী সর্বরকমেই নির্ভর-যোগ্য মনে করি।

এই গ্রন্থখানির মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে নানা ভাবে সংশিলষ্ট থাকা সত্ত্বেও শ্রীমান নরেন্দ্র এই জীবনী রচনায় নিজেকে সতর্কভাবে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখেছেন। বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোথাও আত্ম-বিজ্ঞাপনের এতটুকুও চেষ্টা করেননি। বইখানি একেবারেই 'আমিত্বে'র অহংকার শূন্য। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের স্বল্প আয়তনের মধ্যেই ইনি শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক অপ্রকাশিত নূতন অধ্যায় আমাদের সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন, সেজন্য আমরা এঁর নিকট কৃতজ্ঞ। ইতি শিবচতুর্দশী। ১৩৪৪।

শ্রীজলধর সেন।

ভূমিকাটির মধ্যে জানা যায়, তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনীর মধ্যে প্রদত্ত তথ্যগুলি তিনি কোথায় কবে কেমনভাবে পেয়ে-ছিলেন সেটিও লেখা থাকত, যদি বইয়ের পাতায় নিজেকে না-রাখার ঝোঁকটি তখন তাঁর মাথায় না আসত। তথ্যগুলি যথেষ্ট দৃঢ়ভিত্তিক হতে পারত সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রকাশবাবু ও জলধরবাবু লিখেছেন তাঁর তথ্যে অসত্য বা অতিরঞ্জন নেই। তাঁরাও ঐ তথ্য জানতেন, সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এই তথ্য যাঁদের অবিদিত নয় আমি বার বার এখন তাঁদেরই মুখে প্রশ্ন শুনছি—কোথা থেকে আমি জানলাম শরৎচন্দ্র ব্যাচেলার? এর উত্তর শরৎচন্দ্রের কণ্ঠেই দিতে চাই।

"—এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইয়ো না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে-বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি

থিতাইয়া থাকে ত, থাক্ না। কি সেখানে আছে, নাই-বা জানা গেল। কি এমন ক্ষতি?......

—জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে, যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও, তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।"

(শরৎচন্দ্র—৩য় খণ্ড পত্রাবলী—২২৫ পৃষ্ঠা। পত্র-সংকলক গোপালচন্দ্র রায়।) আমি আগেই লিখেছি, তথ্যগুলি যে ভুল নয়, কাল্পনিক নয়, এর প্রমাণ গবেষকরা একটু খোঁজখবর করলে সঠিক পেয়ে যাবেনই। আমি একা নই, আরও অনেকেই জীবিত আছেন, যাঁরা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ জানাতে পারবেন। আনুমানিক তথ্য আমি লিখি না। উত্তরপুরুষদের কাছে আর শরৎ-সাহিত্যের প্রতি অপরাধ করা হবে, যদি আমরা বদ্ধমূল সংস্কার আর আপাত স্বার্থ-সুবিধার দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনে ভুল-তথ্য সাজিয়ে রেখে যাই। যে-শক্তিবলে মিথ্যাকে সত্য, আর সত্যকে মিথ্যা করা হয়ে থাকে সংসারে,—সে শক্তি আমার নেই। নিন্দা আর প্রশংসা, দুটিই আমার এ বয়সে এখন সম-অনুভবের। কেবলমাত্র নিজের সততার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও আমার জবাবদিহি নেই।

বার বার কবির কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের দুটি পংক্তি মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছে—

"ধনলোভে, যশলোভে, রাজ্যলোভে অয়ি
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

সৎ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট না হওয়া, মানবজীবনে বীরত্বেরই সুকঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, যাঁরা পারেন,—তাঁরাই হয়তো জানেন, অন্তর্জীবনে নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রাপ্তির পূর্ণতাসুখ কেমনতর। কোনো যশস্বী, ধনী, ক্ষমতাবান মানুষ এই পূর্ণতা সুখের আস্বাদ পান কিনা জানি না।

নিজেকে আদর্শবাদী বলার মূঢ়স্পর্ধা বিন্দুমাত্র রাখি না আমি। তবে, সাহিত্যজীবনে সারাজীবনই নিজস্ব একটি আদর্শবাদে অনড় থাকতে চেষ্টা করেছি বরাবর। যশলোভ বা অর্থলোভে প্রলুব্ধ হইনি।

সংসার থেকে আমি বিদায় নেবার আগে আমার দেশবাসী কোনো লোভের কলঙ্কে কলঙ্কিত করবেন না আশা রাখি। কারণ, যশ আর অর্থ এই দুটি প্রলোভন বা 'মার'কে আমি সাহিত্যের নির্মল তপস্যায় দূরে রাখতে পেরেছি, এই একটিই মাত্র আত্মতৃপ্তি আমার জীবনে। অপ্রিয় সত্য যদি কিছু উচ্চারণ করে থাকি, তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, কিন্তু তথ্যে যে আমার ভ্রান্তি বা অতিরঞ্জন নেই, তাঁরা নিশ্চয় তা জানবেন।

মনে ক্লান্তি আর ঔদাস্যের ভার। কলম থেমে থাকতে চাইছে।...শরৎদার চিঠিপত্র, ছাপা বইগুলি নাড়তে-চাড়তে ভালো লাগছে। এখানে তাঁর সেই কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কখনও উৎসাহে উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত, কখনও উদাস বিষণ্ণতার করুণ, কখনও গূঢ় ব্যঙ্গে তির্যক, তীক্ষ্ম। শরৎদার কণ্ঠে তাঁর কথাই কিছুক্ষণ পাঠকরা শুনুন না হয়। আমার স্বর একটু বিরতি নিক।

"অনেক সময়েই যে তুমি আমার কথা মনে করিবে, তাহা আমি জানি। কেননা, যাদের মনে করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তারাও যখন করে তখন তুমি ত করিবেই।

আমার ভাগ্যবিধাতা আমার সমস্ত শাস্তির বড় এই শাস্তিটা জন্মকালেই বোধ হয় আমার কপালে খুদিয়া দিয়াছিলেন।

আজ যদি আমি বুঝিতে পারিতাম, আমার পরিচিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা সবাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি সুখী হইতাম, শান্তি পাইতাম। তা হইবার নয়। আমাকে ইঁহারা স্মরণ করিবেন, সন্ধান জানিতে চাহিবেন, বিচার করিবেন এবং অনবরত আমার অধোগতির দুঃখে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মর্মান্তিক দুঃখের বোঝা অক্ষয় করিয়া রাখিবেন।

লোকে যে আমার কাছে কি আশা করিয়াছিলেন, কি পান নাই, এবং কি হইলে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, এ যদি আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারিত, আমি চিরটা কাল তাহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিতাম।"

"নিরপেক্ষতা সত্য -এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে থাকিব চাই না।...যদি আংশিক পরিবর্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না, উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না, গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়া যায় না।

"সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধু হওয়া উচিত—গালাগালি দিয়া অপ্রতিভ করিব—দাবাইয়া ধরিব এ মৎলব ভাল নয়।"

"...লোকে যতই নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে।"

"টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়

তার চেয়ে আনন্দের বস্তু কি আছে? আজ আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।"

শরৎদার কণ্ঠস্বরে এই কথাগুলি ভেসে আসছে অর্ধ শতাব্দীরও ওপার থেকে। আজও এ কথাগুলির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি তাঁর শতাব্দী প্রান্তিক জীবন থেকে। এটিও একটি আশ্চর্য বলতে হয়।

এই কথাগুলি তিনি চিঠিতে লিখে বলছেন—তাঁর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রমথনাথকে আর হিতার্থী বন্ধু পুস্তকপ্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে।

এই সূত্রে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটি ইতিপূর্বে আমি অনেককে বলেছি। শরৎদা বলতেন—তাঁর 'একাদশী বৈরাগী' গল্পটি হরিদাস-বাবুরই চরিত্র। তিনি হরিদাসবাবুকে যেমন দেখেছেন, সেইটিই নাকি 'একাদশী বৈরাগী'তে তুলেছেন। আড়ালে আমাদের অনেকেরই কাছে রসিকতা করে তিনি হরিদাসবাবুকে কখনও 'বৈরাগী', কখনও বা 'একাদশী' বলে উল্লেখ করতেন। আমরা সকলেই এটি নিয়ে কৌতুক উপভোগ করতুম। তখনকার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অনেকে এটি জানতেন।

২৯

লেখক পাঠক দুটি বিভাগে ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট হয়ে বেঁচে আছি সুদীর্ঘকাল। বাংলা সাহিত্য-স্রোতে মীন হয়ে প্রাণধারণ করে গেলুক মানবজন্মে।

শরৎদা বলতেন,—কলম চালনা করা শক্ত নয়, কঠিন কাজ কলম সংবরণ করা। কলম-সংবরণের কঠোর পরীক্ষায় পঁচিশ বছরেরও বেশী কাল ব্যাপৃত আছি। লেখক বিভাগ থেকে সরে এসে পাঠক বিভাগে আমি বরাবর মনোযোগী ছাত্র। এ ছাড়া নিজের কাছে নিজের অন্য পরিচয় কিছু পাইনি।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কিছু সত্য তথ্য না বলে গেলে অপরাধ থেকে যাবে অনুভব করে দীর্ঘকাল বাদে নতুন করে কলম তুলে নিতে হয়েছে।

আমার মূল বক্তব্য—শরৎসাহিত্য প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে সব অভিমত প্রকাশিত হচ্ছে সে অভিমতের সঙ্গে আমার শিল্প-অনুভব মেলে না। আমার মনে হয় এই অভিমতগুলি যথেষ্ট সূক্ষ্মতায় ও গভীরতায় আধুনিককালে যাচাই হয়নি। অনিচ্ছুক পরীক্ষকের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে চোখ বুলিয়ে লেখার খাতায় নম্বর দেওয়ার মতন—সমালোচনা।

সব সাহিত্যই যে একজাতের বা একই ধাতের হবে এমন কথা নেই। পশ্চিমী সাহিত্যে এখন যে-সকল লক্ষণ, গুণ আর উপকরণ দেখা যায়, শরৎসাহিত্যে তা অনুপস্থিত। সেইজন্যই শরৎসাহিত্য মেয়েদের উপযোগী সাহিত্য বা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিতের সাহিত্য যাঁরা বলেন,—সাহিত্যগুণ, সাহিত্যরস তাঁদের কাছে যথার্থ মূল্য লাভে যে বঞ্চিত, এইটি আমি বলতে চাই। কেবলমাত্র বিশ্বের বিবিধ বিষয়ে সুবিস্তৃত জ্ঞান আর বুদ্ধি ও মেধার দীপ্তি থাকলেই মহৎ সাহিত্য হয় না। অতি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে অতি সামান্য বিষয়বস্তু নিয়েও মহৎ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। উপকরণই সাহিত্য নয়!

শরৎচন্দ্রের বই অনুভবগ্রাহ্য। বুদ্ধিগ্রাহ্য সাহিত্যের প্রাবল্য এখন পশ্চিমী দুনিয়ায়। বুদ্ধির পরিবর্তন এবং বিবর্তন আছে। অনুভবের বিবর্তনও থাকতে পারে, কিন্তু সেটি বুদ্ধির মত এত দ্রুত কি? স্পষ্ট কি? অনুভবের

পরিবর্তন তো এখনও দেখতে পাই না। আদিম কাল থেকে মায়েদের স্বভাব তো বদলালো না জীবজন্তুর দুনিয়ায় চেয়ে চেয়ে দেখি। মানুষের হৃদয়ের অনুভবের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি কি ভবিষ্যতে থাকবে না? কী জানি, বলা যায় না কিছু। হয়তো অনুভূতিশূন্য, বুদ্ধিপ্রখর মানবজাতি পৃথিবীর বুকে কোনো একদিন বিচরণ করবে—যারা পুরোনো যুগের এই সব লেখা পড়ে অবাক হয়ে ভাববে—হৃদয় নিয়ে মন নিয়ে অনুভব নিয়ে এত চঞ্চলতা কেন ছিল এদের? কান্না, চোখের জল এ সব তো শৈশব বাল্যের ব্যাপার। পুরো-বয়স্ক মানুষের চোখে যখন-তখন জল,--এ আবার কী হাস্যকর কাণ্ড!

শরৎবাবুর লেখা অনুভববেদ্য। মস্তিষ্ক শক্তির কাছে মানুষের অনুভব শক্তি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় যতদিন না হবে, ততদিন শরৎচন্দ্রের লেখা মানুষের হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি অনুরণিত করতে পারবে মনে হয়।

কোনও একটি সাহিত্যকাল যদি সূক্ষ্ম অনুভূতির তারের কাজগুলিকে মানবসুলভ না বলে নারীসুলভ বলে বিদ্রূপে অবজ্ঞা করে যায়,—তবে সেই কালের জন্য কোনও অনাগত কাল যে অরসিকের আসন এগিয়ে দেবে না, এমন কথা বলা যায় না।

কোনও একটি কালের বিশিষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে—চিরকালের মানব হৃদয়কে যদি অস্বীকার কিংবা তুচ্ছ করার চেষ্টা করা হয়, আপাতকালে হয়তো তা সিদ্ধও হতে পারে, কিন্তু পরবর্তীকালের আদালতে পূর্ববর্তী-কালের সিদ্ধান্ত নাকচ হওয়ার দৃশ্য সাহিত্য-ইতিহাসের পাতায় আমরা অনেক দেখেছি, এইটি মনে রাখব।

নিজেদের বিশেষ ধরনের স্বাদের অভ্যাস নিয়ে মহৎ সাহিত্যের যাচাই চলে না। নিজেদের আপাতিক প্রয়োজনে আচ্ছন্নদৃষ্টি হয়েও নয়। রাজনীতিক খোঁজেন শরৎবাবুর লেখার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস আর অভিমত কতখানি সমর্থন পাচ্ছে,—সমাজসেবীরা বা সমাজতাত্ত্বিকও ঠিক একই পথে সাহিত্য বিচার করেন। সমাজতত্ত্বের ছাঁকুনি হাতে নিয়ে তিনি শরৎবাবুর লেখা ছাঁকুনি দিয়ে দিয়ে চেলে নিচ্ছেন, স্পষ্ট দেখেছি। সনাতন বর্ণাশ্রমী হিন্দু আর প্রগতিবাদীরাও এই একই নিয়মে পাশ-মার্ক ফেল-মার্ক দিয়ে রাখছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যে অভিভূত, পাশ্চাত্ত্য চিন্তাভাবনা ও বিচারে সশ্রদ্ধ-বিশ্বাসী অল্পবয়সীরা খোঁজেন শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাশ্চাত্ত্য-কোণের চিন্তা, দৃষ্টি আর ধাতুর সমধর্মিতা সৌসাদৃশ্য কতটুকু? কারণ এখন আমাদের আধুনিকতার মাপকাঠি সেখান থেকে ধার করা। খণ্ডিত দৃষ্টিতে, কোনো দেশে কালে, কোনও সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন হয় কিনা আমি জানি না।

যে-সাহিত্যের মধ্যে বর্তমান পশ্চিমী মূল্যবোধের ছায়া নেই, তাকে

আমরা আধুনিক ভাবতে ভয় পাই। কিন্তু সাহিত্যে সমসাময়িকতার চেয়ে চিরন্তনতার দাম বেশী, এটি কারুর অজানা নয়। সময়ের সঙ্গে সামাজিক বিষয়বস্তুর বদল হয়, কিন্তু মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলির পরিবর্তন নেই। শরৎচন্দ্রে বর্ণিত সমাজ এখন বদলেছে কিনা তার উপর শরৎচন্দ্রের সাহিত্য এখনও রসোত্তীর্ণ কিনা, সে সত্য নির্ভর করে না। কালিদাসের কালও বদলেছে, শেক্সপীয়র, ডিকেন্সের কালগুলিও আর নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের সমাজ বদলে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র একটি বিশেষ কালের ছবি আঁকছিলেন না, আঁকছিলেন কতকগুলি মানুষ। কালটা তাদের পটভূমি মাত্র।

এক একটি বিশেষ কালে, বিশেষ দেশের মানবসমাজে, সাহিত্য মানুষের মন থেকে, অনুভব থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ। এটি কোন্ দেশে কেমন রঙের কেমন আকৃতির হবে,—কেমন গন্ধের আর স্বাদের হবে সেটি নির্ভর করে সেই দেশের মাটির আর জল হাওয়া রৌদ্রের উপরে।

সাহিত্যের এই মাটি সে-দেশের মানুষের সেখানকার সমাজে আকৃতিপ্রাপ্ত মন। বিভিন্ন দেশের সমাজে মানব-মন বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস, মূল্যবোধ আর সংস্কারে গড়ে ওঠে। সাহিত্যে এরাই বিভিন্ন ধরনের মাটি। যদিও মূলত প্রাকৃতিক নিয়মে সব দেশে সব কালে সব মানুষের মনে একই রকমের কতগুলি বৃত্তির ক্রিয়া দেখা যায়। স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, করুণা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সংশয়, কুটিলতা, মহানুভবতা সব দেশে সব কালে মোটামুটি এক। মনুষ্য-সমাজচিত্রণই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হয় না, মনুষ্য প্রকৃতি চিত্রণই সাহিত্যের ভিতরের কথা।

দীর্ঘায়ু সাহিত্য মানব-মনের মূলকে আঁকড়ে উদ্ভিন্ন হয়। বাইরের জগতে অনেক কিছু আসে, অনেক কিছু বদলায়। যা বদলায় না, বদলাবার উপায় নেই তাকেই ছুঁয়ে থাকে বলে কোনো কোনো সাহিত্য চিরজীবী বা সুদীর্ঘ-জীবী হয়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্রের লেখায় বর্তমানকালের চাহিদার সামগ্রী কি কি নেই তার তালিকা আমরা দীর্ঘ করে তৈরি করতে নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু, যা তার আছে --যেটুকু তার আছে, তাকে সহজে মুছে দেওয়া কঠিন। কারণ, তা সব দেশের, সব কালের মানুষের মধ্যে আছে। বরাবর তা থাকবেও প্রকৃতির নিয়মেই।

সমাজের চেহারা বদলে যাচ্ছে যাবেও, গ্রামের চেহারাও বদলাচ্ছে, আরও বদলাবে—পারিপার্শ্বিক অন্য রকম হয়েছে, আরও হবে। কিন্তু মানুষের হৃদয় আর মন? হৃদয় মনের কি আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে-- যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক? কেবল সামাজিক মাত্রই নয়।

ষোলো বছরের মেয়ে আর বাইশ বছরের ছেলের মন তো কোনওকালেই

বদল হবে না! দরিদ্র মানুষের অন্নসন্ধানী একাগ্র চিন্তা দেশে-কালে বদল হয় না। বাল্যের উদ্দামতা, যৌবনের উন্মাদনা, বার্ধক্যের ক্লান্ত ঔদাস্য এর তো দেশ কাল নেই।

শরৎচন্দ্রের বিষয়ে আলোচনা তো অনেক হল, এবারে বরং আমরা তাঁর নিজের মুখে বলে যাওয়া কথাগুলি আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে একটু ভালো করে কান পেতে শুনি। তিনি বলছেন—

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সে সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর, পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভোর আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা,—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনোটাই তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যাননি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতেরো বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছু দিন বাদে গল্প রচনা অকেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোনকালে একটি লাইনও লিখেছি, সে কথাও ভুলে গেলাম।

আঠারো বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব-দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই আমি লেখা দিতে স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য—কোন রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌঁছতে পারলেই হয় কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই

আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোটগল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে-না-হতেই বাংলার পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাংলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক, যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।" (বাতায়ন—সাপ্তাহিক শরৎ স্মৃতি সংখ্যা—১৩৪৪।)

সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজের আদর্শ কি ছিল, আমরা তাঁর বই-গুলির মধ্যেই দেখতে পাবো তার রূপ। শরৎচন্দ্রের রচনা তার পূর্বগামী লেখকদের লেখা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

জীবনে দৃশ্যমান অংশটুকু থেকে তার সমগ্রতা চেনা যায় না, ভিতরেই বহমান থাকে তার সার অংশ—এটি শরৎচন্দ্র তাঁর শিল্পে সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন। সর্বভারতীয় সাহিত্যে তাঁর এই নতুনধারা সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর আগে অবশ্য এর দরজা খুলেছেন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি, গোরা, গল্পগুচ্ছে। অন্তর্জীবন আর বহির্জীবনের দ্বৈত স্তর এই লেখা-গুলির মধ্যে আমাদের সাহিত্যে প্রথম দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সার্থক-শিষ্য বলা চলে শরৎচন্দ্রকে। কারণ, তিনি রবীন্দ্রনাথে দাগা বুলিয়ে তাঁর নিখুঁত অনুকরণ করে লেখার আসরে যে নামেননি, এটি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি আন্তরিক আনন্দে অভিনন্দিত করেছিলেন শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবকে। সাহিত্যের মানদণ্ডে শরৎচন্দ্রের রচনা শিল্পোত্তীর্ণ এবং উচ্চমানের সামগ্রী এ কথা তিনি একাধিকবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গিয়েছেন।

১৩৩৮ সালে ১লা আশ্বিন তারিখে 'নবশক্তি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বিষ বৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইল-এর পর অনেক দিন কেটে গেল। আবার দেখি, গল্পসাহিত্যে আরেকটা যুগ এসেছে। অর্থাৎ, আরও একটা পর্দা উঠল। সেদিন যেমন ভিড় করে রবাহূতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে, আজও তেমনি জুটেছে। তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবার নিমন্ত্রণকর্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে রসকে তিনি নিবিড় করে জুগিয়েছেন, সে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি, পাঠকের আরো অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে, স্পষ্ট করে, দেখিয়েচেন তেমনি সুগোচর করে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদঘাটিত করে দেন সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হল। তাদের আনাগোনাও চলচে। একদিন তারা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাঁকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু, আশা করি, পাঠকেরা ভুলবে না। যদি ভোলে, তবে সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে।"

কবির ঋষিদৃষ্টিতে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে যে সম্ভাবনা দৃশ্যমান হয়েছিল, এখন তাই-ই আমরা লক্ষ্য করছি। পাঠকের আসর থেকে শরৎচন্দ্র একটুও তিরোহিত হননি, শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর পাঠকসমাজ তাঁকে আজও ঘিরে রয়েছে কৃতজ্ঞ পরিতৃপ্তি নিয়ে। তিনি একটুও ফুরিয়ে যাননি, নতুনকাল তাঁকে মুছে ফেলতে পারেনি মোটেই।

শরৎচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে আমরা আজ রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠস্বর শুনব- -

"আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালই, না থাকলেই ভাবনার কারণ।... যে-লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের, তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে, নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে, মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।. তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেননি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বতউচ্ছ্বসিত। শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে, চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েচেন।

সাহিত্য-উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণদৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।"

সমালোচকদের সামনে, কবির এই শেষ কথা ক'টি রাখছি--

"চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণদৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে।"

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য এই গুণেই অক্ষয় সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।
